KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৪৪ সানিয়ুল আবাসিনি, কল-১৬
Collection : KLMLGK	Publisher : নীল হরমান
Title : ছড়াঘর	Size : 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৫৭/১ ৫৭/২ ৫৭/৩	Year of Publication : বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৪ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৪ কার্তিক-পৌষ ১৪০৪
	Condition : Brittle Good
Editor : আবদুর রহিম	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫৭ সংখ্যা ১ বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৪

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৩/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সূচিপত্র

কাশ্মীর প্রসঙ্গে গত অর্ধশতাব্দী জুড়ে ভারত-পাকিস্তানের রাজনীতিতে যে বন্ধ্যাত্ব বিদ্যমান, তার নিরসনকল্পে উভয় দেশের বর্তমান অনুকূল পরিস্থিতিকে কীভাবে কাজে লাগাতে হবে, তারই সুচিন্তিত পন্থা নির্দ্ধারণ করেছেন সাংবাদিক-প্রাবন্ধিক শ্রীনিরপেক্ষ—তাঁর ধারাবাহিক নিবন্ধের এবারের কিস্তিতে।

সেকাল এবং একালের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তা নিয়ে বাংলাদেশের রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ আহমদ রফিকের বাস্তবমুখী বিশ্লেষণ।

বাংলা উপন্যাসের ধারায় একটি ল্যান্ডমার্ক বিমল করের 'দেওয়াল' নিয়ে ড. বিজিতকুমার দত্ত-র মূল্যায়নধর্মী সন্দর্ভ।

মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের নায়িকার মতো পিতার হাতে অথবা পিতার নির্দেশে নিহত হয়েছিল বিশ্বসাহিত্যের যে সাত দুহিতা—তাঁদের নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রীয় একটি অনবদ্য তুলনামূলক আলোচনা করেছেন ড. সুমিতা চক্রবর্তী।

প্রকৃতিকে বশে আনার অভিযানে বিজ্ঞানের সাধনায় পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবকে চিহ্নিত করেছেন ড. মহাশ্বেতা চৌধুরী।

আখতারুজ্জামানের 'খোয়াবনামা' উপন্যাসের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে কমিউনিটির স্বপ্নপরিক্রমা নিয়ে লিখেছেন ড. বিষ্ণু বসু।

সন্তোষকুমার ঘোষের শেষ বই 'চলার পথে' নিয়ে আলোচনা করেছেন শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়।

অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্ত স্মরণে লিখেছেন ড. দেবকুমার বসু।

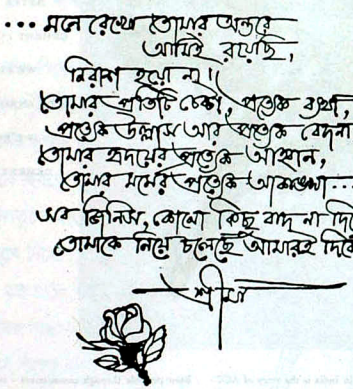

বর্ষ ৫৭ সংখ্যা ১
বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৪

❐ সেকাল ও একালের প্রক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তা	আহমদ রফিক	১
❐ বাংলা উপন্যাসের ধারায় একটি ল্যাণ্ডমার্ক : বিমল করের 'দেওয়াল'	বিজিতকুমার দত্ত	১২
❐ আগুনের কথা	অরুণ মিত্র	২১
এলোকেশী	শঙ্খ ঘোষ	২২
অসুখে বিষাদে	দিব্যেন্দু পালিত	২৩
কোনওদিন	আশিস সান্যাল	২৪
প্রিয় বন্ধু বিয়োগ	বাসুদেব দেব	২৫
আমি এবার উঠি	সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়	২৬
খেলা	অরুণ মুখোপাধ্যায়	২৭
তাই	প্রবীরকুমার রায়	২৮
❐ 'কন্যা, তুমি মরো!' সপ্ত দুহিতা কথা	সুমিতা চক্রবর্তী	২৯
❐ বিজ্ঞান ও প্রকৃতি : পুরুষ ও নারী	মহাশ্বেতা চৌধুরী	৪২
❐ ঈশেন	শক্তি চট্টোপাধ্যায়	৪৭
❐ কাশ্মীর কি রাষ্ট্রীয় অভিশাপ? অথবা এক মহনীয় চ্যালেঞ্জ?	শ্রীনিরপেক্ষ	৫১
❐ গ্রামবার্তার আদি কথক কাঙাল হরিনাথ	চিত্তব্রত পালিত	৫৯
❐ অরুণ মিত্রের কবিতা : কথকতা ও গদ্যরীতি	পরিমল চক্রবর্তী	৬৪
❐ ধ্রুবপদ—সঙ্গীত জগতের দুই প্রবাদ পুরুষের স্মরণে	শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়	৬৭
❐ পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাচিত্র : তখন ও এখন	অশোকেন্দু সেনগুপ্ত	৬৮
❐ লাল দরজা : সভ্যতার ব্যাধি	সত্যজিৎ চৌধুরী	৭৩
বিশেষ সমালোচনা নিবন্ধ :		
❐ 'খোয়াবনামা' : কমিউনিটির স্বপ্নপরিক্রমা	বিষ্ণু বসু	৭৭
❐ 'খোয়াবনামা' : অন্য একটি পাঠ	কিন্নর রায়	৮১
গ্রন্থসমালোচনা :		৮৪
শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় ❐ পুলকনারায়ণ ধর ❐ অসীম রেজ ❐ দেবী রায় ❐ মেঘ মুখোপাধ্যায় ❐ বিজলি সরকার ❐ দেবদাস জোয়ারদার		
বিতর্ক :		৯৯
শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ ❐ সুরজিৎ দাশগুপ্ত ❐ পুলকনারায়ণ ধর		
স্মরণে :		
❐ শিক্ষাগুরু ভবতোষ দত্ত	দেবকুমার বসু	১০৪
❐ প্রসঙ্গত	আবদুর রউফ	১০৬

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক গুপ্তপ্রেস, কলি-৯ থেকে মুদ্রিত এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলি-১৩ থেকে প্রকাশিত

অফিস : ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলি-১৩ দূরভাষ : ২৭-৬৩২৭
শিল্প পরিকল্পনা : রণেন আয়ন দত্ত সম্পাদক : আবদুর রউফ

TWO GIANTS MEET FOR THE BEST

WEBEL - YMCA

TECHNOLOGY MANAGEMENT CENTRE

(*A Centre for Technology & Management courses*)

1. Modern Office Management - 6 months
(Office management, business correspondence, information technology, commercial law, DOS, Word Star, MS Office, LAN, E-mail etc.)
For Madhyamik & above.

2. Public Relations & Advertising - 6 months
(Including video/still photography, Computer fundamental, DOS, Windows & Computer Graphics etc.) *For Graduates.*

☞ 25, Jwaharlal Neheru Road, Cal-87. Ph. : 240-2102, Fax : 240-2234

☞ 18/76 B. Dover Lane (behind Post Office). Cal-29. Ph. : 475-9981/455-4392

West Bengal Electronics Industry Development Corporation Limited

Webel Bhavan, Block EP & GP, Sector-V, Bidhannagar, Salt Lake, Calcutta-700 091
Phone : 357-1702/04/06, Fax : (91)(33) 357-1739/1708

সেকাল ও একালের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তা

আহমদ রফিক *

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তা বিষয় হিসাবে নানামাত্রিক ও বড় ক্যানভাসের। সংক্ষিপ্ত বয়ানে বিষয়ের প্রতি সুবিচার মুশকিল জেনেও অপরিহার্য কারণে মূল সূত্রগুলোকেই তুলে ধরতে হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা দরকার রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি শব্দ দুটো এখানে সমঅর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, এ সম্পর্কে বিতর্কের ছোট্ট সম্ভাবনা সত্ত্বেও। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বিরল প্রতিভা, এমন কি বৈশ্বিক বিবেচনায়ও। সাহিত্য কিংবা চিত্রকলা থেকে সমাজ ও রাজনীতির বিভিন্ন দিকে তাঁর বিচরণ। তার রচনাবলীতে, চিঠিপত্রে এমন কি ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডেও রাজনীতির প্রকাশ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ সর্বাংশে প্রত্যক্ষ রাজনীতিবিদ বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বা সমাজবিজ্ঞানী না হতে পারেন, কিন্তু রাজনৈতিক চিন্তাবিদ অবশ্যই। তাঁর রাজনৈতিক রচনার সংখ্যা থেকে, রচনার বিষয়-ব্যাপকতা থেকে, এমনকী সৃজনধর্মী লেখায় রাজনীতির অনুপ্রবেশ থেকে একথা বলা যায়।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তার প্রকাশ মূলত তাঁর স্বদেশ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট ঘিরে। সমাজ, রাষ্ট্র, ব্যক্তি বা মানুষ ও সংশ্লিষ্ট অর্থনীতি ওই চিন্তার অঙ্গীভূত। তাঁর স্বদেশ-ভাবনার মূল বিষয় স্বদেশিকতা, হিন্দুয়ানি ও জাতীয়তাবাদ, স্বরাজ, বড় ইংরেজ ছোট ইংরেজ তত্ত্ব, স্বদেশে বিদেশি শাসনের রূপ ও সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ, দেশহিতে ও লোকহিতে রাষ্ট্র ও সমাজের ভূমিকা ইত্যাদি। এর মধ্যে স্বদেশি রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়-চেতনার বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বে স্থান পেয়েছে। তাঁর আন্তর্জাতিক চিন্তায় রয়েছে সাম্রাজ্যবাদ, উগ্রজাতীয়তাবাদ ও ফ্যাসিবাদের সমরতান্ত্রিক আগ্রাসী ভূমিকা, সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র রাশিয়া, যুদ্ধ, বিশ্বশান্তি, মানবকল্যাণ, মানবিকতা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রয়েছে গণতন্ত্র, ব্যক্তি ও সমষ্টি, ব্যক্তি স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা ইত্যাদি আধুনিক রাজনীতির বিষয়ে তাঁর প্রক্ষিপ্ত মতামত। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিন্তায় সমাজ চেতনার রাজনৈতিক প্রকাশ ঘটিয়েছেন ধনিক ও শ্রমজীবী মানুষের অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের বিষয়টি কিভাবে এনে, কিন্তু শ্রেণী সংগ্রামের ধারায় নয়।

ভারতীয় উপমহাদেশ ইংরেজ শাসনের প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট স্বাদেশিকতার চেতনা ব্যাপকভাবে মূলত জাতীয়তাবাদকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে এবং সেদিকে রাজনৈতিক তাৎপর্য অর্জন করতে চেয়েছে। দেশের স্বাধীনতা-সন্ধানী বিপ্লববাদের পেছনেও ওই জাতীয়তাবাদ, যা শুরুতে জাতি-জাতীয়তার প্রশ্নে হিন্দু-পুনরুজ্জীবনবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। জাতীয়তাবাদী সংগ্রামেও হিন্দুত্ববাদিতার প্রভাব পড়েছে। জাতীয় নেতাদের অনেকেই প্রথম দিকে সম্প্রদায়নির্ভর জাতীয়তাবাদকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন। ভারতীয় ঐক্য হিন্দু ঐক্যের এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদ হিন্দু-জাতীয়তাবাদের সমার্থক হয়ে ওঠে। বঙ্গদেশীয় প্রেক্ষাপট ছিল একই যেজন্য, বাঙালি জাতীয়তা হিন্দুজাতীয়তা হয়ে ওঠে। অন্যদিকে মুসলমান-প্রধান কৃষক শ্রেণীর সামন্ত-বিরোধী আন্দোলনে ছিল মুসলমান ধর্মীয় প্রভাব, যে আন্দোলনের সঙ্গে জাতীয় রাজনীতির প্রাণের যোগ ছিল না। আর সর্বজনীন জাতীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতির স্বচ্ছবিকাশও দেখা দেয়নি। রাজনীতিতে সম্প্রদায় ও শ্রেণীগত বিভাজনই প্রধান হয়ে ওঠে।

স্বাদেশিকতার এই জাতীয়তাবাদী আবহে থেকে স্বল্প সময়ের জন্য স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দিয়ে বাঙালি চেতনায় উচ্চকিত হয়ে, কিংবা এক পর্যায়ে হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তার প্রতি মুগ্ধতা সত্ত্বেও

* বাংলাদেশের বিখ্যাত প্রাবন্ধিক, কবি এবং কলামিস্ট। বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্র ট্রাস্টের তিনি প্রতিষ্ঠাতা-চেয়ারম্যান।

রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন বা জাতীয়তাবাদের প্রচলিত ধারণা গ্রহণ করেননি, বরাবর ধারণ করেননি। অথচ আমরা জানি দেশহিত-লোকহিত তাঁর স্বদেশভাবনার ও স্বদেশি কর্মের প্রধান বিষয় ছিল। কেন এ আপাত-আত্মবিরোধ তা বুঝে দেখা দরকার।

প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত তাঁর ধারণা কিছুটা ভিন্নতর সত্যে, ভিন্ন অনুভবে বাঁধা ছিল। প্রচলিত জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাঁর বিরূপতার সম্ভাব্য কারণ মনে হয় জাতীয়তাবাদ ও তার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে স্বদেশে বিদেশে তাঁর অভিজ্ঞতা। স্বদেশে তাঁর সময়ে জাতীয়তাবাদী আদর্শে সর্বজনীন চেতনার অভাব লক্ষ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, আবার দেখেছেন সর্বজন-নির্ভর জাতিগঠনের পক্ষে যথাযথ কার্যক্রমের অভাব। হয়ত তাই বলেন (১৩১৪) 'স্বরাজ আকাশকুসুম নয়, সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ও কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে তাকে পেতে হবে। আর ব্যাপকভিত্তিতে স্বদেশ গঠনের মধ্য দিয়েই স্বরাজ লাভের পথ তৈরি হতে পারে' (র. র. ১০ ঃ ৬৩৩-৩৫)। অন্যত্র একই সূত্রে বলেন, আমাদের জাতীয়তাবাদে আদর্শগত ভিত্তির অভাব রয়েছে। জাতীয়তাবাদীরা আদর্শের কথা বলেন, কিন্তু সামাজিক আচরণে খুবই রক্ষণশীল (১৯২৩)।

অন্যদিকে ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের ক্রিয়াকলাপ ও চরিত্র রবীন্দ্রনাথের মনে অধিকতর হতাশার কারণ হয়ে ওঠে। ইউরোপীয় জাতি রাষ্ট্রগুলোর সংকীর্ণ জাত্যভিমানের উগ্রতায় রবীন্দ্রনাথ দেখতে পান তাদের লোভ-লালসা-স্বার্থপরতার আগ্রাসী চরিত্র, বিজিত উপনিবেশে পীড়ন-শোষণ-অত্যাচার। আবার ওই স্বার্থের টানে পারস্পরিক সংঘাত যা আক্রমিক যুদ্ধ বা বিশ্বযুদ্ধ বাধাতেও দ্বিধা করে না। জাতীয়তাবাদ তখন আর রবীন্দ্রনাথের কিছুতে জনহিতকর বা মানবহিতকর মনে হয় না। কথাটা রবীন্দ্রনাথেরই, 'জনসম্প্রদায়ের মধ্যে মনুষ্যই শ্রেষ্ঠ উপকরণ' (র. র. ৩ ঃ ৫১৮)। সেই শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ যে মনুষ্যত্বে, তা কলার অপেক্ষা রাখে না। আর রবীন্দ্রনাথের চোখে তখন মনুষ্যত্ব ও ন্যায়নালত্ব সমার্থক এবং নেশন জনসাধারণের মঙ্গলের উৎস হয়ে ওঠে (ঐ, ৫১৯)। রবীন্দ্র বিচারে 'নেশন' একদিকে মানবজাতি হিসাবে বিশ্বজনীন মানবকল্যাণে, অন্যদিকে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডবাসী জনগোষ্ঠী হিসাবে জাতি তথা সর্বজনার কল্যাণে দায়বদ্ধ হয়ে ওঠে। মানব ঐক্য ও মানবকল্যাণে রবীন্দ্র-কথিত নেশন ও নেশনত্বের মূলকথা, সেটা স্বদেশের ছোট বৃত্তে হোক বা বিশ্ব পরিধিতে হোক।

আরও একটি কিছুতে নেশন ও নেশনত্ব অর্থাৎ জাতি ও জাতীয়তা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ থেকে ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথের হিসাবে পাশ্চাত্যের নেশনত্বে 'রাষ্ট্রতন্ত্রমূলক ঐক্যই শ্রেষ্ঠ' (র. র. ৪ ঃ ৫২১) যে-ঐক্যের শক্তি অন্যের ভূখণ্ড জয় করে উদ্লসিত হয়, বিজিত জাতিকে পীড়ন-শোষণ এবং জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠন তার ধর্ম হয়ে ওঠে (ঐ, ৫২১)। তাদের দেশহিতৈষা যেমন জনহিতৈষা নয়, তেমনই মানবহিতৈষাও নয় (র. র. ১৩ ঃ ৩৭৬)। আসলে তা শ্রেণীহিতৈষা। তাই সে রাষ্ট্রতন্ত্রপ্রধান নেশনত্ব তথা জাতীয়তাবাদের আদর্শ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে না।

পাশ্চাত্য ও তার জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এ উপলব্ধি প্রধানত বিশ শতকের শুরুতে এসে স্থির বিশ্বাসে পরিণত হয়। তাই দেখা যায়, জাতীয়তা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধারণা এমন এক সত্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে যা সংকীর্ণ চেতনার নয়, যা আপনার সীমাকে ভেঙ্গে বড় হতে চায়, কিন্তু সীমার বাইরে প্রভুত্বের হাত বাড়ায় না। জাতীয়তাবাদে যে স্বাতন্ত্র্য চেতনা থাকে তা সংকীর্ণদৃষ্টি, কিন্তু স্বতন্ত্র্যবোধ মঙ্গলের পথ ধরে তার অতিবৃদ্ধির বিকৃতি থেকে মুক্ত হতে পারে, বিশ্ব সভ্যতার আনুকূল্য পেতে পারে (১৩ ঃ ৪১৯)। মুশকিল হল আত্ম-স্বাতন্ত্র্যবোধ মানবিকতা-বোধকে অতিক্রম করতে চাইলে সংঘাতের ক্ষেত্র তৈরি হয়, যেমন দেখা যায় উগ্র-জাতীয়তাবাদে বা ফ্যাসিবাদে, যা আবার পরিণামে যুদ্ধবাদিতার রাজনীতিতে গিয়ে শেষ হয়।

পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের অমানবিক চরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ ও বিরূপতা তার প্রবন্ধেই নয়, কবিতায়ও প্রকাশ পেয়েছে (নৈবেদ্যর প্রাসঙ্গিক কবিতা 'মর্তভ্য')। এই রবীন্দ্র-প্রতিক্রিয়া অব্যাহত ধারায়। তবে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে তা তীব্র হয়ে ওঠে যদিও এর সূচনা আরও আগে। আয়িশায় বোয়ার যুদ্ধ থেকে পরবর্তী বহু ঘটনায় যুদ্ধবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী জাতীয়তাবাদের চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে। জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের তীব্র প্রতিক্রিয়া জাপানি ও পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের পটভূমিতে ন্যাশনালিজম (১৯১৭) পুস্তিকায় পরিস্ফুট। আর এ জন্য স্বদেশে-বিদেশে, প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে তাঁর সদালব্ধ জনপ্রিয়তায় (নোবেল পুরস্কারের কারণে) টান ধরে। এ সম্পর্কে জাপান, চিন, এমনকী ইউরোপ-আমেরিকায় তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদ-বিরোধী চিন্তা থেকে সরে আসেননি। বরং জাতীয়তাবাদ নামক ব্যাধির সঙ্গে তিনি পাশ্চাত্য-সাম্রাজ্যবাদের তথাকথিত গণতন্ত্রকেও (বলা যায় ধনবাদী গণতন্ত্র) অভিযুক্ত করেন। তাঁর চিন্তার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে তাঁকে চিঠি লেখেন ফরাসি মনীষী রোঁমা রোঁলা (১৯১৯)।

তাই বুঝতে পারা যায় যৌক্তিক হোক বা অযৌক্তিক হোক, জাতীয়তাবাদী স্বদেশিকতার পরিবেশ সত্ত্বেও কেন রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তায় জাতীয়তাবাদ এবং সেই সূত্রে স্বরাজ বা স্বাধীনতা আন্দোলন প্রাথমিক প্রেরণা হিসাবে গুরুত্ব পায় না। আর এই সূত্রেই অনুমান করা চলে, কেন জাতীয়তার বদলে এবং জাতিরাষ্ট্রের রাষ্ট্রতন্ত্রের বদলে মানবকল্যাণ-নির্ভর সমাজ-প্রধান ব্যবস্থা (কবির ভাষায় 'সমাজতন্ত্র') রবীন্দ্রনাথের কাম্য। এই আদর্শ ব্যবস্থার মধ্যেই তাঁর স্বদেশ সংক্রান্ত রাজনৈতিক চিন্তার প্রতিফলন স্পষ্ট। এবং এই সূত্রেই তাঁর জাতি-জাতীয়তা ও স্বদেশিক চিন্তার ভিন্নতা বুঝতে পারা যায়।

এই ভিন্নতার মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সমাজ-প্রধান ব্যবস্থাকে জনগণের জন্য কল্যাণকর বিবেচনা করেন এবং স্বরাজ-প্রচেষ্টার চেয়ে এই সমাজব্যবস্থা (স্বদেশী সমাজ) গড়ে তোলাকে বড় কর্তব্য মনে করেন। কিন্তু বিরাজমান রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতিতে (হয়তবা পরেও) তাঁর এই চিন্তা যে জটিলতা ও সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে সেকথা হয়ত রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে। কারণ দেশটা প্রাচীন ভারত নয়, রাষ্ট্রমঞ্চ বিদেশি ও সমাজের অন্তরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন। আবার মুক্ত স্বদেশেও রাষ্ট্র সত্তাকে বাতিল করা যাবে না। তাই পূর্ণরাষ্ট্রতান্ত্রিক বা পূর্ণ সমাজ-প্রধান ব্যবস্থার বদলে যৌথ মধ্যপন্থার কথাই হয়ত রবীন্দ্রনাথ ভেবে থাকবেন। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রযন্ত্র থাকবে অনেকটা অভিভাবকের দায়িত্ব নিয়ে (প্রাচীনকালের রাজার মত), আর সমাজের ভূমিকা হবে নির্বাহীর।

ঠিক এতটা স্পষ্ট ভাষায় না বললেও এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিচ্ছিন্ন উক্তি থেকে এমন ধারণা করা চলে। স্বদেশী সমাজ (১৯০৪) প্রবন্ধে বলেছেন, "আমাদের দেশে সরকার সমাজের বাহিরে। ___ আমরা নানাজাতির নানা রাজার অধীনতাপাশ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু সমাজ চিরদিন আপনার সমস্ত কাজ আপনি নির্বাহ করিয়া আসিয়াছে। (৩ ঃ ৫২৯)। সরকার প্রাচীন ভারতে রাজশক্তি আকারে ছিল। ___"বিলাত দেশের সমস্ত কল্যাণভার স্টেটের হাতে সমর্পণ করিয়াছে – ভারতবর্ষ তাহা আংশিকভাবে মাত্র করিয়াছিল (ঐ ঃ ৫২৮)। "আমাদের দেশে সমাজ সকলের বড় (ঐ ঃ ৫২২)" ___"কল্যাণ শক্তি সমাজের মধ্যে (ঐ ঃ ৫৫৩)।" ___ "যেরূপ ব্যবস্থা আমাদের চিরন্তন সমাজ প্রকৃতির অনুগত তাহাই অবলম্বন করিতে হইবে" (ঐ ঃ ৫৫৫)।

পরেও একই কথা বলেছেন (৩৩৬)। "চিরদিন ভারতবর্ষে ও চীন দেশে সমাজতন্ত্রই প্রবল, রাষ্ট্রতন্ত্র তার নীচে। দেশ যথার্থভাবে আত্মরক্ষা করে এসেছে সমাজের সম্মিলিত শক্তিতে" (২৪ ঃ ৪৪১)। এই মধ্যপন্থার কথা ভেবেই হয়ত অন্যত্র বলেছেন, "রাষ্ট্রনীতিক ঐক্য চেষ্টাকে উপেক্ষা করিতে পারি না (৩ ঃ ৫২২), "রাষ্ট্রনীতিক চেষ্টায় যে কোনো ফল নাই তাহা নহে, কিন্তু সে চেষ্টা আমাদের সামাজিক ঐক্য সাধনে, কিয়দ্দূর সহায়তা করিতে পারে" (৩ ঃ ৫২৫)। আবার অমিয় চক্রবর্তীকে লিখেছেন (১৯৩৯) ঃ "রাষ্ট্র বিটিশের দেওয়া আপোষ-মীমাংসার স্বরাজে তাঁর আস্থা ছিল না। বিশেষ করে যে-স্বরাজ দেওয়া ও যেরূপ নেওয়া সরকারের হাতে। বলেছেনও এ ধরনের কথা। বলেছেন স্বরাজের জন্য দেশকে নিজ চেষ্টায় তৈরি করতে হবে (২৪ ঃ ৪১৯)। এমন কী একথাও বলেছেন ঃ "ভারতেবর্ষের একটি মাত্র গ্রামের লোকও যদি আত্মশক্তির দ্বারা সমস্ত গ্রামকে আপন করতে পারে তাহলেই স্বদেশকে স্বদেশরূপে লাভ করবার কাজ আরম্ভ হবে" (ঐ ঃ ৪২০-২১)। চার বছর পরও (১৩৩৬) ওই একই কথা –"স্বরাজ আগে আসবে, স্বদেশের সাধনা তার পরে, এমন কথাও সত্যহীন এবং ভিত্তিহীন এমন বিচ্ছিন্ন শক্তিকে সংহত, কর্তব্যবুদ্ধিকে আকৃষ্ট, স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধিকে খর্ব, নিয়মের শাসনকে কায়েম করবে, করবে সংশ্লিষ্ট অন্য সব কাজ (ঐ)। উপর্যুক্ত চিঠিতেও 'স্বদেশ সেবায় গণদেবতার পূজা অর্থাৎ জনগণকে শিক্ষিত, সুস্থ, আনন্দিত, আত্মসম্মানে দীক্ষিত, জীবিকার ক্ষেত্রে সবল ও সকলকে ঐক্যবদ্ধ করার' কথা বলেছেন। এই যৌথ রূপকে তিনি বলেছেন 'সমাজ-রাজতন্ত্র'। তবে স্বদেশী সমাজ-এর শুরুতে রাজনৈতিক-সামাজিক ঐক্য এবং জাতিগত বা দৈশিক ঐক্যের বিষয়টি ছিল দেশের হিন্দু জনসংখ্যাকে নিয়ে, সর্বসম্প্রদায়কে নিয়ে নয় (নেশন, হিন্দুত্ব দ্রষ্টব্য)। এর কারণ তখন বিশ শতকের সূচনায় রবীন্দ্রচেতনার স্বল্পকালীন হিন্দুবাদিতা, যে-সময়টাকে কেউ তাঁর বঙ্গদর্শন পর্ব নামে চিহ্নিত করে থাকেন। অবশ্য এ ঘোর দ্রুত কেটে গেছে। 'স্বদেশী সমাজ' লেখার এক বছর পর রচিত 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' প্রবন্ধ।

তাঁর চিন্তায় উল্লিখিত সমাজ-প্রাধান্যের কারণে (হয়তবা বিদেশি শাসনের কারণও) দেশের কাজে তিনি রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর নির্ভরতা বাদ দিতে বলেছেন। বারবার বলেছেন "পরখাস্ত করিয়া এপর্যন্ত কোনো দেশই রাষ্ট্রনীতিতে বড়ো হয় নাই" (৪ ঃ ৪৪০), বলেছেন, "আবেদন-নিবেদন" (ঐ ঃ ৪৪৫), "পিটিশন বা প্রোটেষ্ট"–এর (১০ ঃ ৪৯৪) পথ বর্জন করতে। তাঁর মতে "পোলিটিক্যাল সাফল্যর চরম উদ্দেশ্য দেশের হৃদয়কে এক করা" (৩ ঃ ৫৩২) এবং তা স্বদেশি সমাজ গঠনের মধ্যে সম্ভব। তাঁর বিবেচনায় "সমাজের স্বাধীনতাই যথার্থভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। কারণ, মঙ্গল করিবার স্বাধীনতাই স্বাধীনতা, ধর্মরক্ষার স্বাধীনতা" (ঐ ঃ ৫৫৩)। এখানে বলা দরকার যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশ সংক্রান্ত রাজনৈতিক বক্তব্যে প্রায়শ ধর্ম শব্দটি ব্যবহার করেছেন সম্ভবত প্রচলিত অর্থে নয়। অন্যত্র তিনি স্পষ্টই বলেন "প্রাচ্য সভ্যতার কলেবর ধর্ম। ধর্ম বলিতে রিলিজন নহে, সামাজিক কর্তব্যতন্ত্র" (১১ ঃ ৪৮৫)।

স্বদেশি সমাজ ব্যবস্থাকে এতটা গুরুত্ব দেবার কারণে দেশের স্বরাজ বা স্বাধীনতা রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তায় দীর্ঘদিন যথাযথ গুরুত্ব পায়নি। বরং তাঁর চিন্তা ছিল "সমাজকে আত্মরক্ষার জন্য জাগ্রত হইতে, কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে" (৩ ঃ ৩৫৮)। এভাবে স্বদেশি-সমাজ ব্যবস্থা স্বরাজ-স্বাধীনতার বিকল্প হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া বিটিশের দেওয়া আপোষ-মীমাংসার স্বরাজে তাঁর আস্থা ছিল না। বিশেষ করে যে-স্বরাজ দেওয়া ও যেরূপ নেওয়া সরকারের হাতে। বলেছেনও এ ধরনের কথা। বলেছেন স্বরাজের জন্য দেশকে নিজ চেষ্টায় তৈরি করতে হবে (২৪ ঃ ৪১৯)। এমন কী একথাও বলেছেন ঃ "ভারতেবর্ষের একটি মাত্র গ্রামের লোকও যদি আত্মশক্তির দ্বারা সমস্ত গ্রামকে আপন করতে পারে তাহলেই স্বদেশকে স্বদেশরূপে লাভ করবার কাজ আরম্ভ হবে" (ঐ ঃ ৪২০-২১)। চার বছর পরও (১৩৩৬) ওই একই কথা –"স্বরাজ আগে আসবে, স্বদেশের সাধনা তার পরে, এমন কথাও সত্যহীন এবং ভিত্তিহীন এমন

স্বরাজ" (ঐ ঃ ৪৪৪)।

রবীন্দ্রনাথ স্বরাজ সম্বন্ধে উপরের কথাগুলো বলেন আত্মশক্তি নিবন্ধমালা রচনার অনেক পরে, শচীন্দ্রনাথ সেনের লেখা 'Political Philosophy of Rabindranath' বইয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে লেখা 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' প্রবন্ধে (১৯২৯)। সেখানেও তিনি উল্লেখ করেন ৩৫/৩৬ বছর আগে সাধনা পত্রিকায় দেশের রাজনৈতিক নেতাদের আচরণ সম্পর্কে তাঁর অভিযোগের কথা। তাঁর মতে 'কংগ্রেস-রাজনীতির সমস্ত আবেদন-নিবেদন ছিল শাসক-রাজের কাছে, দেশের লোকের কাছে নয়'। অথচ রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত 'দেশের সমস্ত বুদ্ধিশক্তি ও কর্মশক্তিকে সংঘবদ্ধভাবে দেশের কাজে বিস্তৃত করা' (২৪ ঃ ৪৪২)। তাঁর বিশ্বাস ছিল 'জড়শক্তির চরকার আদর্শে স্বরাজ সম্ভব নয়'। তখনকার রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এ অভিযোগ মিথ্যা ছিল না। স্বদেশী, ব্যয়কট, অসহযোগ ইত্যাদি আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ যে বারবার স্বদেশী সমাজ গড়ার কথা বলেন, দেখা যেতে পারে কি আছে তাঁর প্রস্তাবিত সমাজ পরিকল্পনায়। স্বদেশী সমাজের তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন, প্রাচীন ভারতীয় (এবং চৈনিক) সভ্যতা বরাবর সমাজপ্রধান, রাষ্ট্রপ্রধান নয়, সমাজের দায়িত্ব শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অন্ন-ধনসম্পদের ব্যবস্থা করা (৩ ঃ ৫২৫)। রাজশক্তি তথা রাষ্ট্রশক্তিকে উপরে রেখেই সমাজ এসব মৌল দায়িত্ব পালন করে এসেছে (ঐ ঃ ৫২৯)। অন্যদিকে ইউরোপের মতো 'এদেশের জনসমূহ নাগরিক নয় —চিরদিনই চীনের মত ভারতবর্ষ পল্লীপ্রধান (পল্লী প্রকৃতি, কলিকাতা, ১৩৯৩, পৃঃ ১৯৬)। এই সামাজিক —রাষ্ট্রনৈতিক বৈশিষ্ট্য একান্ত-ভাবেই প্রাচ্য ও ভারতীয়।

কিন্তু ইতিহাসের অচেতন শক্তি হিসাবে ইংরেজ এদেশের স্থবির, সংস্কারাচ্ছন্ন ও পশ্চাদমুখী স্বাধীন সমাজ ভেঙ্গে ফেলেছিল, সেখানে নতুন আধুনিক সমাজ গড়ে তোলার চেষ্টা করেনি। বরং উপনিবেশবাদী শোষণের ফলে কৃষি ও কুটিরশিল্প-নির্ভর গ্রাম হয়ে উঠেছিল পঙ্গু, জীর্ণ, দুঃস্থ ও অধঃপতিত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'ইংরেজ আমাদের পল্লী জীবনের গ্রন্থি কেটে দিয়েছে। আমাদের মৃত্যু ঐ নীচের দিকে বোধে। সেখানে কী অভাব, কী দুঃখ, কী অন্ধত্ব, কী শোচনীয় নিঃসহায়তা। এই খানেই প্রাণ সঞ্চার করবার সামান্য আয়োজন করেছি' (ঐ ঃ ১৯৭)। এভাবেই তাঁর গ্রাম-পুনর্গঠনের যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। শুধু ইতিহাস-চেতনাই নয় পদ্মাতীরে বসবাস উপলব্ধে গ্রামীণ সমাজের নিদারুণ রিক্ততাও রবীন্দ্রনাথকে উদ্বীপ্ত করে স্বদেশি সমাজের গঠনের মাধ্যমে পল্লী-উন্নয়নের কাজ হাতে নিতে। তাঁর বিচারে দেশ অর্থ বিশাল জনসখ্যার গ্রাম। আর এই সূত্রে ছিল সমাজ-নির্ভর 'নেশন' গড়ে তোলার দুরুত্ত চিন্তা। পরিকল্পিত সমাজের মূলকথা ছিল প্রাচীন সমাজ-আদর্শ এবং সেই সঙ্গে আধুনিক চিন্তার সমবায় ও প্রযুক্তির ব্যবহার যাতে স্বনির্ভর, শিক্ষিত, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী স্বাধীন সমাজ গড়ে ওঠে, যা হবে শক্তিমান আধুনিক সমাজ। সমাজের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁর কথা —এখানে ধর্ম নির্বিশেষে সবাই সামঞ্জস্য খুঁজে পাবে, তবে "সেই সামঞ্জস্য অহিন্দু হইবেনা, তাহা বিশেষভাবে হিন্দু ____ তাহার আত্মা ভারতবর্ষের" (৩ ঃ ৫৫০)। এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ যে হিন্দুত্ববাদী, এমনকি রক্ষণশীলও হয়ে উঠেছিলেন (প্রণাম সম্পর্কিত ঘটনা, ১৯০২, স্মর্তব্য) সে সম্পর্কে সমালোচকগণ সবাই একমত। হয়ত সে প্রভাবে সাময়িক হলেও 'স্বদেশী সমাজকে তিনি অনুভব করেছেন মূলত হিন্দু সমাজ রূপে'। কিন্তু সে মনোভাব স্থায়ী হয়নি। স্বদেশি আন্দোলনের অভিজ্ঞতাই সম্ভবত জাতীয় জীবনে সম্প্রদায়গত ঐক্যের গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁকে দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকবে (লোকহিত, কালান্তর)। 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে প্রস্তাবিত কর্তৃপক্ষীয় একজন সমাজপতির বদলে তাই রবীন্দ্রনাথ 'অবস্থা ও ব্যবস্থা'য় (১৯০৫) দুইজন সমাজপতির ব্যবস্থা রাখেন এবং সর্বজনার ঐক্যের উপর জোর দিয়ে বলেন (৩ ঃ ৬০০-১৯)ঃ

"এখন হইতে আমরা হিন্দু ও মুসলমান, শহরবাসী ও গ্রামবাসী, পূর্ব ও পশ্চিম পরস্পরের বন্ধন প্রতিষ্ঠাকে অনুভব করিতে থাকিব। ___একত্রে মিলিয়া কাজ করিলেই মিলন ঘটে। __এই অভিপ্রায়টি মনে রাখিয়া দেশের কর্মশক্তিকে বিশেষ একটি কর্তৃপক্ষর মধ্যে বদ্ধ করিতে হইবে। একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানকে আমরা এই সভার অধিনায়ক করিব। __আর দ্বিধা না করিয়া গ্রামের স্বকীয় শাসনকার্য নিজের হাতে লইতেই হইবে। ___নিজের পল্লী পঞ্চায়েতকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে।"

সমাজ সম্পর্কিত রাজনৈতিকচিন্তায় রবীন্দ্রনাথের এই পরিবর্তন অসাধারণ, বিশেষ করে অধিনায়ক নির্বাচনে সংখ্যানুপাতের বদলে সমসংখ্যার বিবেচনায়, যে-রাজনৈতিক বিচক্ষণতা এর পর থেকে রবীন্দ্রনাথ নানা প্রসঙ্গে প্রকাশ করেছেন এবং যা প্রায় দুই দশক পরের রাজনৈতিক সমঝোতা —দেশবন্ধুর 'বেঙ্গল প্যাক্ট'-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। দুঃখজনক যে চিত্তরঞ্জনের অকাল মৃত্যু ওই সমঝোতাই বাতিল করে না, দুই সম্প্রদায়ের রাজনীতিকে দুই ভিন্ন ধারায় টেনে নিয়ে দেশ বিভাগ ও বাঙালি জাতি-বিভাগের অবাঞ্ছিত পরিণতিতে পৌঁছে দেয়।

এর পর থেকে তাঁর সম্প্রদায়গত ও সর্বজনগত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা ক্রমেই পরিস্ফুট হয়েছে। যেমন গোরার রূপান্তরে ও তমিজ-ফক্কর সর্দারের প্রতীকী উপখ্যানে (১৯০৭-০৯), পাবনা সম্মিলনে সম্ভাপতির বাস্তববাদী অভিযাষণে (১৩১৪), অসহযোগের প্রতিক্রিয়ায় (লোকহিত), 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশের বয়ানে (১৩২২) তেমনই কালান্তর-এর একাধিক প্রবন্ধে, অন্যত্র বিক্ষিপ্ত মন্তব্যে। এ জন্যই আমার মনে হয় 'স্বদেশী সমাজে' উল্লেখিত 'হিন্দু' শব্দটি সম্ভবত বিশেষ ধর্মীয় অর্থে নয়, হিন্দু, হিন্দু-ভারত ভারতীয় অর্থে ব্যবহার করে থাকবেন। অবশ্য এ সম্পর্কে সংশয় নিরসনের উপায় নেই।

স্বদেশী রাজনীতির ক্ষেত্রে এই সর্বজনীন চেতনা অর্থাৎ স্বদেশহিত ও জনহিতকে এক করে দেখা, গ্রাম-নগর পারাপারের গুরুত্ব এবং সর্ব সম্প্রদায়ের ঐক্যে ও ঐকামতে জাতি গঠন ও জাতীয় ঐক্যের দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিকচিন্তার এক অসাধারণ বাস্তববাদী দিক। কিন্তু বিপরীত বিন্দুতে স্বদেশে ইংরেজের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর দুর্বলতা বা প্রত্যাশার মোহ যেতে অনেক সময় লেগেছে। 'অবস্থা ও ব্যবস্থা'র উদ্ধৃতিতে 'পূর্ব ও পশ্চিম'-এর মিলনের কথায় সে ইঙ্গিত মেলে। কিন্তু এর স্পষ্ট প্রকাশ মেলে 'পূর্ব ও পশ্চিম' (১৯০৮), 'ছোট্টো ও বড়ো' (১৯১৭) প্রবন্ধাদিতে এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উক্তিতে। এর পেছনে ছিল বিশ্বজনীনতার বা পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-সংস্কৃতির টান, কিন্তু ইংরেজ মনীষার প্রতি অনুরাগ, সর্বোপরি বড় ইংরেজ ছোট ইংরেজ তত্ত্ব। অথচ রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতায় ছিল বড় ইংরেজের পার্লামেন্টে ভারতে সংঘটিত ছোট ইংরেজের বর্বরতা সম্পর্কে নগ্ন পক্ষপাতিত্বের ঘটনা।

স্বদেশি সমাজ গঠন সম্পর্কে রবীন্দ্র-চিন্তার প্রধান বিষয় ছিল সম্প্রদায়-নির্বিশেষ জনঐক্যের ভিত্তিতে তৃণমূল স্তরে কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং সে উদ্দেশ্যে নীচ থেকে সংগঠন গড়ে তোলা (১০ ঃ ৫২১)। কিন্তু কোনও ধারার স্বদেশী রাজনীতিই জনচিত্তের সঙ্গে জনস্বার্থ-নির্ভর যোগাযোগ ছিল না বলেই মন্তব্য করেন যে, 'পোলিটিক্যাল যোগ, ইকোনমিকযোগ সর্বশক্তির যোগেই সার্থক হতে পারে' (২৪ ঃ ৩২৬)। রবীন্দ্রনাথের এ বিশ্বাস পূর্বাপর। তাই স্বদেশি যুগেও সর্বজনার মিলনের আহবান জানান আবেগময় ভাষায় যেখানে বাংলার মাটি বাংলার জল গানটি সমাপনী প্রার্থনাগীতির মতো ধ্বনিত হতে থাকে (৪ ঃ ৪৭৩)। "বন্ধুগণ, যে চাষি চাষ করিয়া এতক্ষণে ঘরে ফিরিয়াছে তাহাকে সভ্যযণ করো, শস্য-মুখরিত দেবালয়ে যে পূজারী আগত হইয়াছে তাহাকে সভ্যযণ করো, অস্ত সূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নমাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সভ্যযণ করো, যে রাখাল যেনু দলকে গোষ্ঠগৃহে ফিরাইয়া আনিয়াছে তাহাকে সভ্যযণ করো", ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের সমাজ উন্নয়নের যে দিকটি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে তা হল শিক্ষা। জনজীবনে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলতে শুরু করেন গোড়া থেকে, স্বদেশি সমাজ পর্ব থেকে একেবারে শেষ দিকে পর্যন্ত একই কথা বলেছেন। এক কথায় 'দেশকে মুক্তি দিতে হলে দেশকে শিক্ষা দিতে হবে' (২৪ ঃ ৩৬২) এবং এই চিন্ত আরও গভীরতা পায় রাশিয়া ভ্রমণের পর। পাশাপাশি গুরুত্ব আরোপ করে গ্রামীণ শোষণের মূল উচ্ছেদ করার দিকে। এতসব নিয়েও তাঁর স্বদেশি সমাজ জাতীয়তাবাদী বা বিপ্লববাদী কোনও রাজনীতিরই নজর কাড়তে পারেনি, যদিও এদের সঙ্গে যোগাযোগ রবীন্দ্রনাথের যথেষ্টই ছিল। তাঁর পরিকল্পনা সমালোচিত হয়েছে কবিকল্পনা বা সংস্কারবাদিত হিসাবে। এমনকি স্বাধীনতা আন্দোলনকে গঠনমূলক পথে নিয়ে যাবার অভিযোগও উঠেছে।

বিষয়টি এতটা সরল মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের সমাজগঠন পরিকল্পনা যে সনাতন অতীতের পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টা ছিল না তা সম্প্রদায়গত ঐক্য প্রচেষ্টা থেকে বোঝা যায়। বোঝা যায় হিন্দুয়ানির অনৈক্যের ধুলো ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্যে (১০ ঃ ৫৫৮)। আর সংস্কারবাদিত্ব যে নয় তা প্রমাণ মেলে পরিকল্পনার জনস্বার্থ ও জনঐক্যমূলকচিন্তায়। তাঁর প্রচেষ্টা নিছক সংস্কারমূলক কাজ এবং পরোক্ষে শাসকরাজের পক্ষে ছিল না বলেই ইংরেজ শাসন একে সুনজরে দেখেনি।

আসলে সমস্যাটা ছিল অন্যত্র। রবীন্দ্রনাথ ভেবে দেখেননি যে, বিদেশি-রাজ তার উপনিবেশ রাজ্যে এমন কোনও কল্যাণী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে দেবে না যেখানে থাকবে ব্যাপক জনশিক্ষা ও পরিকল্পিত জনঐক্য যা সাম্রাজ্যের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে। তাই আপাত-নিরীহ স্বদেশি সমাজ কর্মীদের উপর বারবার পুলিশি হামলা ও নির্যাতন চলেছে যা রবীন্দ্রনাথ ঠেকাতে পারেননি। তাই ব্যাহত হয়েছে কার্যক্রম। এই স্বনির্ভর সমাজ গঠনের পূর্ণতার জন্যই প্রয়োজন ছিল বিদেশি শাসনের অবসান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা বুঝতে চাননি। চাননি, ইংরেজ শাসনের হিতকরী দিক সম্পর্কে তাঁর মোহমুক্তি অনেক অনেক দেরিতে ঘটেছে বলে। এ দুর্বলতা অনস্বীকার্য।

এ দিক থেকে দীর্ঘদিন দোটানায় ভুগেছেন রবীন্দ্রনাথ। একদিকে ইংরেজ শাসনের হিতব্রতী সম্ভাবনা অন্যদিকে ইংরেজ শাসনের অপকীর্তির প্রতিক্রিয়া —এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব দীর্ঘকাল চলেছে। এমন কথাও রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমাদের শুনতে হয়েছে, 'যে-ভারতবর্ষ অতীতে অফুরিত হইয়া ভবিষ্যতের অভিমুখে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতেছে ইংরেজ সেই ভারতের জন্য প্রেরিত হইয়া আসিয়াছে' (পূর্ব ও পশ্চিম, ১৯০৮)। এ যেন আনন্দমঠের সেই মহাপুরুষের বাণী: "ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। ইংরেজ রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে, নিরুপদ্রবে ধর্মাচরণ করিবে।"

অন্যদিকে এই রবীন্দ্রনাথই ইংরেজ শাসনে ভারতবাসীর বেদনা ও অপমানের কথা বলেন (২৪ ঃ ৪৩৯), বলেন সরকার বাহাদুরের অমানবিক প্রভাবের কথা (২৪ ঃ ৪৪০), ইংরেজ কুশাসনের সমালোচনা করে (১৩০৫) লেখেন 'কণ্ঠরোধ' (১০ ঃ ৪২৪-৩১), 'বহুরাজকতা'য় (১৩১২) ইংরেজ জাতের ভারত-শোষণের দিকে আমাদের নজর ফেরান (২৪ ঃ ২৮২)। আবার নীতি হিসাবে রাজনৈতিক গুপ্ত হত্যা ও চুরি ডাকাতির বিরোধিতা করেও রবীন্দ্রনাথ স্বদেশি বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের মহিমার প্রতি শ্রদ্ধা জানান, বিপ্লবীদের প্রতি পুলিশি অত্যাচারের তীব্র সমালোচনা করেন (২৪ ঃ ২৮৬-৮৭) এবং বলেন 'এসব দুষ্ট সমস্যার মূলে স্বাধীন শাসনের অভাব' (ঐ ঃ ২৯০)। ডাক দেন দেশের জন্যলক্ষ্মীছাড়া তরুণদের অসাধ্য সাধনের জন্য, এই বলে যে 'তারুণ্যের জয় হোক' (ঐ ঃ

২৬০)। এমনকী তৎকালীন রাজনৈতিক তারুণ্যের বাঙালি নায়ক সুভাষচন্দ্রকে সর্ব-ভারতীয় প্রেক্ষাপটে জননায়কের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন রবীন্দ্রনাথ। কংগ্রেসের বাম রাজনীতির অনুসারী সুভাষচন্দ্রের কর্মোদ্যোগের প্রতি নিঃসংশয় সমর্থন জানান কবি।*

উদ্ধৃতি বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই। সবচেয়ে বড় কথা দেশের যে-কোনও রাজনৈতিক সংকটে আত্মদ্বন্দ্বের এই রবীন্দ্রনাথই বড় ইংরেজের দোহাই দিয়ে চুপ থাকেননি। যেমন লেখায় তেমনই কর্মোদ্যোগে অন্যায়ের বিরোধিতা করেছেন। আমরা মনে করতে পারি স্বদেশি আন্দোলনে তাঁর দৃপ্ত ভূমিকা (কর্মে ও রচনায়), জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে শাসনদণ্ডের সমালোচনা ও নাইটহুড বর্জন (যখন দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিষ্ক্রিয়), দেশে প্রবল রাজনৈতিক দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সভায় (১৯১৭) 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধে সরকারের নির্ভীক সমালোচনা, হিজলি হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় সভাপতি রবীন্দ্রনাথের ভাষণ (১৯৩১), ইংরেজ শাসনের ল অ্যাণ্ড অর্ডারের সমালোচনা ও শাসনতান্ত্রিক পরাক্রমের প্রতি ধিক্কার (২৪ ঃ ২৫২) ইত্যাদি বহুতর প্রতিবাদী ঘটনা। স্বদেশে ইংরেজ শাসনবিরোধী রবীন্দ্রনাথের মোহমুক্ত অবশেষ রূপ দেখতে পাই 'কালান্তর' থেকে 'সভ্যতার সংকট'-এ যা অত্যাচারী শাসকের প্রতি অভিসম্পাতে বাঙ্ময় (১৯৪১)। কয়েক মাস পর মিস র‍্যাথবোনের খোলাচিঠির জবাবে রাজনৈতিক স্বদেশিয়ানার তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ খোলা চিঠিতে (জুন ১৯৪১)। এভাবেই রাত্য রবীন্দ্রনাথ স্বদেশি রাজনীতি প্রসঙ্গে দ্বিধাদ্বন্দ্ব অতিক্রম করে তাঁর স্বাদেশিকতার ঋণ শোধ করেন প্রকৃত দেশপ্রেমিকের মতো।

রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত পরিবর্তন হঠাৎ করে আসেনি। এসেছে একের পর এক রাজনৈতিক ঘটনার প্রতিক্রিয়ায়। সেই রাজনৈতিক উত্তাপের প্রেক্ষাপট হিসাবে স্মরণ করা যায় ১৯১৫ সালে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার ফাঁসির ঘটনা ও বালাসোরে বিপ্লবী বাঘাযতীন গ্রুপের সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ, ১৯১৭-১৮ সালে দেশে ব্যাপক দমননীতি, ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের বর্বর হত্যাকাণ্ড, ১৯১৮-২২ সালের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম, ১৯২৬ সালে ব্যাপক শ্রমিক ও যুব আন্দোলন, সাইমন কমিশন-বিরোধী আন্দোলনে দমননীতি, ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রগার লুণ্ঠন, ১৯৩১ সালে হিজলি বন্দিনিবাসে হত্যাকাণ্ড, ১৯৩০-৩৪ সালে ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলনের ঢেউ ইত্যাদি নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রচেতনায় প্রভাব রেখেছিল। আবার এরই ফাঁকে ১৯৩০ সালে রুশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, বিরাট কর্মযজ্ঞের সঙ্গে পরিচয়, যা ছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চরিত্র নিয়ে পরিস্ফুট।

স্বদেশি রাজনীতির এই প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তার পরিবর্তন ও রূপান্তরের পেছনে ছিল ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের গোত্রান্তর। এর সমধারায় প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটেছে মূলত বলাকা পর্ব থেকে ক্রমান্বয়ে কবিতায়, প্রবন্ধে, নাটকে, বিশেষভাবে শেষ দশকের কবিতা, প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রে। 'সুপ্রভাত' থেকে 'ঝড়ের খেয়া' বা 'বিজয়ী' কিংবা 'প্রশ্ন', কিংবা দানবের সাথে সংগ্রামের প্রস্তুতি ও অনুরূপ বহুকবিতা (এবার ফিরাও মোরে হয়ত সময় হিসাবে ব্যতিক্রমী) ছিল স্বাদেশিকতার চেতনায় উজ্জ্বল।

প্রসঙ্গত একটি কথা বলা দরকার যে, স্বদেশি রাজনীতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের পেছনে শুধু ইউরোপীয় —মুগ্ধতাই ছিল না, ছিল স্বদেশি রাজনীতির দীর্ঘদিন ব্যাপী আপোষবাদিতা, হীনমন্যতা, জনবিচ্ছিন্নতা, নীতিগত ভ্রান্তি, আচরণগত স্খলন যা রবীন্দ্রনাথকে স্বাদেশিকতার সত্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধাহীন করে তুলেছিল। তাঁর বহু রচনায় সেই প্রতিক্রিয়ার পরিচয় মেলে। তাঁর ধারণা ছিল 'রাজনীতিকদের ভারতবর্ষ স্বার্থপর ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ', সাধারণ মানুষের নয়। সেজন্যই স্বরাজ ও স্বাধীনতার আন্দোলন থেকে দূরে এসে জনস্তরে কাজের মাধ্যমে জনশক্তিকে জাগিয়ে তোলার নীতিতে বিশ্বাসী হন। স্পষ্ট বলেন ঃ সর্বশ্রেণীর জনগণের ঐক্য ও মিলের মধ্যে রয়েছে দেশে নবযুগের সাধনার সূত্র (নবযুগ, কালান্তর, ১৩৩২)। আর সেজন্যই রবীন্দ্রনাথ স্বদেশি রাজনীতিকে গ্রামে নিয়ে যেতে চেয়েছেন যেখানে সম্মিলিত সাধনায় স্বরাজের প্রদীপ জ্বলা শুরু হবে (২৪ ঃ ৪২২)। আর তা থেকেই সম্ভব হতে পারে গ্রাম-নগরের রাজনৈতিক সেতুবন্ধন।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী রাজনীতির কথা শেষ করার আগে একটি বিষয়ের গুরুত্ব উল্লেখ না করলেই নয়। স্বদেশি রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের গুরুত্ব অরাজনীতিবিদ রবীন্দ্রনাথ যেমন করে বুঝেছিলেন তেমনটি এদেশের কোনও রাজনীতিবিদই বোঝেননি বলে আমার বিশ্বাস (চিত্তরঞ্জন ও অংশত সুভাষচন্দ্র ব্যতিক্রম)। সাময়িক হিন্দুত্ববাদিতার ঘোর-কাটানো রবীন্দ্রনাথই বারবার নানা উদাহরণ, নানা রাজনৈতিক ঘটনা তুলে ধরে রাজনীতিকদের বোঝাতে চেয়েছেন যে ভারতের মূল রাজনৈতিক সমস্যা হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। এই সম্প্রদায়গত অনৈক্য দূর করা না গেলে দেশের স্বরাজ, স্বাধীনতা কোনটাই আসবে না, জাতীয়তাবাদী কিংবা বিপ্লববাদী কোনও আন্দোলন ফলপ্রসূ হবে না।

১৯০৫ সালে লেখা 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' থেকে কালান্তর গ্রন্থের 'হিন্দু-মুসলমান' নিবন্ধের ফাঁকে বহু রচনায় এ সমস্যার কারণ, বাস্তবতা ও সমাধান নিয়ে আলোচনা করেছেন স্বাদেশিকতার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। উভয় সম্প্রদায়ের ত্রুটি, সীমাবদ্ধতার সমালোচনা করেছেন। রাজনীতিকদের বোঝাতে চেয়েছেন, এ সমস্যা যতটা ধর্মনৈতিক তারচে অনেক বেশি সামাজিক-অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক। উভয় সম্প্রদায়ের অসমতা ও বৈষম্য রেখে দিয়ে রাষ্ট্রনীতির প্রলেপে যুক্তবাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা চলবে না (২৪ ঃ ৪৪৮)। এর জন্য মিলতে হবে গোড়ায় (ঐ ঃ ৪৫০)। জীবিকার মিলে, সামাজিক আচার-আচরণের মিলে, সাহিত্য সাধনার মিলে, সর্বোপরি

মনুষ্যত্বের মিলে এ ভেদবুদ্ধি দূর হতে পারে। দুই সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক সমতা মিলনের, সেই সূত্রে স্বশাসনের চাবিকাঠি। এ জন্য প্রয়োজনে ছাড় দিতে হবে। এক্ষেত্রে রাজনীতিবিগণ বিক্ষিপ্তভাব পরিচয় দেননি। তাই রবীন্দ্রনাথের আশংকাই সত্য হয়েছে 'জতুগৃহে আগুন লেগে' দেশ বিভক্ত হয়েছে ধর্মীয় রাজনীতির ভিত্তিতে।

॥২॥

রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশে ইংরেজ শাসক সম্পর্কে সাময়িক প্রশ্রয় কিংবা দেশের স্বাধীনতা বিষয়ে একসময়ের দ্বিধাদ্বন্দ্বের শিকার হওয়া সত্ত্বেও অন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে বরাবর মুক্ত চিন্তার পরিচয় রেখেছেন। যাঁরা মনে করেন রবীন্দ্রনাথের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চিন্তা বহির্বিশ্ব প্রসঙ্গেও দেরিতে প্রকাশ পেয়েছে তাদের সঙ্গে আমি একমত নই। তারুণ্যে ইউরোপীয় সভ্যতা সম্পর্কে মুগ্ধতা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের অমানবিক আচরণ তাঁকে বরাবর ক্ষুব্ধ করেছে। হয়ত বিশ্ব ভ্রমণ ও বিশ্বরাজনীতির খবরাখবরে অবহিত থাকার কারণে সাম্রাজ্যবাদের চেহারাচরিত্র সহজেই তাঁর চোখে পড়েছে।

তাই দেখা যায় উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই তরুণ রবীন্দ্রনাথের লেখায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেই কবে ১৮৮১ সালে চিনে ইংরেজের বাণিজ্যিক পীড়নের বিরুদ্ধে তাঁর লেখা 'চীনে মরণের ব্যবসায়'। সুদূর আফ্রিকার জুলুভূমি থেকে চিন বা আফগানিস্তানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্যায় সদর্প বিচরণের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ সোচ্চার। স্বদেশে ইংরেজ শাসনের হিতকরী ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর প্রশ্রয় যখন স্পষ্ট তখনও 'ক্ষুধিত ইম্পিরিয়ালিজমের স্বার্থ জাল বিস্তার' এবং উপনিবেশে তাদের কেন্দ্রীভূত শক্তির প্রকাশ (৩ ঃ ৫৫৯-৬০) রবীন্দ্রনাথের চোখ এড়ায় না। বোয়ার যুদ্ধে বা বঙ্গার যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতা সম্পর্কে তাঁর ধিক্কার স্পষ্ট। দুই শতকের সেই সন্ধিক্ষণ পেরিয়ে লোয়েস ডিকিনসনের লেখা 'চিনেম্যানের চিঠি' বক্তব্য উদ্ধার করে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী রূপ সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান (৪ ঃ ৪০২)। অন্যদিকে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সমাজতন্ত্র-বিরোধী ফরাসি চিন্তাবিদ গিজোর অধ্যাত্মবাদী মতামত উল্লেখ করেও রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'ইউরোপীয় সভ্যতা তার স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে একাগ্র, প্রবল, নিষ্ঠুর ও সংহাররূপী, মানবত্ববাদী ধর্ম সে বর্জন করে চলেছে' (৪ ঃ ৪১৯)।

রবীন্দ্রনাথ যে আত্যন্তিক যুদ্ধবিরোধী ও শান্তিবাদী, আঞ্চলিকযুদ্ধ বিশেষ করে বিশ্বযুদ্ধে তাঁর প্রতিক্রিয়া থেকে তা স্পষ্ট, যেমন প্রবন্ধে তেমনই কবিতায়। জাতিপ্রেম থেকে উগ্র-জাতীয়তাবাদী চেতনার পথ ধরে সাম্রাজ্যবাদী-ফ্যাসিবাদী প্রভুত্ব-প্রিয়তার প্রকাশ বৃথাতে রবীন্দ্রনাথের অসুবিধা হয়নি। প্রমাণ জাপানি ও পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদী উগ্রতার বিরুদ্ধে 'ন্যাশনালিজম' পুস্তিকা। 'মা মা হিংসী' যুদ্ধবাদিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং একই সঙ্গে যেন শান্তির পক্ষে উচ্চারণ (১৬ ঃ ৪৯০)। এককথায় যুদ্ধের রাজনীতি তাঁকে সব ধরণের আধিপত্যবাদী শক্তির চরিত্র অনুধাবনে সাহায্য করেছে। তাই জাপানের চিন আগ্রাসন বিরুদ্ধে কবি আফ্রিকায় ইউরোপীয় জাতিগুলোর অত্যাচারের বিরুদ্ধে একই সুরে ধিক্কার, তেমনই ধিক্কার দক্ষিণ আমেরিকায় তাদের আচরণ সম্পর্কে। এমনকী যুক্তরাষ্ট্রের বর্ণ বিদ্বেষও সমালোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। স্বভাবতই ১৯১৯ সালে শান্তিবাদী রোলাঁর 'চিন্তার স্বাধীনতা' দলিলে কিংবা মার্কসবাদী বার্বুসের সমাজবাদী ক্লার্ত ঘোষণাপত্রে নির্দ্বিধায় স্বাক্ষর দেন। বিশ্বের সর্বত্র আধিপত্যবাদী বর্বরতার প্রকাশ তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। ইতালি ভ্রমণের সাময়িক ভ্রান্তি ঘুচিয়ে ইতালীয় ফ্যাসিবাদের চরিত্র উন্মোচন করেন সঠিকভাবেই। প্রসঙ্গত ১৯২৬ সালে ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর ফ্যাসিবাদ-বিরোধী বক্তব্য স্মর্তব্য। বিশ্ব সভ্যতার অমানবিক আচরণে ক্ষুব্ধ, যন্ত্রণাত্ত রবীন্দ্রনাথ তাই বিশ্বের কোথাও না কোথাও ব্যক্তিক্ষম দেখতে চেয়েছেন। হয়ত তাই ১৯৩০ সালে রাশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁর চেতনায় কিছুটা সাফুন্নার স্পর্শ রেখে যায়। বলশেভিজমের সমালোচনা করেও সমাজবাদী ব্যবস্থার কল্যাণী দিকের প্রতি প্রকাশ্যে সমর্থন জানান, এমনকী নব্যরাশিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সমালোচনা করতে ছাড়েন না। মার্কিনি ভূমিতে দাঁড়িয়েও বলতে দ্বিধা করেন না যে পশ্চিমশক্তি দুর্বলকে অপমান করতে, শোষণ করতে খুবই দড়, কিন্তু শক্তিমানকে নয়। পশ্চিমি গণতন্ত্রও তাঁর কাছে মনে হয়েছে ধনবাদী শক্তিমানের গণতন্ত্র। এসব কারণে পশ্চিমি দুনিয়ায় তাঁর জনপ্রিয়তায় টান ধরে, সমালোচনার শিকার হন রবীন্দ্রনাথ। সে সমালোচনা পশ্চিমে এখনও বিদ্যমান (রবিনসন)।*

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এ মানসিকতা ক্রমেই গভীর ও তীব্র হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের প্রতি ধিক্কার (কালান্তর প্রবন্ধ) শেষ পর্যন্ত অভিসম্পাতে পরিণত (সভ্যতার সংকট)। এখন ঘৃণ্ড্য আর সংশয় নয়। ঘরে বাইরে মিলেই ইউরোপীয় সভ্যতার স্বরূপ সম্পর্কে মোহমুক্ত হবার কারণেই বলতে পারেন ঃ "য়ুরোপের বাইরে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্য নয়, আগুন জ্বালাবার জন্য" (২৪ ঃ ২৫০)। এ সম্পর্কে বিস্তরিত আলোচনায় না গিয়েই বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদকে এ আগুন জ্বালাতে দেখেন চিনে, পারস্যে, আফ্রিকায়, দক্ষিণ আমেরিকায় এবং বিশ্বের নিরীহ দেশগুলোতে। য়ুরোপের সর্দার পোড়ো জাপানকেও দেখেন চিনে ও কোরিয়ায় একই চেহারায়। আর তখনই বর্বরতা দিয়ে বর্বরতা ঠেকানোর প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ 'কল্যান্ত'কামী।

প্রভুত্ববাদী, অনাচারী, মানববিরোধী ও সমরতন্ত্রী জার্মানিকে যেজন্য রবীন্দ্রনাথ অভিযুক্ত করেন, সে অভিযোগ থেকে রেহাই পায় না ইতালি বা জাপান, এমনকী ইংরেজের। ইংরেজের হাতে ভারতীয় বাণিজ্য বিনষ্ট হতে বা চিনকে বিষজর্জরিত হতে দেখে যেমন তিক্ত হয়ে ওঠেন, অনুরূপ তিক্ততা নিয়ে জাপানের চিনা

আগ্রাসনের বিরুদ্ধে চিঠি লেখেন কবি ইয়েনে নোগুচি এবং বিপ্লবী রাসবিহারী বসুকে। স্পেনের গৃহযুদ্ধে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সমর্থন জানান গণতন্ত্রী সরকারকে। বক্তৃত কালান্তর গ্রন্থের প্রায় প্রতিটি রচনায় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা তিক্ততীব্রতা নিয়ে পরিস্ফুট। এ তিক্ততার চেতনা মানব কল্যাণ ও মানব ইতৈষণার। তাঁর মানবতাবাদী রাজনৈতিকচেতনা যেমন অত্যাচারিত রাষ্ট্রের পক্ষে তেমনই নির্যাতিত অসহায় ব্যক্তির পক্ষে, এবং তা কোনও রাজনৈতিক-সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের সাহায্য ছাড়াই।

তাঁর সমাজবোধ প্রগতিবাদী রাজনৈতিক চেতনায় উত্তীর্ণ হয় 'লড়াইয়ের মূল' খুঁজতে গিয়ে। বুঝতে পারেন ধনের অন্যায় শক্তি আর ধনতান্ত্রিক বৈষম্যের সামাজিক রূপ। রুশ অভিজ্ঞতা নতুন মাত্রায় ঋদ্ধ হয়ে ওঠে। সাম্রাজ্যবাদ ও মুৎসুদ্দি ধনের যোগসাজসের কারণে ধনবাদী শক্তির প্রতাপ যে বিশ্বে বেড়ে চলেছে তাঁর সরস ভাষায় সেকথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। "সম্পত্তি পৃথিবীতে বৈশ্যরাজক যুগের পত্তন হইয়াছে। বাণিজ্য এখন আর নিছক বাণিজ্য নহে, সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন তার গাঢ়র্ব বিবাহ ঘটিয়া গেছে" (২৪ : ২৭১)। এমনকী এ সত্যও অনুধাবন করেন যে, 'এক সময়ে জিনিষই ছিল বৈশ্যের সম্পত্তি, এখন মানুষ তার সম্পত্তি হইয়াছে' (ঐ)। মুৎসুদ্দি ধনের শক্তি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এ অনুধাবনা প্রকৃত সমাজতাত্ত্বিকের। এ অনুধাবনা থেকেই বলতে পারেন : 'শক্তির ধারাটা এখন ক্ষত্রিয়কে ছাড়িয়া বৈশ্যের কূলে বহিতেছে। লোকসাধারণের কাঁধের উপরে তাহারা চাপিয়া বসিয়াছে। মানুষকে লইয়া তাহারা আপনার ব্যবসায়ের যন্ত্র বানাইতেছে। মানুষের পেটের জ্বালাই তাহাদের কলের ষ্টীম উৎপন্ন করে' (২৪ : ২৬৪)। এই চিন্তা থেকেই ধন, ধনবাদী ও শ্রমজীবী সম্পর্কে তাঁর অনুধাবনা মানবিক চেতনা নিয়ে ফুটে ওঠে, কিন্তু তা রাজনৈতিক চেতনা-বহির্ভূত নয়। তাই তাঁর মতে "ধনের ধর্মই অসাম্য। ___ধনকামী নিজের গরজে দারিদ্র সৃষ্টি করিয়া থাকে। ধনের বৈষম্য লইয়া সমাজে যখন পার্থক্য ঘটে তখন ধনীর দল সেই পার্থক্যকে সমূলে ঘুচাইতে ইচ্ছা করে না। তাই শ্রমজীবীর দল যতই গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে ততই তাহাদিগকে ক্ষুধার অন্ন না দিয়া ঘুম-পাড়াইবার গান গাওয়া হইতেছে" (২৪ : ২৬৪)।

এরপর রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছেন, পশ্চিমে শ্রমজীবী মানুষ তাদের দাবিতে সচেতন হয়ে শক্তিতে পরিণত এবং সেখানে শক্তির সঙ্গে শক্তির লড়াই চলছে। কিন্তু আমাদের দেশে তা হয়নি বলেই এদেশীয় জনসাধারণকে অত্যাচার ও শোষণ করছে জমিদার, মহাজন ও রাজপুরুষ থেকে গোটা ভদ্রসাধারণ। এর প্রতিকারের পথ শক্তির সঙ্গে শক্তির বোঝাপড়া, নিম্নশ্রেণীয়ের শক্তিশালী হয়ে ওঠা। তাই রবীন্দ্রনাথ সখেদে বলেন 'দয়া করিয়া এক আধটা নাষ্টিক্কুল খুলিয়া কিছুই হইবে না। গোড়ায় দরকার জনসাধারণকে লোক বলিয়া নিশ্চিত রূপে গণ্য করা। তাহারা শক্তিশালি করিয়া যেদিন গণ্য করাইবে সেই দিনই সমস্যার মীমাংসা হইবে' (২৪ : ২৬৬-৬৯)।

এবার আর সংস্কারের পথ একমাত্র পথ নয়, ভক্তিবাদেরও নয়, (কালের যাত্রা, রথের রশি)। এবারের পথ লড়ইয়ের, লড়ইয়ের মাধ্যমে দাবি আদায়ের, যেপথ এর আগে রবীন্দ্রচিন্তায় বড় একটা স্বীকার্য ছিল না। তাই বলছিলাম রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-সংক্রান্ত রাজনৈতিক চিন্তার তুলনায়, অন্তত এক পর্যায়ের তুলনায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর রাজনৈতিক চিন্ত অনেক বলিষ্ঠ। নির্দ্বিধাে তিনি সাম্রাজ্যবাদ, উগ্রজাতীয়তাবাদ ও ফ্যাসিবাদের অপকর্মের বিরুদ্ধে কথা বলেন, মুৎসুদ্দি ধনিকের অত্যাচার শোষণের বিরুদ্ধে, শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে কথা বলেন। বলেন, যুদ্ধবাজের বিরুদ্ধে বিশ্বশান্তি ও মানবকল্যাণের পক্ষে। এখানে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বনাগরিক। নির্দ্বিধায় সমালোচনা করেন সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের ধনবাদী গণতন্ত্রকে, যেখানে তাঁর মতে ব্যক্তির অধিকার, ব্যক্তির স্বাধীনতা নানাভাবে ক্ষুণ্ণ হয়।

বিশ্বজনীন মানবিকতার প্রবক্তা রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে তাঁর শেষ দশকের রচনায় —কবিতা, প্রবন্ধ, নাটকে মানুষের পক্ষে সংগ্রামী জয়যাত্রার আভাস ফুটিয়ে তোলেন। আর সব শেষে 'সভ্যতার সংকট'-এ সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার স্বরূপ উন্মোচনে মানুষের প্রতি অপরিমেয় বিশ্বাস ব্যক্ত করেন, যে-মানুষ প্রস্তুত হয়েও অপরাজিত, সর্বোপরি অপরাজেয়।

এ রবীন্দ্রনাথ গোত্রান্তরিত, ব্রাত্য হয়েই বিশ্বমানব। মানব-অধিকার রক্ষার পক্ষে সংগ্রামী এ রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই এক সময় আমাদের পথ চলা। এখন বিশ শতকের শেষে এবং আসন্ন একুশ শতকেও তিনি আমাদের সঙ্গে নানা প্রয়োজনে চলতে পারেন, ক্ষেত্র বিশেষে হয়ে উঠতে পারেন প্রেরণার উৎস। কারণ সাম্রাজ্যবাদ বর্তমান বিশ্বে নানাভাবে তৎপর, যদিও নকরিত্র নিয়ে। কিন্তু কেমন করে রবীন্দ্রনাথ আমাদের রাজনৈতিক-সামাজিক চেতনায় প্রেরণার উৎস বা কর্মে আমাদের সহযাত্রী হতে পারেন সেটাই বিবেচ্য বিষয়।

॥ ৩ ॥

কেমন করে রবীন্দ্রনাথ আমাদের সঙ্গে চলেন সে প্রসঙ্গে যাবার আগে বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট একবার কিছে আনতে হয়, বুঝে নিতে হয় সেখানে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান। দেখে নিতে হয় সেখানে রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা রাজনীতির হাত ধরে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল (ডিসেম্বর, ১৯৭১) পাকিস্তান সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে নয় মাসের প্রত্যক্ষ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে, যাকে আমরা বলি মুক্তিযুদ্ধ। সে যুদ্ধে ভারতের ভূমিকা সক্রিয় সহযোগিতার। আসলে এ লড়াই চলেছে গোটা পাকিস্তানি আমল জুড়েই, নানা মাধ্যমে নানা চেহারায়, যেমন সংস্কৃতি অঙ্গনে তেমনই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। অনেক প্রত্যাশা নিয়ে মানুষ এ লড়াইয়ে অংশ নেয়। এর সূচনা সাতচল্লিশের নভেম্বর-ডিসেম্বরের ভাষা বিক্ষোভে, ১৯৪৮ মার্চের সীমিত ভাষা-

আন্দোলন থেকে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে সূচিত সফল ভাষা-আন্দোলনে। সেই সূত্রে ষাটের দশকের গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে গণআন্দোলনে (১৯৬৯) বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার পথ ধরে এর বিস্তার যা পরিণত রূপ পায় একাত্তরের প্রত্যক্ষ যুদ্ধে। এ পর্বে রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে আমাদের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সঙ্গী। যেমন ভাষার প্রশ্নে, মাতৃভাষার সর্বজনীন ব্যবহারের প্রশ্নে তেমনই ষাটের দশকের ভাষা-জাতিসত্তা-নির্ভর আন্দোলনে যেখানে আধিপত্যবাদী অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ-নজরুল। আবার স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার লড়ইয়ের রবীন্দ্রনাথ আমাদের সঙ্গে থাকেন। বিচক্ষণতার অভাবে পাকিস্তানি শাসককুল ও পাকিস্তানবাদীরা রবীন্দ্রনাথকে সহ্য করতে না পেরে তাঁকেই প্রতিবাদী আন্দোলনের বিষয়ে পরিণত করে যেমন রবীন্দ্রসাহিত্যঅর্ঘ্য নিয়ে, তেমনই তাঁর গান নিয়ে, তেমনই চরম পর্যায়ে ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে এবং ১৯৬৭ সালে রেডিও-টিভিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। সম্প্রদায়-মানসিকতাই এর কারণ। রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা দেখেছে বাঙালি জাতীয়তার প্রতীক হিসাবে।

সেই যে রবীন্দ্রনাথকে গণতান্ত্রিক লড়াইয়ে জড়িয়ে ফেলা, স্বদেশিকতার আন্দোলনে নিয়ে আসা (প্রধানত স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে আপন অধিকার রক্ষার চেতনায় নির্ভর করে) সে ধারাই একাত্তরের লড়াইয়েও সচল থাকে। সেই চেতনা বিশেষ রূপ নিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে বিশেষভাবে একাত্তরে স্বদেশি গান, দেশাত্মবোধক ও প্রতিবাদী গানের উদ্দীপনায় এবং মুক্তিযোদ্ধাদের কণ্ঠে আবেগ-গভীর সুরের ধ্বনিতে-প্রতিধ্বনিতে। তাঁর কবিতা ও গান উদয়ের পথে নির্ভিকমাত্রা থেকে বীরের রক্তস্রোত ঝরালো লড়াইয়ের ময়দানে পৌঁছে যায়। আন্দোলনে-লড়াইয়ে সংশ্লিষ্ট হয়ে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি গান 'আমার সোনার বাংলা' বাংলাদেশ রাষ্ট্রে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পেয়ে যায়।

এত রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর দেখা গেল স্বাধীনতার অমৃত সবই সৃবিধাভোগী শ্রেণীর হাতে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের কাছে স্বাধীনতার সুফল সামান্যই পৌঁছেছে। জনস্তরে শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অন্ন-ধনসম্পদের ক্ষেত্রে বড় একটা পরিবর্তন নেই। অথচ এ ছোট দেশেও মানুষের প্রত্যাশা খুব কম ছিল না। সেই প্রত্যাশা নষ্ট করে দিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে নৈরাজ্য আর সংঘাত, সমাজ জীবনে বর্ধমান আর্থ-সামাজিক বৈষম্য ও তজ্জনিত অস্থিরতা, গ্রাম-নগরের ক্রমবর্ধমান দূরত্ব প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে অলস ও অপচয়ী মুৎসুদ্দি পুঁজির বিপুল সঞ্চয় এবং এর বিপরীত প্রান্তে কৃষি-শিল্প খাতে পরিবর্তনের অভাব, মুদ্রাস্ফীতি ও ভোগ্যপণ্যমূল্যের আকাশচারিতা আঁকাবাঁকা ছবিটিকে মোটেই সুশ্রী করে তোলে না। গত আড়াই দশকে একাধিক সরকারের আসা-যাওয়া সত্ত্বেও মূল অবস্থার হেরফের সামান্য।

আমাদের রাজনীতিতে জাতীয় স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিস্বার্থ ও দলীয় স্বার্থের টান অনেক বেশি হওয়ার জন্যই বোধ হয় একুশের চেতনা বা পরবর্তী স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনা কোনও ক্ষেত্রেই পরিস্ফুট হয়ে উঠতে দেখা যায় না। যদি শিক্ষার মন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েরও হিসাব নেওয়া যায় তাহলে বলতে হয়, যে-বাংলা ভাষার ব্যবহারগত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এত সংগ্রাম, সংবিধানে যেখানে 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা' কথাটি সুস্পষ্টভাবে মুদ্রিত সেখানে সর্বজনীন ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজি মাধ্যম স্কুল কলেজের অগুন্তি উপস্থিতি ভাষা আন্দোলনের মর্যাদাকে দাঁড়াতে দেয় না। বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাই। রবীন্দ্রনাথের বহু কথিত মাতৃভাষার শিক্ষার আদর্শ সামান্যই দাঁড়াতে পারছে।

বড় কথা হল, এই অবিশ্বাস্য উচ্চ মূল্যের ইংরেজি মাধ্যম স্কুল ও কলেজ স্কুলপর্যায়ের বাংলা মাধ্যমে শিক্ষার পাশাপাশি সগর্বে দাঁড়িয়ে বিত্তবান শ্রেণীর সন্তানদের নিয়ে গোটা জাতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে। এবং তা সম্ভব হচ্ছে দ্রুত গড়ে-ওঠা শ্রেণীর ইংরেজি—অহমিকা ও তাদের শ্রেণীস্বার্থের কল্যাণে। এ এক ট্রাজেডি যে বাংলাভাষিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরও উচ্চশিক্ষা-বিজ্ঞানশিক্ষা এবং উচ্চ আদালতে (হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টে) মাতৃভাষা ব্যবহারের জন্য আমাদের বিতর্ক সভার আয়োজন করতে হয়। এইতো এবার একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস উপলক্ষে আমাদের বন্ধুস্থানীয় এক প্রাক্তন ব্রিগেডিয়ার তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন, 'উচ্চতম আদালতে বাংলা ব্যবহার সম্ভব এবং তা হওয়া উচিত'। এ বিষয় নিয়ে গত একাদশকেরও বেশি সময় ধরে লেখালেখি হয়েছে অনেক। কিন্তু তাতে কিছু হয়নি। জাতীয় জীবনে নতুন করে বাংলা ব্যবহারের প্রশ্নে আমরা রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়েছি। বলতে হয়, তাঁর কাছে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করছি।

এই 'সঙ্গে নেওয়া' ও 'ফিরে যাওয়া' আরও নানা প্রশ্নে। স্বীকার করতে বাধা নেই যে, বাংলাদেশ সহ এই উপমহাদেশের রাজনীতিতে গণতন্ত্র বা প্রগতির আক্ষরিক উদ্ভাস সত্ত্বেও সম্প্রদায়গত চেতনা এখনও সমাজ থেকে বিদায় নেয়নি। এখনও আমাদের ধর্মীয় পরিচয় মানুষ পরিচয়ের চেয়ে বড়। রবীন্দ্রনাথের সম্প্রদায়-চেতনা-বিরোধী বক্তব্য এবং মিলের পক্ষে উচ্চারিত কথাগুলো এখনও আমাদের জন্য সত্য। সত্য গোটা উপমহাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে। সত্যি বলতে কি মানুষ হিসাবে মানসিক সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটাতে রবীন্দ্র-চিন্তার পাতাগুলো নেড়ে দেখার প্রয়োজন আমাদের সবারই রয়েছে। বাংলাদেশের রবীন্দ্রচর্চা এদিকটা উপেক্ষা করছে না।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর অনেকগুলো বছর পার হয়ে এসেছি। এবার মহাসমারোহে স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী পালিত হয়েছে। রাজধানী ঢাকায় কিংবা বন্দরনগরী চট্টগ্রামে উপচে-পড়া ভিড়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বারবার উচ্চারিত হয়েছে, বর্ণাঢ্য র‍্যালি

ও সজ্জিত মঞ্চে স্বাধীনতার জয়গান, রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের অবস্থান। আবার স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ শক্তির কথা নিয়ে বিতর্কও চলেছে। কিন্তু এসবে সাধারণ মানুষের উৎসাহ বা সংশ্লিষ্টতা যথেষ্ট নয়। আর গ্রামে-গঞ্জে এর প্রতিফলন কোথাও নেই।

সাধারণ মানুষকে এ আবেগের সঙ্গে একাত্ম হতে দেখা যাচ্ছে না যেমনটি দেখা গিয়েছিল একাত্তরের ডিসেম্বরে কিংবা বাহাত্তর সালের প্রথম দিকে। আমাদের রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি এখনও জনগণকে কাছে টানতে পারেনি, সংসদীয় গণতন্ত্রের তত্ত্বমাফিক জবাবদিহির কথা যত জোর গলায় বলা হোক না কেন। মত ও পথের পার্থক্য, রাজনৈতিক অঙ্গনে নানা মতে নানা দলে দলাদলি এতটাই সংকীর্ণতাদুষ্ট যে স্বদেশগড়ার রাজনীতি জনকল্যাণে তথা লোকহিতে তাদের পক্রিয় তুলে ধরতে পারেনি। সর্বজনীন জনশিক্ষা, জনগণের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য বা স্বনির্ভরতা, তাদের অধিকার রক্ষা ইত্যাদি নিয়ে রাবীন্দ্রিক স্বদেশি সমাজের চিন্তা বা বাস্তবতা এখনও অনেক দূরে।

বরং অপ-রাজনীতি আর অপসংস্কৃতি এই দুয়ের প্রভাব নগর-বন্দর ছুঁয়ে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। সমাজটা আর সুস্থ নেই যেমন শহরে-নগরে তেমনই গ্রামে। এ পরিস্থিতিতে আমাদের মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের সুস্থ-শিক্ষিত-সৎ মানুষের স্বনির্ভর গ্রামীণ সমাজ গঠনের কথা, সুস্থ গ্রাম-নগর পারাপারের কথা। মনে পড়ে বিশেষ করে জনস্তরে রাজনীতির ব্যর্থতার কারণে, যে ব্যর্থতা অনেকেরই মতে রাজনৈতিক দল ও শ্রেণী-স্বার্থনির্ভর। আর সে জন্যই রাজনৈতিক পথ দেখাতে স্বনির্ভর সমাজগঠনের দিকে নজর ফেরানোর প্রশ্ন বড় হয়ে উঠছে এবং তা সচেতন রাজনৈতিক ও সমাজকর্মীর দায় হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে এন-জি-ও কর্মকাণ্ডের পথ ধরে সমাজ উন্নয়নের পথ গ্রহণ কতটা সঠিক সে বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ ও বিতর্ক রয়েছে। কারণ ওই সব সংগঠন যে ধরণের বিদেশি দাতা সংস্থার উপর নির্ভরশীল তাদের রাজনৈতিক চরিত্র এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন ও সন্দেহ দুই-ই রয়েছে। সেজন্যই একাজে রবীন্দ্রচিন্তার পথ অনুসরণের কথাও কারও কারও লেখায় এসেছে। তাতে শ্রেণী সংগ্রামের কাজ ব্যাহত হবার কথা নয়। একথা বলার উদ্দেশ্য, আমাদের কোনও কোনও রাজনৈতিক বন্ধুর ধারণা, রবীন্দ্রচিন্তার এ পথ শ্রেণী সংগ্রামকে পেছনে ঠেলে দেবে কিন্তু আমার তা মনে হয় না, অন্তত বর্তমান রাজনৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতিতে তো নয়ই।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় বিবেচ্য। পূর্বোক্ত আলোচনা-সূত্রে এটা স্পষ্ট যে, রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রভুত্ববাদী চরিত্রের তীব্র সমালোচনা করেছেন। এমনকী করেছেন অন্যতর বিশ্বের (তখনও তৃতীয় বিশ্ব শব্দটি চালু হয়নি) সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির সামাজিক অবক্ষয়ী প্রভাবের। কিন্তু এ সবই এখন রবীন্দ্রনাথের কালের তুলনায় নানা মাত্রায় চাতুর্যে অনেক দূর প্রসারিত। সাম্রাজ্যবাদ তার ধনবাদী গণতান্ত্রিক চরিত্রের কারণে এখন আর আগের মত সরাসরি সাম্রাজ্যবিস্তারের পথ ধরে না, তার প্রভাব বিস্তারের ধারা অনেক চৌকস, আবার অনেক সময় পরোক্ষ। কখনও গণতন্ত্রের নামে বা গণতন্ত্র রক্ষার নামে, কখনও সাহায্যের পথে সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য এখন এত প্রবল যে তৃতীয় বিশ্বের নিরীহ দেশগুলোর পক্ষে আত্মমর্যাদা রক্ষা করে আত্মশাসন বেশ কঠিন। সাম্রাজ্যবাদ এখন আসলেই ধনবাদী গণতন্ত্র। অর্থসাহায্য তার প্রভুত্ব বিস্তারের অন্তত একটি পথ। এ তৎপরতা সমাজতন্ত্রী রাশিয়ার পতনে সহজ হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্বে মার্কিনি ধনবাদী গণতন্ত্রের সহজ একাধিপত্য তাই প্রাক্তন এক মার্কিন প্রেসিডেন্টের মুখে শুনি, নতুন বিশ্ব বিধানের (নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার) কথা। এ অবস্থায় বাংলাদেশ সহ অন্যান্য দুর্বল রাষ্ট্রের সাধ্য কী ভিন্ন সুরে কথা বলে! বিশ্বব্যাঙ্ক ও অনুরূপ সংস্থার হাত দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক অর্থনৈতিক শাসন চলছে যা পরোক্ষ রাজনৈতিক শাসনের নামান্তর। জানিনা রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে এ সম্পর্কে কীভাবে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতেন।

অবস্থা আরও জটিল করে তুলেছে আমাদের দেশে অন্তিত্ত সৃষ্ট মুৎসুদ্দি পুঁজির প্রভাব যা আবার আন্তর্জাতিক আমলা-পুঁজির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা (মার্কসবাদীদের ভাষায়, কমপ্রেডোর পুঁজি)। তাছাড়া রয়েছে স্বদেশি আমলাতন্ত্র যারা দেশের শাসন-শোষণের সহায়ক শক্তি। রবীন্দ্রনাথ-কথিত সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্যের গান্ধর্ব বিয়ে এখন রীতিসিদ্ধ ধনতন্ত্রী বিয়েতে পরিণত। তবে সেখানে জুটেছে সাম্রাজ্যবাদের উবেরারশক্তি হিসাবে সমরতন্ত্র যা এক নতুন আপদ। মুৎসুদ্দি ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আশীর্বাদ নিয়েই সে প্রভুর প্রয়োজনে দেশে দেশে ক্ষমতায় আসীন, অবশ্য ব্যতিক্রমও রয়েছে। বাংলাদেশের রাজনীতি বিভিন্ন সময়ে এ ধারার প্রভাবাধীন হয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় রবীন্দ্রযুগের রাজনৈতিক উপনিবেশবাদ এখন অর্থনৈতিক উপনিবশবাদে পরিণত।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর যুগের মুৎসুদ্দি-সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে 'আরেক লড়ইয়ের' সম্ভাবনা লক্ষ করেছিলেন এবং তা ছিল 'বৈশ্যে শূদ্রে মহাজনে মজুরে'। কিন্তু রবীন্দ্র প্রয়াণের এতগুলো বছর পরও সে লড়াই জমে উঠতে দেখা যাচ্ছে না, আমাদের দেশে তো নয়ই। হয়ত এর কারণ ধনবাদী গণতন্ত্রের প্রভাব এবং স্থানিক রাজনীতির দুর্বলতা। আমাদের দেশে দ্বিতীয় কারণটি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। এ ক্ষেত্রে জনসচেতনতা তৈরি ও জনগণকে সংগঠিত করার জন্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কথা মনে আসে, বিশেষ করে রাজনীতি যখন ভিন্ন পথের দিশারী, তারুণ্যের বড় অংশ যখন অন্ধ দলীয় রাজনীতি ও অপসংস্কৃতির প্রভাবে আচ্ছন্ন। এখানে রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা সুস্থ রাজনীতির সহায়ক হতে পারে। সাংস্কৃতিক আন্দোলন যে দলীয় রাজনীতিকে সঠিক পথ দেখাতে পারে সে উদাহরণ তো আমাদের হাতেই রয়েছে (একুশের ভাষা

আন্দোলন)। আমাদের দলীয় রাজনীতির অঙ্গনে যে সংঘাত ও অস্থিরতা, নেতি ও প্রতিক্রিয়ার চাঁন, সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ওই প্রভাবেই সুবিধাবাদ ও ব্যক্তিস্বার্থপরতা পরিস্ফুট। তাতে রাজনীতির করণীয় জনস্তরের কাজটিকে সমাজ কর্মের পথে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে ভাবা যেতে পারে। এতে রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা আমাদের সাহায্য করতে পারে। তেমন সম্ভাবনার কিছু লক্ষণ এখানকার সাম্প্রতিক সমাজকর্মে দেখা যাচ্ছে। কেউ স্বীকার করুন আর নাই করুন ওই সমাজকল্যাণী কর্মের ভিত্তিটা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা ও কর্মকাণ্ডের মতোই; যেমন গ্রামীণ দুঃস্থকে কর্ম-ভিত্তিক ঋণদান ও ঋণআদায় যা 'গ্রামীণ ব্যাংক' কর্মসূচিতে দেখা যায়। আবার রয়েছে সমবায়নীতির মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মোদ্যোগ। এসবই পতিসরে রবীন্দ্রনাথের কৃষি ব্যাংকের (১৯০৫) সাফল্য ও জীবিকা-সমবায়-গুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। এমনই দুএকটি-সংগঠন এদেশে দুঃস্থ গ্রামীণ মহিলাদের মধ্যে কাজ করছে।

এ অবস্থায় বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে তিনদিনব্যাপী পঁচিশে বৈশাখ পালন আকর্ষণীয় হলেও (একে গ্রামপর্যায়ে নিয়ে যাওয়া দরকার) অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হল গ্রামীণ ও নাগরিক সমাজের জন্য আদর্শ সামাজিক কর্মসূচি, যা হতে পারে স্বদেশি সমাজের পরিবর্ধিত ও সংশোধিত রূপে। সুশীল নাগরিক সমাজের বিষয়টি সেই সঙ্গে চলতে পারে, প্রয়োজনে অপেক্ষাও করতে পারে। রবীন্দ্র সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার মধ্যেও এ দিকটা অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ, বিশেষ করে জনচেতনার কথা মনে রেখে। আমার মনে হয় সংস্কৃতিকর্মী ও সমাজকর্মী উভয়েরই দায়িত্ব আমাদের রাজনৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তায় গণতন্ত্রী, অসাম্প্রদায়িক ও উদারমানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক-সামাজিক পরিচয় তুলে ধরা, যার স্বপ্ন ছিল রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে মানুষ হিসাবে ব্যক্তি ও সমষ্টির মুক্তি, যিনি শক্তির সঙ্গে শক্তির বোঝাপড়ায় অসহায়, নির্যাতিত মানুষের পক্ষ নেন, যে কোনও প্রকার বৈষম্য ও অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে যিনি সর্বদাই সোচ্চার, যিনি মুৎসুদ্দি ধনের মানুষকে পণ্যে পরিণত করার ঘোরতর বিরোধী, সর্বোপরি যিনি ধর্মবর্ণগোত্র —নির্বিশেষে মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখতে এবং মূল্য দিতে চান।

বাংলাদেশে আমাদের রাজনৈতিক-সামাজিক সমস্যার আরও একটি দিক নৈতিকতার ও মতদর্শগত সত্তরর। সাধারণভাবে ব্যক্তি, দল বা শ্রেণীতে সুবিধাবাদিতা ও আপোষবাদিতার টান পদে পদে সব কিছুতে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। রাজনৈতিক অঙ্গনকে ঘিরে মানুষের হতাশা তাই প্রবল এবং রাষ্ট্র এর দায় বহন করছে। আমার বিশ্বাস আমাদের সমাজ ও রাজনীতি এই প্রশ্নেও রবীন্দ্রনাথের শুদ্ধ আদর্শের চেতনা থেকে উদ্দীপক উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে যা সেসব ক্ষেত্রে নীতি ও নৈতিকতার প্রেরণা যোগাতে পারে।

বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চার স্বল্প পরিসরে ও ক্ষুদ্রশক্তিতে যেমন রবীন্দ্রসাহিত্য অনুশীলনের চেষ্টা চলছে তেমনই চলছে রবীন্দ্রচেতনার সদর্থক দিকগুলো তুলে ধরার চেষ্টা। সেখানে সমাজ-রাজনীতির প্রশ্নে চিন্তাবিদ রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি বা বিচার-বিবেচনা গুরুত্ব পাওয়া উচিত যা বড় একটা দেখা যাচ্ছে না। বিশেষ করে সেসব দিক নিয়ে, যা বাংলাদেশ প্রশ্নে প্রাসঙ্গিক। এই প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্নে যেমন বাংলাদেশে তেমনই পশ্চিমবঙ্গেও ভিন্নমত দেখা যায়। বলা বাহুল্য তাদের যুক্তি ও বিষয়বাস্তবতার ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত হতে পারিনি। বাংলাদেশে রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিকতার অভাব রয়েছে বলে আমি মনে করি না। বিষয়টি বারান্তরে বিবেচ্য।

আমার বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক-সামাজিক চিন্তার অনেক কিছুই বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সংশ্লিষ্ট হবার যোগ্যতা রাখে। যেমন দরকার যথাযথ বিচার-বিশ্লেষণের তেমনই দরকার সেসবকে জনস্তরে নিয়ে যাওয়া। সবশেষে একটি কথা যা না বললেও বর্তমান আলোচনার অঙ্গহানি হত না। আমি মনে করি, যে রবীন্দ্রনাথ পদ্মা-ইছামতি-নাগর নদীর তীর থেকে চলে গিয়েও সেখানকার মাটি-মানুষ-নিসর্গের স্মৃতি আমৃত্ত আবেগে লালন করেন এবং সেখানে ফিরে যেতে না পারার হতাশা-বেদনা ব্যক্ত করেন নানা মাধ্যমে, যে কবি-চিন্তাবিদ বীরভূমের শুষ্ক প্রান্তরে ক্ষীণকায়া কোপাই এর বুকে পদ্মার প্রতিচ্ছবি দেখতে পান, শুনতে পান পদ্মার ঢেউয়ের ছলছল, তার সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক আত্মিক, সে রবীন্দ্রনাথকে না হলে কি চলে?

সহায়ক পঞ্জি

১। নেপাল মজুমদার, 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ', ১ম খণ্ড, (কলিকাতা, ১৯৯৫), ১১২
বিপান চন্দ্র, 'আধুনিক ভারত ও সাম্পদায়িকতাবাদ', (কলিকাতা, ১৯৮৯), ১৪৬
২। শশধর সিংহ, 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন পার্সপেকটিভ', পৃঃ ৭২-এ উদ্ধৃত
৩। সত্যেন্দ্রনাথ রায়, 'রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ, স্বদেশচিন্তা', (কলিকাতা, ১৩৯৫), ১১৪
৪। অরবিন্দ পোদ্দার, 'রবীন্দ্রনাথ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব', (কলিকাতা, ১৯৮২), ১০৮
৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২০
৬। অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, প্রবাসী, ১৩৪৬ (আষাঢ়), দেশনায়ক প্রবন্ধ
৭। Krishna Datta & Andrew Robinson, 'Rabindranath Tagore' (London, 1995), 301
৮। নেপাল মজুমদার, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, (কলিকাতা, ১৯৭১), ২৮৯-৯০
৯। দৈনিক আজাদ, ১২ অক্টোবর, ১৯৩৭
১০। ঐ, ৩ মার্চ, ১৯৩৭
১১। প্রসঙ্গ নির্দেশে ব্যবহৃত হয়েছে রবীন্দ্র রচনাবলী (বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৯৭০) — খণ্ড ৩, ৪, ৬, ৮, ১০, ১১, ১৩, ১৬, ২০, ২৪, ২৬, ২৭

বাংলা উপন্যাসের ধারায় একটি ল্যাণ্ডমার্ক ঃ বিমল করের 'দেওয়াল'

বিজিতকুমার দত্ত

রাজার ঘরের রানি ঘরে বাইরের বিমলা সংসারের ঘেরাটোপে থেকে স্বামী নিখিলেশকে ছুঁতে পারছিল না। সে তার আবরণ থেকে বেরিয়ে আসতে না পেরে কেবলই বিব্রত হচ্ছিল। ঘরে রানির কর্তৃত্বে যখন সে হেরে যাচ্ছিল নিখিলেশের উদারতায় তখন সে কোমর বাঁধে। আর তখন বিমলা কাঁদে, বলে 'হবে, হবে, আমারই মন ছোটো। আর-সকলেই ভালো, কেবল আমি ছাড়া'। ভবতুর থাকে 'স্বামীর কাছে এমন ছোটো প্রমাণ হয়ে গেলে বাঁচি কী করে?' তার ক্ষাত চিত্রায় পাই 'যখনই সংসারের কোনো খিটিমিটি নিয়ে তার সঙ্গে কথা কইতে গেছি তখনই বারবার এমন ছোটো হয়ে গেছি যে, সে আমাকে মেরেছে'। আর প্রচলিত প্রথার কাছে আত্মসমর্পণ করে কিমলা সান্ত্বনা খোঁজে, 'বইয়ে পড়েছি আমরা খাঁচার পাখি, কিন্তু অন্যের কথা জানিনে, ওই খাঁচার মধ্যে আমার এত ধরেছে যে বিশ্বেও তা ধরে না।

এই হল ছোট ঘর আর ছোট মনের সমস্যা। মধ্যবিত্তের টানোপোড়েন। কেবল সচ্ছলতা আর অসচ্ছলতাই নয় নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে করতে ক্ষতবিক্ষত হওয়া। একটা পালার শেষে বিমলা ছোট মনের চরিত্র এইভাবেই বুঝিয়েছিল। এই আত্মোপলব্ধি তার ঘটেছিল বিসর্জনের দেয়ালে পিঠ দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ যখন এই আত্মদ্বন্দ্বকে মেনে নেন তখন বুঝতে অসুবিধে হয় না তিনি একালের সমস্যাকেই ধরে দেন আমাদের কাছে।

কিন্তু এমন যদি হয় সন্দীপের মতো কেউ অতর্কিত বিমলার উপর ঝাপিয়ে পড়ল না, তখন বিমলা কি আত্মসন্তুষ্টি নিয়ে মেজো জার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে আর সতীত্ব গর্বে বেড়িয়াকেই অলংকার বলে মনে করবে। বিমল করের জিজ্ঞাসা-কে এরকম একটা ছকে ফেলা যায়? তাঁর দেওয়াল উপন্যাসের প্রথম পর্বের নামই তো ছোট মন। বিমলা যে-ভাবে নিজের ক্ষুদ্রত্বকে বলেছিল ছোট মন? রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষা ছিল খাঁচার পাখি-কে বনের পাখির আমন্ত্রণ। বিমল করের অন্বিষ্ট খাঁচার পাখির চার দেওয়ালে ডানা ঝাপটানো। দেওয়াল উপন্যাসে বনের পাখির আমন্ত্রণ যে নেই এমন নয়। আর তা আসে স্মৃতির হাত ধরে, আর সূর্যাস্তকালের আকাশের রং-এর মোহময়তায়। দীর্ঘশ্বাস আর পিপাসিত চিত্তের জলের মতো ঘুরে ঘুরে কথা এই সম্বল নিয়ে মধ্যবিত্তের জীবনযাপন। সে পৌঁছতে পারে না তার ইষ্টের কাছে। অনিষ্টাই তাকে পায়ের দাঁড়া দিয়ে শুষতে থাকে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শশী গাওদিয়া গ্রামে এসে ছটফট করেছে। মধ্যবিত্তের স্বপ্ন তাকে উতলা করেছে কিন্তু দিনের পর দিন সে নিজেকে মেরেছে। আর বিমল করের উপন্যাসে সেই মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ হারাতে হারাতে কেবলই ক্ষয়ের কিনারায় এসে উঠেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঝড় ঝাপটা এই কলকাতায় এসে পড়েছিল। তারই পটভূমিকায় 'দেওয়াল' উপন্যাসটি পরিকল্পিত। কলকাতার উজ্জ্বল দিনগুলি কেমনভাবে হারিয়ে যাচ্ছিল বিমল করের অন্বিষ্ট হয়ে উঠেল তা-ই। কেমন যেন ম্লান সন্ধ্যার আলো সরে সরে গেল, আর রাত্রির অন্ধকার কলকাতার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। কলকাতার প্রশস্ত, কোলাহলমুখর ভুগোল ঠিকই রইল কিন্তু তার ক্ষয়ে-যাওয়া রূপটা এতদিনে যেন স্পষ্ট হতে লাগল। অসংখ্য গলিঘুঁজি-তে বাস করে যারা তাদের নিয়েই তো প্রকৃত কলকাতার চেহারা। এ কথা তো ঠিক কলকাতার জন্ম হঠাৎ-ই, আর তা যখন বাড়তে লাগল কোনও পরিকল্পনা ছাড়াই, তখন রাজপথ আর জনপথের স্বাস্থ্য উজ্জ্বল হবে, এমন আশা করাই অন্যায়। সারপেনটাইন চেহারাই হয়ে উঠবে কলকাতার বৈশিষ্ট্য। বিমল কর উপন্যাসটির আরম্ভই করেছেন এই অষ্টবক্র কলকাতার ভূগোল জরিপ করতে করতে। এই জরিপের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে মানুষের জন্মমৃত্যুর ইতিহাস। এখানেই কখনও কখনও শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে, কখনও কখনও পার্কের

বৈকালিক একফালি নিভৃত অবকাশ। হাইড্রেনের পচা গন্ধের সঙ্গে সুরভিত ডবল হাফ চা। বিমল কর কলকাতাকে উপন্যাসের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়েই দেন না, তার চাপকে স্পর্শ করেন নিষ্ক্রিণ্ড মানুষগুলির টানাপোড়েনে। সুধার জীবনে প্রতিদিনকার হিসেবনিকেশের গ্লানি যেমন মানুষটাকে পিষতে থাকে তেমনই মাইনে পেয়ে ভাই বাসুকে টাকা আর খুচরো দিয়ে বাজারে পাঠিয়ে দিয়ে একরকমের তৃপ্তি ডেকে আনে নিজের শরীরে আর মনে। মনে হতেই পারে পিষ্ট এই মানুষটা বুঝি পরিবেশ আর সময়ের যন্ত্র মাত্র। বিমল কর তা মনে করেন বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ যখন ঘরকে একটা ঘেরাটোপ বলেন তখন ঘর হয়ে ওঠে ছোট-আমি-র জীবনযাপন। আর বিমল করের মানুষগুলি ছোট-আমি-র সীমানা ছুঁয়ে এগিয়ে যেতে থাকে না, তারই ফাঁক-ফুকরে, ঘুরে ঘুরে ঘরের আপ-উত্তাপ নেয়। নিখিলেশ বার করে আনতে চায় বিমলাকে বাইরে, যেখানে উত্তাল ঢেউয়ে মানুষ বদলাতে বদলাতে আত্মশক্তিতে স্থিত হতে পারে। এই শক্তির উন্মোধনে জীবনের পূর্ণতা অথবা সর্বনাশ।

আর এই পূর্ণ-অপূর্ণের দুই মেরুতে দাঁড়িয়ে থাকে নিখিলেশ আর বিমলা। সুধা বিমলা নয়। সুচারু নিখিলেশ হতে পারে না। কলকাতার যান্ত্রিকতা আর সময়ের নির্মমতা এদের কাউকেই রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের মতো বড় মাপে পৌঁছে দেয় না। বিমল কর এই ভূসংস্থানেই নিজের ছকটি পাতেন। সাদা-কালোর এই ছকে বড়ে-নৌকা-ঘোড়া-মন্ত্রী-রাজাদের ঘোরা-ফেরা। এরও তো একটা মানে আছে। ক্ষণে ক্ষণে অভ্রংলীয়ের চমক অকশাই ছককে উল্টে দিতে চায় কিন্তু সে চমকের আকস্মিকতা সরে গেলে আবার মুখ থুবড়ে ছকেই পড়ে থাকতে হয়—সুধা, রত্নময়ী বাসু, গোরা, উমা, নিখিল এমনকী শ্ক্যাফুরেও। এই জীবনের চিত্ররূপ পঞ্চাশ ষাটের দশকের উপন্যাসে বারেবারেই দেখা দিচ্ছিল। বারো ঘর এক উঠোনের বাসিন্দারা তখন বড় বাস্তব। জীবনানন্দের অপ্রকাশিত উপন্যাসগুলিতে যেন জমা পড়ছিল এই ক্ষয়ে যাওয়া পয়সা-আনি-দুআনিগুলি। কিন্তু গোয়ালার গলির হরিপদ কেরানিরা তখন আমাদের দৃষ্টি কেড়ে নিচ্ছিল। উপন্যাস থেকে বিদায় নিচ্ছে নিখিলেশ-বিপ্রদাস-কুমুদিনী। এমনকী সন্দীপ-মধুসূদনও। রবীন্দ্রনাথেরই একবার উচ্চারিত সেই ছোটপ্রাণ, ছোট ব্যথা উপন্যাসে-গল্পে উঠে এল। বিমল করের দেওয়াল উপন্যাসের আরম্ভ এইরকম 'বহুবাজার স্ট্রীটের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে গলিটা। ঢোকার মুখে রাস্টাটা তবু বা চওড়া, গাড়ি ঘোড়া মুখ গলাতে পারে। ক'পা এগিয়ে নাক বরাবর পথ হঠাৎ যেন ভয়ে লজ্জায় গা গুটিয়ে নিয়েছে। কুঁকড়ে জড়সড়। অনেকটা তেমনি, হুট করে দরজা খুলে গলা বাড়িয়েছিল গেরস্থ গরিব ঘরের আইবুড়ো মেয়ে, তারপর থমকে গিয়ে কপাট ভেজিয়ে দিয়েছে। এক চিলতে ফাঁক দিয়ে ধুকধুক বুক নিয়ে দেখছে এখন। লজ্জায় মরছে। মাথা খুঁড়ছে যেন মনে মনে।

'কপাটের এক চিলতে ফাঁক দিয়ে মানুষ না গললেও মাছি গলে যায়; ফটিক দে লেনের নিশ্বাস টানতে যে টুকুন বাতাস-চলা পথ সে পথে গাড়ি ঘোড়া না চললেও মানুষ চলতে পারে'। এ বর্ণনায় রাস্তা-গলি কেমন যেন 'প্রাণ' পেয়ে যায়। একটি আইবুড়ো মেয়ে। প্রায় অরক্ষণীয়া। লজ্জা, ভয়, বুক দুরুদুরু। কুঁকড়ে আছে মেয়েটা মাথা খুঁড়ছে। আমরা বুঝতে পারি বিমল কর কোন কলকাতাকে এখন খুঁজছেন। ফটিক দে লেন তার আবর্জনাকে গা ঝাড়া দিয়ে ফেলতে পারে না। তবু সে বনেদী। কলকাতার বনেদী পাড়া বলতে বনেদী'র অনুষঙ্গটাকেই আমাদের ভুলতে হবে। হুত্তোমের বনেদী মানুষগুলিকে যেন মনে পড়ে যায়। বনেদীয়ানার দাপা জৌলুষ হুত্তোমের বকুনি খেয়েছিল। আর বিমল করের অন্বিষ্ট হয়ে ওঠে দিনযাপনের পর্যায়ে বনেদীয়ানার ক্লীয়মান রূপরেখা। আসলে একটা চাপা ব্যঙ্গও তো দেওয়াল উপন্যাসে ফুটে উঠছে। এত সত্ত্বেও এঁটো-কাঁটা আবর্জনা, কাককুকুরের কটপট খেয়োখেয়ি, হাইড্রেন্টের খোলা নল থেকে গঙ্গজলের মিহি স্রোত) 'তবু ফটিক দে লেন ভদ্রপাড়া। বনেদী পাড়া।' বিবর্ণ, হতশ্রী, ঠাসাঠাসি, চাপা, রুদ্ধশ্বাস, দমবন্ধ নোংরা ভ্যাপসা গন্ধ, মাছি ভনভন-করা বাড়িগুলি একটার গায়ে একটা লেপটে আছে। এইরকমই একটা বাড়িকে বেছে নিয়েছেন বিমল কর। এবং বনেদীয়ানার সঙ্গে সমকালীন মানুষের যুদ্ধ-কে বিস্তৃত করতে থাকেন লেখক। সুধা যখন অন্যমনস্ক তখন সে ঘরের বাইরে আলসের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। সোমনে পাশে পিছনে তাকাবার উপায় নেই। এ-বাড়ি ও-বাড়ি দেওয়াল ছাদ আড়াল করে অন্ধকারকে আরও ঘন করেছে। উঁচু, চোখে তাকাল, কালো আকাশ তারায় তারায় ভরা। চাঁদ নেই। হাওয়াও সামান্য।'-বিমল করের উপন্যাসের দেওয়াল নামের একটা অর্থ স্পষ্ট হয়ে ওঠে এখানে। দেওয়াল রচনা করেছে মানুষের খাঁচা। যেখানে কালো আকাশ, চাঁদ নেই, হাওয়াও সামান্য। আমরা বুঝতে পারি মধ্যবিত্তের বাঁচবার জমিটুকু কত ছোট। কত ছোট ঘরে আমরা বাস করছি। মন আছে, তাকে ছড়িয়ে দেবার উপায় নেই আর আইবুড়ো মেয়ে কেবলই কুঁকড়ে যাচ্ছে এখানে। ভয়ে জড়সড়।

সন্তেষ ঘোষের কিনু গোয়ালার গলির মানুষগুলি সিআইটি ভাঙবার আগে এমনই জবুথবু হয়ে নিশ্বাস টানছিল। আর সাহেব বিবি গোলামের মানুষগুলি কেবলই ঘড়ির টিকটিক শব্দে নিজেদের মৃত্যুর ইশারা পাচ্ছিল, এখানেও সিআইটি। আর একজন দেখলেন নতুন বস্তির পত্তন। সল্ট লেকের লোনা জলে মিষ্টি জলের স্রোত বইয়ে দেবার সূচনা। বাংলা উপন্যাসে কলকাতার ভৌগোলিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বাস্তুর পরিবর্তন, জীবনযাপনের বিন্যাসের নতুন ছক উঠে এল। কিন্তু সে পরিবর্তন কী মূল্যে সূচিত হল বা হচ্ছিল তারই চিত্র আমরা

এখানে পাই। ভাঙনের চিত্র অন্যদিকে, অন্যরূপে পাই ইয়সুবীবকে, তিতাসে, চরকাশেমে। একে কাকতালীয় বলা ঠিক হবে না। মধ্যবিত্তের সংকট কি না জানি না, কিন্তু মধ্যবিত্তের ভাবনায় নাক গলিয়ে ঢুকে পড়েছিল 'লন্ডন ব্রিজ ইজ ফলিং ডাউন'। ১৩৬৩-তে দেওয়াল উপন্যাসের প্রথম পর্বটি প্রকাশিত। তখন উপন্যাসের সাবেকি ন্যারেটিভের পাশাপাশি অ্যান্টি ন্যারেটিভ উপন্যাসের তাত্ত্বিক ভাবনা গড়ে উঠছিল। এমন কথা বলব না এর আগে উপন্যাসের এই প্রকরণের অভাব ছিল। কিন্তু বিষয়টি কিঞ্চিৎ ভাবিয়ে তুলেছিল ঔপন্যাসিককে এই সময়েই। আবার এও মনে করতে বাধা নেই উপন্যাসের ফর্ম আর কনটেন্টের যুগ্মক্ষেণী কালে কালে পালা বদল করে সময়ের দৃশ্য-অদৃশ্য টানে। সমাজের গতিপ্রকৃতি বদলে যায় বলে উপন্যাসেও তার বদল আসন্ন হয়ে ওঠে।

বিমল কর উপন্যাসে যে মধ্যবিত্তের কাহিনীকে তুলে এনেছেন, তার কনটেন্ট আর ফর্মের মধ্যে অভিনব কিছু নেই। নিম্ন মধ্যবিত্তের মূল্যবোধ হারানোর আর্ত রূপের সন্ধানে তিনি মনোযোগী। এ ব্যাপারে তাঁর সহযাত্রী তখন বেশ কিছু ঔপন্যাসিক। ১৯৪১-১৯৪৫ সাল পর্যন্ত সমাজজীবনে যে উচ্চাঙ্গ ঢেউগুলি উঠেছিল বিমল কর তার অভিজ্ঞ মধ্যবিত্তের জীবনে প্রতিফলিত দেখতে পেয়েছেন। ফটিক দে গলি-কে নির্বাচন করে বিমল কর মধ্যবিত্তের ছবি লিখেছেন। ডানিয়েল ডেফো সঙ্গীবিহীন নির্জন দ্বীপকে নির্বাচন করেছিলেন রবিনসন ক্রুশো-র জীবনচিত্রণে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বেছে নিলেন বেলেঘাটাকে। এই নির্বাচন অর্থবহ।

॥ ২ ॥

আমরা মধ্যযুগের বাংলার ঘরবাড়ির নকশার ডিটেল বিশেষ কিছু পাই না। এক একটি দিনের সংসার করার ডিটেলও আমাদের হাতে নেই। রাস্তাঘাটের চিত্রটাও খুব উজ্জ্বল হয়ে আমাদের কাহিনীকাব্যে স্থান পায়নি। অথচ এর তো ইতিহাস আছে। জীবনযাত্রার অপরিহার্য অংশ এসব খুঁটিনাটি। চৈতন্য জীবনী গ্রন্থগুলিতে এর সামান্য পরিচয় আছে। বস্তুত অষ্টাদশ শতাব্দ থেকে আমাদের বাড়িঘরের স্থাপত্যের কিছু পরিচয় আমরা পাই দেশি-বিদেশি বিবরণ থেকে। বঙ্কিমচন্দ্র তাকে কিছুটা ব্যবহারও করেছেন। ইতিহাসবিদ দেখিয়েছেন মধ্যযুগের নিম্ন মধ্যবিত্তের (মধ্যবিত্ত যদি বলা যায়) বাড়িঘরের শোচনীয় অবস্থা। মোগল শাসকবৃন্দ মন্তব্য করেছেন হিন্দুস্থানের সাধারণের বাড়িঘর সকালে গুড়িয়ে দিলে বিকেলে আবার তা গড়ে তোলা যায়। কবি মুকুন্দরাম কালকেতুর বাড়ির ভেরেন্ডার থামের কথা এই প্রসঙ্গে মনে হতে পারে। চৈতন্যের অনুগামীরা বাড়িকে সাজিয়েছিলেন, আহারবিহারে পরিচ্ছন্নতা এনেছিলেন। সৌন্দর্যের ছোঁয়া কিছুটা লেগেছিল তাতে। প্রতি গৃহের উঠোনে তুলসীমঞ্চ তার প্রতীক।

বুঝতে অসুবিধে হয় না শান্তিতে শয়ান মধ্যবিত্তের আকাঙ্খা সঙ্কীর্ণ, সংকুচিত ছিল। ইংরেজ সমাজবিজ্ঞানী দেখিয়েছেন বাড়িঘর নির্মাণে একটি বৈঠকখানা এবং পড়বার ঘর বরাদ্দ যেদিন হল সেদিন থেকে জীবনযাপনে যেন একটা নতুন মাত্রার যোগ হল। ঘর তো জীবনযাপনের প্রতিচ্ছবি। পোষাকআশাক তো মানুষের রুচির প্রতিফলন। আহার বিহার তো জীবনেরই অন্নমধুর রূপের বিকশিত রূপ। আর পড়বার ঘর মানেই সংস্কৃতির একটা গ্রন্থির মোচন-গতানুগতিকতা থেকে মুক্তি। সমাজবিজ্ঞানীরা এ সম্বন্ধে অনুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। এখানে সে অবকাশ নেই। হয়ত তার প্রয়োজনও নেই।

বিমল কর এই ঘরকে দেখেছেন। গ্রাম থেকে যে পরিবারটি স্বাচ্ছন্দ্যের এবং জীবিকার জন্য কলকাতায় এল তার ফটিক দে লেনের গর্ভে যখন ঢুকে পড়ল তখন তো জীবনেরও প্যাটার্ন বদলে যাবার কথা। আবার বলি রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে উপন্যাসে ছোট ঘরের চাপ ছিল না। মনের ক্ষুদ্রত্বই তিনি জরিপ করতে চেয়েছিলেন। আর বিমল কর এই ঘরটাকেই উপন্যাসের মধ্যে মুখ্য করে দিলেন। এই ঘর আর সাজ-সরঞ্জাম, তার ছোট চরিত্র তিনি বারে বারে তুলে আনেন। তিনি যে সময়ের কথা বলছেন সে সময়ের উচ্চ মধ্যবিত্তের হাতের নাগালে ভোগ্য পণ্য সুলভ হয়ে এসেছিল খানিকটা। কিন্তু তার চরিত্ররা সে ভোগ্যপণ্য থেকে বঞ্চিত। কারণ ভোগ করবার মতো অর্থ তাদের নেই। কিন্তু চাহিদাটা দানা বাঁধতে শুরু করেছে। আর ভোগ আর অভাবের তুলনাটা কাঁটার মতো বিঁধতে থাকে। বিমল করের পাঠককুল তাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চান দৃশ্যগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপকে। রবিনসন ক্রুসো আমাদের টানত না যদি না আমরা ক্রুসোর সংগ্রামে আমাদেরই খুঁজে পেতাম।

ছোট হতে হতে যখন আমরা রত্নময়ীর ঘরে ঢুকে পড়ি তখন দেখতে পাই একই ঘরে শুয়ে থাকে মা-মেয়েরা। তেলচিটচিটে বালিশ থেকে দুর্গন্ধ বেরোতে থাকে। কলঘরের টিনের দরজাটা নড়বড়ে, ভাড়াটেরা দাঁড়িয়ে থাকে সুধার বেরিয়ে আসবার অপেক্ষায়। কাপড় কাচা সাবান আর গায়ের সাবান একটাই। চুলে তেল কোনওদিন জুটল, কোনওদিন নয়। রান্নার সংক্ষিপ্ত আয়োজন। অতিথি এলে ছুটতে হয় মিষ্টি কিনে আনবার জন্যে। হা-ক্লান্ত সুধার বৈকালিক বরাদ্দ মুড়ি। ঘরে হাঁটু ঢাকে এমন শাড়ি। তার ফাঁকফুকরগুলি লজ্জাকে লজ্জা দেয়। নীচে ভাড়াটে ওরই মধ্যে গান গায়, গান শেখে। কে জানে এখান থেকেই একদিন হয়ত আইনস্টাইন বেরোবে। না, বেরোয় না, বেরোবে না। তেমন আশ্বাস লেখক খুঁজে পাননি। ওই ছোট ঘর তাদের চেপে ধরেছে। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতায় এ চাপের কাতরতা মর্মান্তিক ছিল। রজনীগন্ধার ফাঁসি ঘটে যায় এ ছোট ঘরে। কলকাতার বাজারদর নানামুখী এবং নানা রঙে দেখা দিল।

উনবিংশ শতাব্দ থেকেই কলকাতার হিন্টারল্যান্ড উত্তর ভারতের কিছুটা, গোটা পূর্বভারত রূপে দেখা দিল। গ্রামের মানুষ উচ্চশিক্ষার জন্য এখানে জমতে শুরু করল। ব্যবসা বাণিজ্যের ছোটখাট দোকানপাটের সারি জেগে উঠল। এক কথায় নানা চাকরির বাজার খুলে গেল। উকিল, মোক্তার, শিক্ষক, কেরানির বেশে মানুষ চলে এল, কলকাতা কমলালয়ে। বাসস্থান সে তুলনায় কম। পুঁজি কম। অতএব ছোট ঘরে মৌমাছির মতো খোপে একবকমের আশ্রয় হল। মানুষের খোলা রূপ পালটে গিয়ে এক সঙ্কীর্ণ গুহায় ঠোকাঠুকিতে সংকুচিত হতে লাগল। সুধার বাবা এরকমই একটা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল। শহর নিংড়ে নিল চন্দ্রনাথকে। নিঃশেষিত রত্নময়ী সুধা আরতি বাসু ঠোকাঠুকি করেই স্থিত হাত চাইল।

এই বাড়িতে অতিথি এলে ছুটতে হবে কেন মিষ্টি কিনতে? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা কী বলতে পারি মুখটাকে আড়াল করে ভদ্রতার একটা মুখোশ পরা? মধ্যবিত্তের এই মুখ আর মুখোশের খেলাটাই তো এখন স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শশী এই মুখোশটাকে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলতে পারেনি। হয়ত সমরেশের 'বিবরে' এই বিস্ফোরণটা ঘটে গেল। আর বিস্ফোরণ যখন ঘটে তখন তার প্রপটা একটু বেশি করেই লাগে গায়ে। কিন্তু মোটামুটিভাবে বিমল করের উপন্যাসের ঘটনাকাল (১৯৪১-৪৫) বাঙালির পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছিল। আর ভদ্রলোকের মুখোশটাকে তখন প্রাণান্তকরভাবে ধরে রাখবার প্রয়াস দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের রচনায় বিশ্বাস হারাবার মতো ঘটনা তখন পর্যন্ত দেখা দেয়নি। এমনকী সন্দীপও চাঁদ। যদিও চাঁদের ও-পিঠ-সেখানে আলো নেই।

বিমল কর এই মধ্যবিত্তের খুঁটিনাটি দেখেন। সুধা আরতি বাসু রত্নময়ীর সঙ্গে তিনি আরও একটি পরিবারকে জুড়ে দেন গিরিজাপতি-নিখিল-উমাকে। প্রত্যেক মধ্যবিত্তের ঘরে ঠোকাঠুকি যেমন চলে তেমনই ওই যন্ত্রেই বুনতে থাকে নতুন কালের দিগন্ত পাড়। কেউ পারে, কেউ পারে না। এক সময়ে এই পারে না-টাই বড় হয়ে ওঠে। আর ওত অভাবের মধ্যেই জেগে থাকে মধ্যবিত্তের ঘরে তাদের নিজেদেরই রচিত 'নিরাশা আঁধারে প্রভু তুমিই আশার জ্যোতি' অথবা 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে' পট। সুধার মাঝেমাঝেই ওই পটটা চোখে পড়ে যায়। অবশ্যই সে পট বাবা চন্দ্রকান্তর। যিনি স্খলনপতন থেকে অদৃশ্যভাবে এই পরিবারটিকে রক্ষা করছেন। যিনি আশা জাগিয়ে রাখেন। স্নেহমায়ামমতা দিয়ে সংসারটিকে ঘিরে থাকেন। প্রভু স্মরণের পাশাপাশি পাষণ্ডীর চাবুক অবশ্য সহ্য করতেই হয়। বিমল কর তুলে আনেন রত্নময়ীর বাসু-র প্রতি স্নেহের টান। সুধার স্নেহজলে তার অশ্রুর বেদনা।

আমরা যাকে মুখোশ বলেছি বিমল করের মানুষেরা তা হয়ত মানবেন না। না মানাই স্বাভাবিক। মানলে তো তাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে উঠবে। জীবনযাপনের এই প্যাটার্ন তো একটু একটু করে তৈরি হচ্ছিল। জীবনযাপনের টুটাফাটা তো থাকেই। তাই বলে সেটাই সত্য? এক সময়ে মুখ আর মুখোশ এক হয়ে যায়। আচ্ছেদ্য বন্ধন তাদের মধ্যে। সত্য-মিথ্যা কে করেছে আরোপ? এই প্রশ্নে জর্জরিত মানুষের জীর্ণ রূপ এই উপন্যাসে। সুধার নতুন চাকরি পাওয়ার পর তার আচারআচরণে, বেশভূষায়, গন্ধ সাবান আর এসেন্সের ব্যবহারে মা যখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল তখন রত্নময়ী-কে সুধা যে ভাষায় আক্রমণ করল তা ওই ভেতরের চোরা টানে যে ক্ষয়ের দগদগ রূপ ফুটে উঠছে পাঠক তা বুঝে নেন। রত্নময়ী পথের পাঁচালীর সর্বজয়া নয়। আবার সর্বজয়া থেকে দূরের মানুষও নয়। ইন্দির ঠাকরুনের সঙ্গে সর্বজয়ার নিষ্ঠুর আচরণ জীবনযাপনেরই তো একটা প্যাটার্ন। আর সেই জোরেই সর্বজয়া উপন্যাসে তার স্থান করে নিয়েছে পাকাপাকিভাবে। বিমল কর দেখতে পান সে পাকা ভিতে ফাটলের চিহ্নটা, নোনাধরা দেয়ালের ছ্যাঁতলা-যার পরিবর্তন মর্মান্তিকভাবে জরুরি। আরতি আর সুধা মায়ের স্নেহ মমতার মেড়ে উঠেছে। আরতি পালিত মেয়ে। যেদিন এ রহস্য জানাজানি হয়ে গেল সেদিন দিদির ভালবাসা আর মায়ের স্নেহ মমতাকে ছাপিয়ে বেরিয়ে এল স্বার্থপর চিন্তা। আরতি যদি এখন বাপের সম্পত্তি নেবার জন্য গ্রামে চলে যায় তাহলে সুধা মুক্তি পায়। একটা লোকের খাবার জোগানোর খরচ থেকে সুধা মুক্তি পায়। মুখোশটা সরে যায়। ওই টুটাফাটা জীবনটাই সত্য হয়ে ওঠে। রত্নময়ীও কি দলছুট? গোরার আনন্দময়ী হওয়ার ছটিটেনীতও কি আমরা দেখেত পাই রত্নময়ীর মধ্যে? এই অর্থেই আধুনিক উপন্যাসের জগৎ সংকীর্ণ, সংকুচিত। হিরো, হিরোইনের জগৎ থেকে আমরা নেমে আসি সেখানে যেখানে বলতে হয় 'এপিটাফ এপিটাফ এপিটাফে ভ'রে গিয়েছি মামি/কাল সারারাত অতিশয় স্বপ্নে স্বপ্নে বিদ্যুচ্চমকে জাগিয়ে রেখেছিলে আমায় পুরানো চাঁদ।' শক্তি চট্টোপাধ্যায় এপিটাফ আর স্বপ্নে সেতু রচনা করেছেন মধ্যবিত্তের জীবনকে ঘিরে। বিমল করের ঘরের সংকীর্ণ জমিতে এই এপিটাফ আর স্বপ্নের আয়োজন। আমরা আবার ফটিক দে লেনের ঘরের বর্ণনায় আসি। কেননা এই ঘরই বিমল করের উপন্যাসে বাস্তব রূপ নিয়েছে। বোমাপড়ার আতঙ্কের রাতে রত্নময়ী গলিটিকে জরিপ করে নেয়। ঘরের চরিত্র উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে : 'গলির ও-পাশে উলটো মুখে দত্তদের বাড়ির টালির ছাদ ধসে যাওয়া এবড়ো খেবড়ো দোতলার দালানটুকু দেখা যাচ্ছিল। তাও সবটুকু নয়। চাঁদের আলো পড়েছে। চিলেকোঠার মতন একটা ঘর। মানুষ জন কাউকে দেখা যাচ্ছে না। দেখা পাবার কথাও নয়। দত্তদের বাড়ির এই ভাঙা ধসে-পড়া ঘরগুলোর তলায় ক'টা মুচি থাকে, আর রিকশাবালা। তারা কেউ ওপরে ওঠে না। চিলেকোঠার

মতন ঘরটা ফাঁকা পড়ে আছে–কবে থেকেই। ওই-বাড়ির পরই তেতলা সুরকি-ওঠা, ভাঙা ইঁট হালদারদের বাড়ি। বিরাট একটা কালো পর্দার মতন ঝুলছে। আড়াল করা চাঁদের আলো তার মাথায় পড়ছে। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা। জানালা দিয়ে আর কিছু দেখা যায় না। আশপাশ থেকে পাঁচিলে বাড়িতে ঠেসে গেছে। গায়ে-গা কতকগুলো ঠাণ্ডা কনকনে ইঁট কাঠের প্রেত। রত্নময়ী গলা ঝুঁকিয়ে নিচু গলিটা দেখবার চেষ্টা করলেন। দেখা যায় না। তবে বেশ বোঝা যায় ঘুঁট ঘুঁট করছে গলি'। গা ছমছম করা এই প্রেতপুরীর লম্বা ছায়াটা রত্নময়ীর গলা টিপে ধরে। দুশ্চিন্তায় মুষড়ে পড়েন তিনি। ছোট ঘরে মনকে মেলে দেবার উপায় নেই। এই কলকাতার এই গলি আর বাড়িঘর কী স্বপ্ন নিয়ে বাঁচে তারই কাহিনী রচনা করেন বিমল কর।

আসলে মধ্যবিত্ত যেন একটা মনগড়া আদর্শ নিয়ে যে-ভুবনে বাস করে তার থেকে অন্য ভুবনে চলে যেতে চায়। যত সে বাধা পায় ততই সেই কাঙ্খিত ভুবনকে সে আঁকড়ে ধরতে চায়। এই যে আদর্শ এর নীচেই জমা পড়তে থাকে অবদমিত ভাবনা-চিন্তার স্তূপ। দেয়ালে দেয়ালে ('দেওয়াল') মধ্যবিত্তের সে অবদমিত তৃষ্ণার আর্তিকে আমরা দেখতে পাই না। রত্নময়ী স্বামীর মৃত্যুর পর এ সংসার নির্মাণ করেছেন। মায়ের একটা সান্ত্বনা পাবার কথা এখানে। উদয়াস্ত খেটে তিনটি সন্তানের (পালিত আরতিকে ধরে) আহার যুগিয়েছেন তিনি। মেয়ে সুধাকে তিনি ভালোবাসেন। কিন্তু তিনি কি সুধার চাকরিকে মেনে নিতে পারেন? বোধ করি মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু বিকল্প কোনও ব্যবস্থাও তার সামনে নেই। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই যে সংসারের ওলটপালট তাকে রত্নময়ী মেনে নিতে পারছেন না। এইখানে ওঁর নৈতিক পরাজয়। আর পরাজয়ে পরাজয়ে মন কুঁকড়ে আসে। একদিন সে জমা স্তূপের বারুদে আগুন লাগে। বিস্ফোরণ ঘটে যায়। রত্নময়ী-সুধার সম্পর্কে মধ্যবিত্তের পালিত লালিত সংস্কার চুরমার হয়ে যায়। বিমল কর এই ভাঙনের রূপ দেখতে পান। উপন্যাসে ধীরে ধীরে ছোট ঘর থেকে তিনি ছোট মনের জালকে চিনতে পারেন। এই মাকড়শার জালে বন্দি মানুষদের ব্যবচ্ছেদ করে ঘটনার প্রবাহকে এগিয়ে দেন লেখক।

রত্নময়ী-সুধার মন কষাকষির টানাপোড়েন যখন একটা সংবেদ বিন্দুতে এসে পৌঁছয় তখন মনে হতে পারে ছোট ঘরে ছোট মনের সংঘর্ষটা আর থামবে না। কিন্তু এই সংঘাতও ঢাকা পড়ে যায় ওই মায়ের স্নেহের আর মেয়ের কাতর সমর্পণে। এতেই জানালার ফাঁক ফুকর দিয়ে আলো এসে পড়ে। এই আলো ছায়ার সম্পাতে উপন্যাসটিতে মৃদু ঢেউ উঠতে থাকে। বিমল কর এর মধ্যে বিষণ্ণতার একটা তাৎপর্য খুঁজে পান। বিষণ্ণতা? সুধার অসুস্থতা এবং চাকরিতে ছেদ আর সুচারুর যুদ্ধে একটা হাত হারানো সব মিলে যেন মধ্যবিত্তের কষ্টেসৃষ্টে জীবনযাপনে সুখকে কৃপণের মন্ত্রে টুটি চেপে ধরে। খড়কুটো-র ভ্রমর এরকমই প্রকৃতিকৃপণ শরাঘন্তের শিকার। নায়ক অমলের শেষ পর্যন্ত ব্যাধির কাছে পরাজিত হতে হয়। কিন্তু দেওয়াল উপন্যাসে সুধা ব্যাধিজর্জর হয়েও একটা দাঁড়বার জায়গা খোঁজে। সেই অন্বেষণ এই উপন্যাসে ছায়া বিস্তর করে। আলো-আঁধারের সৃষ্টি করে। সেটা যেন করুণ একটা প্রেতের এককরমের আস্তে আস্তে পুড়ে যাওয়া।

আর ছেলে বাসু যখন কাউকে না জানিয়ে মিলিটারির কাজে চলে যায় তখন রত্নময়ীকে একটা বিরাট শূন্যতার মধ্যে ঠেলে দেয়। আর এই শূন্যতার মুখোমুখি হয়ে রত্নময়ীর অসহায় মূর্তিটিও খড়ির দাগে আঁকীর্ণ হয়ে যায়। তার স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে কিছুই খুঁজে পায় না। মধ্যবিত্তের এই বিপন্নবোধ তো সকল শিল্পীকেই আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। বিমল কর অন্তত সেরকমই মধ্যবিত্তকে দেখেছিলেন। পরে অবশ্য তিনি ভবিষ্যৎ-কে এতটা বিষণ্ণ দৃষ্টি নিয়ে দেখেননি। পূর্ণ অপূর্ণ উপন্যাসে আর একরকম ভাবে জীবনের ছক কাটার প্রয়াস পেয়েছিলেন লেখক। গিরিজাপতি এই নৈরাশ্যকে মেনে নিতে পারেননি। তিনি বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন আদর্শ সমাজ জগতে কোথাও নেই। মানুষের জীবন পূর্ণতা কখনও আসে না। কিন্তু তাই কি একমাত্র সত্য? গিরিজাপতি দেখতে পান জীবননাট্যের ভিত রচনা করে আদর্শ। তাকে পাই বা না পাই মানুষ তাকে পাবার জন্য এগিয়ে যায়। বিমল কর কি উপনিষদের 'চরৈবেতি'-কে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। আসলে উনিশ শতকের বাঙালি ভদ্রলোকের এই আদর্শবাদ ছিল বড় সম্পদ। বারবার এই আদর্শবাদের ঘেরাটোপ-কে চারদিক থেকে বেঁধে রেখেছেন। সুদে-আসলে তাকে মোটা ব্যালান্সে উত্তরে দিতে চেয়েছেন। বিশ্বাস হারানো পাপ বলে তিনি মনে করেছেন। তাকে যেন কিছুতেই লন্ডন ব্রিজ ইজ ফলিং ডাউন এই ভাঙ্গা বাক্যে মুঠোয় আনা যায় না। কেন তিনি বলে যাবেন বিল্ট ইট আপ উইথ আয়রন বারস। অন্যদিকে রত্নময়ী?

মধ্যবিত্ত বাঙালির ঘরে গিরিজাপতিরা থেকে যায়। এরা যেন সংসার যাত্রার কাণ্ডারী। ভারসাম্য রক্ষা করার দায়িত্ব কতকটা এরা নিজেরাই নেন, কতকটা অংশায়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না, তবু বলতে বাধ্য নেই রবীন্দ্রনাথের নিখিলেশ, বিপ্রদাস এই জাতীয় চরিত্র। উত্তেজনা-উত্তাপে এসব চরিত্র বিচলিত হয়নি এমন নয় কিন্তু আকস্মিক কিছু এরা করে না। এরকম মাপের চরিত্র অবশ্যই গিরিজাপতি নয়, তবে ভাবনাচিন্তায় কিছুটা সগোত্র বলে মেনে নিতে পারি।

আমাদের প্রসঙ্গ ছিল রত্নময়ী। সেখানে ফিরে আসি। রত্নময়ীও সংসারকে ধরে রেখেছে। মধ্যবিত্তের ঘরে চিরপরিচিত অভিভাবক। গিরিজাপতিও অভিভাবক। কিন্তু অভিভাবকরাই বুঝে নেন ওদের কাল শেষ হয়ে গেছে। বাতিলের পর্যায়ে না পৌঁছলেও অভিভাবকত্বের খুটি অনেকটাই শিথিল হয়ে যায় রত্নময়ীর আর

গিরিজাপতির। বিমল কর সেরকম একটা পরিবেশ তৈরি করেছেন এই উপন্যাসে। ঈশ্বরবিশ্বাসী রত্নময়ীর জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে কতকগুলি ধরা বাঁধা বিধিবিধানে। প্রায় জন্মসূত্রেই সেই নিয়ন্ত্রিত বিধিবিধানে রত্নময়ী অভ্যস্ত। আবার কিছুটা অর্জন করে বাঙালি মেয়েরা বিবাহসূত্রে। এক পরিবার থেকে অন্য পরিবারে গোত্রান্তর কেবল ভাসাভাসা নয় জীবনের সঙ্গেই তা জড়িয়ে নারীর ভাবনাচিন্তায় কখনও বিপ্লব ঘটায় কখনও সমান্তরাল জীবনে চলতে হয় কখনও মেনে নিয়ে নিজের অস্তিত্বকে সেই ভাবেই গড়ে নেয়। সন্তানসন্ততিদের মধ্যে সেই জীবনকে টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু রত্নময়ী কী পারল তা? বিমল করের জিজ্ঞাসা এখানে তীক্ষ্ণ এবং ঘোরতর সংশয়াচ্ছন্ন। কেমন করে প্রাণপণ সহাশক্তি নিয়ে সে জীবনযাত্রার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে চেয়েছে বিমল কর তা পরতে পরতে খুলেছেন। সে পুষ্পানুপুষ্প বিবরণের প্রয়োজন নেই। কিন্তু লেখক যখন উপন্যাসটির জাল গুটোলেন তখন রত্নময়ী যে ভেঙ্গে পড়েছে।

বাসুর চলে যাওয়াটা চরম আঘাত তার কাছে। কিন্তু এটা খুব কাছের কারণ। তার জীবনের ছোটখাট মুহূর্তগুলিকে লক্ষ করলে দেখব আঘাতই তিনি পেতে অভ্যস্ত। ছোট ঘরের চাপে তিনি বিপর্যস্ত। বিধবার গ্লানি দেখা দিল স্বামীর ইচ্ছাকে তিনি পূরণ করতে পারেননি। তার বক্তব্য এই রকম 'যে চার দেওয়ালের ঘরের মধ্যে তোমাদের এনে রেখেছিলাম, ভেবেছিলাম সে-ঘর বড় হবে। হল না। দেওয়ালগুলো আরও ছোট হল, তোমরা বেড়ে উঠলে। আমি তোমাদের কাউকে বাঁচাতে পারি নি। পারবও না। নিজেরা যদি বাঁচতে পার বাঁচো'। তারপর বললে 'তোমার বাবার কোথাও কলঙ্ক ছিল না। তাঁর মুখে চুন কালি না মাখিয়ে আর যা পার কর। আমার বলার কিছু নেই'। রত্নময়ী পরাজয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। অন্যদিকে গিরিজাপতির দৃঢ়তা এবং আশাবাদ। এ দুয়ের টানাপোড়েন উপন্যাসে বিস্তৃত।

॥ ৩ ॥

খুব স্পষ্ট না হলেও এই উপন্যাসে বিমল কর আর একটি সমস্যাকে ছুঁয়ে গেছেন। ইয়ান ওয়াট (Ian Watt) দেখিয়েছেন লন্ডন শহরে শিল্পবিপ্লবের পর কীভাবে নারীর চিরাচরিত জীবন পালটে যেতে আরম্ভ করল। পালটে যাওয়া সমাজে নারীর বিবাহ সমস্যা নতুন মাত্রা পেল। ইয়ান ওয়াট দেখিয়েছেন ধীরে ধীরে ইংরেজ সমাজে আইবুড়ো নারীর সংখ্যা বাড়তে লাগল। তিনি যেসব কারণের উল্লেখ করেছেন তার সব গুলিই আমাদের সমাজে পাওয়া যাবে এমন নয়। কিন্তু বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, সহবাস হিন্দুবিবাহ ইত্যাদি সমস্যার যে আলোচনা আমরা উনিশ শতক থেকে আজ পর্যন্ত দেখতে পাই তাতে শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণটিই বড় আকারে দেখা দিয়েছে। অর্থনৈতিক দিকটি তেমন গুরুত্ব পায়নি। সামাজিক কারণ সম্পর্কে তাঁরা অবহিত ছিলেন সন্দেহ নেই।

বিমল করের সুধা আর আরতির জীবনে যেন এই সমস্যার চেহারাটা কিছুটা উদ্ভাসিত। আমরা কী বলতে পারি সুধা যদি অসুস্থ হয়ে না পড়ত তাহলে তার পক্ষে বিবাহ করার অন্তরায় হয়ে উঠত তারই সংসারের মানুষজন। চিরজীবন আইবুড়ো থেকে সে এই সংসারই চালিয়ে যেত। যে ভারটা শেষ পর্যন্ত গিয়ে পড়ল আরতির উপর। আমরা জানি না আরতির ভবিষ্যৎ কী? অন্য দিকে বাঙালি মেয়েরা চাকরি জীবনে প্রবেশ করল কীভাবে, কোন চাপে সেই প্রসঙ্গটিও ওই উপন্যাসে ঘন হয়ে দেখা দিয়েছে। বাংলা উপন্যাসে মেয়েদের চাকুরীজীবন এবং আইবুড়ো হয়ে থাকার সমস্যাটা সমাজতত্ত্ববিদ্যা কিছুর করবেন। আমরা সাদামাটা জীবনে দেখি মেয়েরা চল্লিশের দশক থেকে (শিক্ষকতা কিংবা এই জাতীয় চাকরির কথা বাদ দিচ্ছি) বিভিন্ন অফিসে যেভাবে ধীরে ধীরে ঢুকে পড়ছিল তার মূলে ছিল অর্থনৈতিক সমস্যা। এর সঙ্গে অবশ্যই জড়িয়ে ছিল স্ত্রীস্বাধীনতার প্রশ্ন। ঐতিহাসিকদের তিরিশ চল্লিশ দশকের রাজনৈতিক আন্দোলনে অধিক মাত্রায় নারীর যোগদানকে একটি লক্ষণীয় উত্তরণের পদক্ষেপ বলেই বিবেচনা করে থাকেন। অবশ্য বিমল কর সুধাকে নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রতিনিধি হিসেবে ধরতে চাননি। সুধার মধ্যে সেরকম সম্ভাবনাও আমরা দেখতে পাই না।

কিন্তু রত্নময়ীর অসহায় নখের মতন সাদা মুখ সুধাকে যেন ধাক্কা দিল সজোরে। স্বপ্নে সে মায়ের মুখ দেখে জেগে উঠেছে। সিদ্ধান্তও সে নিয়ে নিয়েছে তখন। সুচারুর সঙ্গে সে বোঝাপড়ায় আসতে চেয়েছে।

এক প্রবন্ধে অর্থনীতিবিদ্ অশোক মিত্র ঔপনিবেশিক মানসিকতায় আচ্ছন্ন মধ্যবিত্ত বাঙালির কথা বলেছেন। তিনি লক্ষ করেছেন স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও বাঙালির মানসিকতায় ঔপনিবেশিক ধ্যান অনড় হয়ে ছিল (তাঁর শিক্ষক অমিয় দাশগুপ্তর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন প্রসঙ্গে)। বিমল করের দেওয়াল উপন্যাসের সমগ্র পরিবেশ মানুষজন সেই বাতাবরণেই বিচরণ করেছে।

॥ ৪ ॥

দেওয়াল উপন্যাসের সেই বাতাবরণ কাটিয়ে ওঠবার ইঙ্গিত আছে। খোলা জানালার কথা বিমল কর বলেছেন। গিরিজাপতি মানুষের দ্বৈত সত্তার কথা বলেছেন। একটা বাইরের, অন্যটা ভেতরের। ভিতরের মানুষটা যখন জেগে ওঠে তখন যেন গতিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরে যখন পূর্ণ অপূর্ণ বিমল কর লিখলেন তখন যেন আমরা গিরিজাপতিকেই আবার পেয়ে যাই ভিন্ন পরিবেশে সুরেশ্বরের মধ্যে। সুরেশ্বরের মায়ের আত্মহত্যা, বাবার লাম্পট্য এবং সংসারের অশান্তি তার জীবনে থিতিয়ে ছিল। সেও জীবনের অর্থ খুঁজেছে। অন্ধ আশ্রমের পত্তন করে বেঁচে উঠতে চেয়েছে। দুঃখকে সে চেনে। স্বীকার করে নিয়েছে বিনম্রচিত্তে।

সুরেশ্বর যেন কিছু পেতে চাইছে। অন্তত অবনীর তাই মনে হয়েছিল। হৈমন্তী তাকে আবার সংসার জীবনে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছে। সুরেশ্বর তখন ভিন্ন জগতের মানুষ। অবনী যখন প্রশ্ন করে সুরেশ্বরকে 'আপনি কি কোনো কিছু পাবেন? অন্ধ তো পথ পায় না'। সুরেশ্বরের উত্তরটি লক্ষণীয় 'মানবজীবনের একটা দিক এই রকমই। দুঃখের জগতে যন্ত্রণার জগতে আমরা জন্মেছি। তেমন করে ভাবতে গেল ব্যর্থতাই "মানুষের নিয়তি"।' সেজন্য সুরেশ্বর নির্বোধের মতো সকল পাওয়াকে বিসর্জন দিয়ে অন্য কিছুর দিকে চেয়েছিল। সে আলোর ঠিকানা তার কি জানা আছে? বিমল কর এই উত্তরণে বিশ্বাসী।

॥ ৫ ॥

আমাদের মনে রাখতে হবে বিমল কর উপন্যাসটি আরম্ভ করেছিলেন ১৯৫৬ সালে। উপন্যাসের জগতে পরিক্রমা লেখকের যখন অনায়াস হয়ে উঠল তখন অনুসন্ধানের মাত্রা বাড়তে বাড়তে আমাদের ভিতর ও বাহিরকে তিনি বুঝতে চাইলেন নিবিড়ভাবে। তাঁর সমাজজিজ্ঞাসা একটা ভিন্ন স্তরে লাফ দিয়ে যেন কিছুটা স্বস্তি পেতে চাইল। জীবনের মানে তিনি খুঁজতে চেয়েছেন। ফলে উপন্যাসে তাত্ত্বিক ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে। পরিবেশ ব্যক্তি যেন সেই তত্ত্বকে পরিস্ফুট করতে চাইছে। তাদের স্বতন্ত্র মূল্য যেন নেই। বিমল কর যেন বলতে চাইছেন মানুষ সামাজিক জীব সন্দেহ নেই। বাহির অহরহ তাকে মারছে, গড়ছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় উত্তপ্ত লৌহকটাহে মানুষ টগবগ করে ফুটছে। এই ফুটন্ত রূপ তার ভিতরের অগণ্ত তৃষ্ণাকে জাগিয়ে তোলে। আর তৃষ্ণাহর সমুদ্রের সন্ধানে সে বেরিয়ে পড়ে। গিরিজাপতি মুখ থুবড়ে পড়েনি। কিন্তু অন্য বাড়িতে উঠে গেছে। সুরেশ্বর কলকাতা ত্যাগ করে চলে এসেছে ছোটনাগপুরে। কে জানে রবীন্দ্রনাথ বিমল করকে প্রভাবিত করেছে কিনা। তা না হলে সুরেশ্বরের চিন্তায় এমন একটি নির্জন স্থান নির্বাচন করার কারণ কি? রবীন্দ্রনাথ তো মনে করতেন প্রকৃতির আশ্রয়ে মানুষ বড় হয়ে ওঠে। কলকাতার কোলাহল যেন ভেতরের মানুষটাকে জাগতে দেয় না। রত্নময়ী-কে তার স্বামী বলেছিল ঘরে আবদ্ধ হয়ে না থাকতে। যেদিন সময় আসবে সেদিন সমস্ত আসক্তিমুক্ত হয়ে টপ কর চলে আসতে ঠেকাঠে যেখান থেকে বহির্বিশ্বকে পুরোপুরি দেখতে পাওয়া যায়। এই বিকল্পকে রত্নময়ীর গ্রহণ করা অসম্ভব। কিন্তু সুরেশ্বরের পক্ষে সম্ভব। তাহলে পূর্ণতার একটা মানে পাওয়া যায়। এই প্রশ্নটা কিন্তু দেওয়াল উপন্যাসেই করা হয়েছে। বিমল কর ইএম. কাটারের উপন্যাসের উপাদানগুলিকে সাজান বটে। সাজাতেই হয় কিন্তু কাটারের জোরের জায়গাগুলি তিনি অন্যত্র সরিয়ে দেন। সেজন্য সুরেশ্বরকে, গিরিজাপতিকে আমাদের ভাসা ভাসা মনে হতে পারে। লেখক যেন ইচ্ছে করেই কতকগুলি ঘাতপ্রতিঘাতের জায়গা সরিয়ে নিতে থাকেন। অমল-ভ্রমরকেও সেরকম মনে হয়। তবু যতটুকু এরা আয়ত্তের মধ্যে ততটুকুতেই দেখতে পাই সন্ধ্যার বিষণ্ণ ম্লান ছায়া এদের ভাবনা চিন্তাকে ধূসর করে দিচ্ছে। তিক্ত দিকটার যেন এসব উপন্যাসে প্রবেশ নিষেধ। নিষেধের বেড়াজাল কিন্তু দেওয়াল উপন্যাসে নেই।

॥ ৬ ॥

বিমল কর কী উপন্যাসশিল্পকে একটু ভিন্নরকমের দিকে সরিয়ে নিয়ে আসতে চান? তাঁর নিজের মধ্যেই কী বিরুদ্ধ একটা ভাবনা চলাচল করে না? তিনিই তো 'যদুবংশ' উপন্যাস লিখলেন? তিনিই তো 'আত্মজা'-র মতো গল্প লিখে আলোড়ন তোলেন। সেজন্যে কমিটেড লেখক বিমল কর নন বলে আমার বিশ্বাস। বিচিত্র জগতের বিচিত্র অন্বেষণ। বিচিত্রভাবে হয়ে ওঠা। তাঁর কমিটমেন্ট মানুষের কাছে। সে জন্যেই তাঁর হাতে উঠে আসে ভিন্নমাত্রায় যদুবংশের কাহিনী।

দেওয়াল উপন্যাসে যদুবংশের মুখপাত তো আরও নিয়ম মেনে এগিয়েছে। বিমল কর এ উপন্যাসে যুদ্ধের কথা বিস্তৃতভাবেই বলেছেন। প্রেসের সামান্য কর্মচারী মিহিরের ধাপে ধাপে ভোগাকাঙ্খার চোরাপথ-কে বিমল কর অনাবৃত করেছেন। মন্বন্তরের কিছু বর্ণনা এই উপন্যাসে উঠে এসেছে। আর জাপানি যুদ্ধ-বিমানের হানায় মানুষের প্রতিক্রিয়াকে ব্যাপ্ত করেছেন বাসু-রত্নময়ী-সুধা-আরতি-গিরিজাপতি-নিখিল-উমা-র প্রত্যক্ষদর্শিত সংলাপে আর পরিবেশের থমথমে অবস্থার বিবরণে। কলকাতার রাস্তায় নিষ্প্রদীপের মহড়া, সাইরেনের শব্দ, এ.আর.পি-র বংশবৃদ্ধি-কেও বিমল কর সচারু ভাবে দেখিয়েছেন। সেই সময়ে এক ধরণের চাকরির বাজার যে খুলে গিয়েছিল তাও আমরা জানি বাসু আর তার বন্ধুদের চাকরি পাওয়ার বিবরণে। জাপানি বোমার আতঙ্কে কলকাতা ছেড়ে পালানোর ভয়াবহ আর মর্মান্তিক বর্ণনারও অসম্ভাব নেই এই উপন্যাসে।

অন্যদিকে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের শরিক কিছু মানুষের চিন্তাধারা এবং কর্মপদ্ধতির প্রসঙ্গ এই উপন্যাসে উঠে এসেছে সে তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। গিরিজাপতির রাজনীতিজ্ঞ এবং রাজনৈতিক জীবনের ছক আছে এখানে। কিছুটা অতীতের কথা কিছুটা একালের (উপন্যাসের ঘটনাকালের) কাহিনীতে তা সীমাবদ্ধ। কংগ্রেসের ইতিহাসে নামমাত্র খসড়াও এখানে পাই। গিরিজাপতির রাজনৈতিক জীবনে হিংসার নীতিগ্রহণ এবং তা পরিত্যাগ করার কাহিনীতে চমক আছে, নাটকীয়তাও আছে। নিখিল উমা তার সন্তান না হলেও এক মহৎ প্রায়শ্চিত্তের ইশারা আছে এই গল্পে। সৎ, নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক কর্মীর প্রায় তপস্বীর জীবন যেন দীপ্যমান হচ্ছে এই চরিত্রে। পুলিশের সঙ্গে সশস্ত্র হাঙ্গামা, খণ্ডযুদ্ধ, বিপ্লববাহিনীর (মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী) যা কিনুবাহিনীর রূপ নেয় তার গোপন প্রচারপত্র বিলির ইতিহাস বিমল কর তুলে এনেছেন। কোনও কোনও সমালোচকের কাছে

এই প্রসঙ্গটাই উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু মনে হয়েছে। হওয়াই সম্ভব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ও পরের কয়েকটি বছর রাজনৈতিক আকাশ যেমন অস্থির হয়ে উঠেছিল তেমনই বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্দীপনাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে নানা রূপ নিচ্ছিল।

কিন্তু বিমল কর কী সত্যিই এই প্রসঙ্গটিকে কেন্দ্রীয় ভূমিকা রূপে গ্রহণ করেছিলেন? বোধ করি বিমল কর এই উপন্যাসের বৃত্তের একেবারে প্রান্তে স্থাপন করেছেন। রাজনীতি যুদ্ধ বাঙালির চিত্রচরিত্রকে পরিবর্তিত করে দিচ্ছিল ঠিকই। বিমল কর উপন্যাসে তাকে ছুঁয়েছেন মাত্র।

কিন্তু একটি চরিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ ডিটেলে বিমল কর সেই সময়ের জীবনকে পরিপূর্ণভাবে তুলে এনেছেন এ সম্পর্কে সন্দেহের স্থান খুবই কম। নবীন যদুবংশ-কে তিনি প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন এই উপন্যাসে। রত্নময়ীর ছেলে বাসু কেন্দ্রীয় চরিত্র (সাবেকি সমালোচনার ভাষায়) কি না এ বিতর্কে যাবার প্রয়োজন নেই। বাপের মৃত্যুর পর সংসারের অনটনে লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে সে পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে মিলেমিশে ভালোয়-মন্দয় কেললই ছটফট করেছে। একটার পর একটা মুহূর্ত তার সামনে এসেছে আর সে নিজের মতো করে তার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, গ্রহণ করেছে। এই সময়ের (যুদ্ধ-মন্বন্তর ইত্যাদি) প্রভাব তার উপরে গুরুতর। বস্তুত রত্নময়ী যখন অনুভব করেন তার আগোচরেই অনেক আগে থেকেই পুরনো ইমারতের মতন তাঁর ধারণা, অভ্যাস ভালমন্দ জ্ঞান, পছন্দ অপছন্দ সব, সমস্ত ভাঙছে, ভেঙে ভেঙে পড়ছে তখন এই ভাঙনের (রূপান্তরের?) রূপটা সব চাইতে বেশি করে ধরা দিয়েছে বাসুর ভাবনাচিন্তায়, বাসুর কর্মপদ্ধতিতে।

সে জানে সে রোজগার করে না। এটা তার অযোগ্যতার জন্য যত না তার চাইতে বেশি পরাধীন দেশের বেকারত্বের জন্য। এই বেকার যখনকার অস্থিরতা উপন্যাসে যে ঢেউ তুলেছে তা অনেক সময়েই কূল ছাপিয়ে গেছে। তার বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে ধার করেছে, চায়ের দোকানে পয়সা জুটলে আড্ডা মেরেছে, বন্ধুর বাড়ির মূল্যবান জিনিষ চুরি করবার লোভের শিকার সে হয়েছে, বোতল ধোয়ার কাজ নিয়েছে, এ.আর.পির কাজে যোগ দিয়েছে, কন্ট্রোলের চিনি সংগ্রহ করে বন্ধুবান্ধবদের কাছে চড়া দামে বিক্রি করেছে, রকবাজি করেছে, যৌন আকর্ষণে কখনও কখনও উতলা হয়েছে কিন্তু কাউকেই সে ঠিক বিশ্বাস করতে পারেনি। দিদির পয়সায় সে খায়। বাড়িতে বাস করে, দিদির গঞ্জনা সহ্য করে কিন্তু মুক্তির কোনও পথ জানা নেই তার। দিদিকে সে ভালবাসে আবার ঈর্ষাও করে। ঈর্ষা কেন, ঘৃণাও করে কখনও কখনও। মা-এর সঙ্গে ব্যবহারও তার ওই রকমই। উমা-কেও সে ভালবাসতে চেয়েছে। আবার পিছিয়ে গেছে। যৌন আকর্ষণকে সে ঠেকাতে পারে না, ঠেকাতে চায়ওনি। কোনও কিছুই তার জীবনে স্থায়ী হয় না। বিমল কর এই চরিত্রটিকে একেবারে স্থূল মূলে উপস্থিত করেছেন। মিহিরের কালোবাজারি, জোচ্চুরি, এক ধরণের অষ্টপ্র। কিন্তু বাসুকে ভ্রষ্ট চরিত্র বলে মনে হয় না। নঙর্থক চরিত্রও নয়। পরগাছা সে নয়। সে যখন লুকিয়ে মিলিটারির চাকরি নেয় তখন যে চিঠিতে সে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মা-কে সে চিঠি লেখে আর জানায় 'আমি মাইনে পেলে তোমায় টাকা পাঠাব'। আমাদের মনে হয় সংসারের যে দগদগে মর্মান্তিক রূপটা এই উপন্যাসে বিস্তৃত হয়েছিল বাসুর এই চিঠি তার উপর সান্ত্বনার প্রলেপই নয়-নতুন করে বাঁচার প্রেরণা। অথচ আমরা দেখেছি কী নিদারুণ আক্রোশে বাসু হিংস্র হয়ে ওঠে। এই হিংস্রতার কার্য-কারণ বিমল কর খোলা মনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করেছেন। সমাজজিজ্ঞাসার এই বাস্তব প্রতিফলন এত ঘন, এত আন্তরিকভাবে খুব কম উপন্যাসেই দেখা গেছে। উপন্যাসে কোনও কোনও চরিত্র নিষ্ক্রিয়, কোনও কোনও চরিত্র একঘেয়ে, কোনও কোনও চরিত্র কিঞ্চিৎ অস্ফুট, কিন্তু বাসুই যথার্থ নড়ে চড়ে বেড়ায়। সে সুন্দর। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে অবশ্য।

॥ ৭ ॥

বিমল করের উপন্যাসের ভাষা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। মধ্যবিত্তের যে ভাঙনের ইতিহাস তিনি রচনা করেছেন উপন্যাসের ভাষায় তা ধরা পড়েছে। যে বাসুর কথা আমরা বলছিলাম তার বলিতেও তা রূপ নিয়েছে। ছোট ঘর ছেড়ে সে যখন (হায়, এ ঘরের নীচের তলায় তার আড্ডার সুযোগ ছিল। একটু যেন নিজেকে মেলতে পারত। যা সুধা বা আরতি পারেনি। এখন বাসু বন্ধুদের বাড়িতে এসে একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বিড়ি ফোঁকে, নিজের ভাষায় কথা বলতে পারে) আড্ডা জমাতে যায়। বন্ধু মন্টার কী রকম? 'ভেজা পটলের মতন বড় বড় চোখবালা ফুলকো-লুচি মাসিটা' যে আজকাল 'খুব আঁট মেরে রয়েছে'। মন্টার বাড়ি যেত সে 'একটু কনকি মারতে'। বাসুর ওই গুমরানো মাসিটাকে ভাল লাগে না। তার হচ্ছে 'স্ট্রেট টক'। নতুন ভাড়াটেদের দেখে স্বভাবতই বিরক্ত, ক্ষুব্ধ। তার বক্তব্য 'বুঝলি রে-সব একেবারে বিভীষণ। শত্রু মাইরি, ঘরের শত্রু; নয়ত ও-শালাদের তল্পিতল্পা গুটিয়ে দিতাম। আড়াই হাতি বেগুন গাছটার (উমা) আবার কী চোট রে, গৌরে। তাকায় যেন কাঁটা ফুটিয়ে দিচ্ছে পট পট করে'। গৌরাঙ্গ কী বই পড়ে?-'একটা কেল্লামাত ক্রা বই'। মীনুদি বাসুকে সঙ্গমের স্বপ্ন দিয়েছিল। বাসুর সমস্ত সত্তা জুড়ে ছিল তার পুলক শিহরণ। কিন্তু মীনুদি সরে গেল। বন্ধুর কাছে সেই সুখের এবং দুঃখের স্মৃতিচারণ করেছিল বাসু। কী রকম? 'আমি শালাই যত ভেবে মরছি ওই খচড়ি ছুঁটিরা জন্যে। মীনু কার মেয়ে?-'মদো মাতাল মাগীবাজের রক্তে জন্ম' মীনুর। বাসুর আফশোষ 'ওর জন্যে ফালতু আমার ফিফটিন রুপিজের সিডিক গাড্ডাও গেল'। 'পল্টুরা খুব ভাঁট নিচ্ছিল', 'মদমারা ওই তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের মহিষাসুর', 'হারামি কী মতলবে

ছিল', 'আমিও শালা গুল মেরে মেরে বৌকে টনকে রেখেছিলাম, পল্টার পিয়ারের লোক', 'কী চিজ তা তো জানে না', 'সিক্রেট কথা তবে বলব', 'দিদিটা ফেঁসেছে', 'সব ওয়াচ', 'শেষ পর্যন্ত দি কাইট উইল কাট', 'তুই বড় আন্সান্ট বাত বলিস', 'লে লে দিবি', 'এ একেবারে জাম্পু ট্যাকটিস', 'গার্জেনি ফলানো', 'সব সময় খেঁকাবে, তম্বি ফলাবে', 'হিটলারটা বাঘের বাচ্চা'–এ তো অপরাধ জগতের ভাষা নয়। এক কথায় বলব এ ভাষা নবীন যদুবংশের ভাষা। বাসু যখন বাহাত্তর টাকা মাইনের (খাওয়া-পরা ফ্রি) চাকরিতে ঢুকল তখন আবার যেন একটা ছিটকে পড়া মানুষ তার বৃত্তে ফিরে এল। মায়ের জন্য উদ্বেগ উৎকণ্ঠা, সংসারের হাল ধরার প্রবল ইচ্ছা ফুটে ওঠে টাকা পাঠানোর সংবাদে। সে ভাষাও বাসুর, একেবারে মনুষ্যত্বের প্রবল আবেগে তপ্ত।

বিমল কর ১৯৫৬ সালে যখন উপন্যাস লেখেন তখন উপন্যাসের ভাষা অনেকটাই পালটে গেছে। জীবনের মূল্যবোধ আর পাটার্ন পাল্টানোর ফলে বর্ণনা-বিবৃতিতে সেই ভাষা চলে আসে। একথা ঠিক বিমল কর কলকাতার কথা লিখেছেন। গ্রামের মানুষ কলকাতায় চলে আসে।

যে-কলকাতা কেবল গ্রাস করে না–কখনও কখনও কোলে টেনে নেয়। বিপ্লবীরা আসে, গিরিজাপতিরাও এসে যায়, এমন করে বাসুরাও এসেছিল। যারা বোমাতঙ্কে পালিয়ে যায় তারাও ফিরে আসে একদিন। ফটিক দে লেনের পুতিগন্ধময় গলিতেই। কিন্তু এও বোধ হয় ঠিক অবারিত প্রান্তরের (হায়, জীবনানন্দে নষ্ট শস্য গ্রামের প্রান্তরেও পড়ে থাকে) খোলা আকাশকে আমরা হারিয়ে মনের প্রসারকে খানিকটা রুদ্ধও করেছি। বিমল করের উপন্যাসে সেজন্যে দেখা দেয় মুক্তির আকাঙ্খা, খোলা জানালার কথা। ওই পল্লী স্পিরিট শহরের মানুষকে আর এক রকম ভাবে আকর্ষণ করে। চাঁদ, জ্যোৎস্না মাঝে মাঝে বিমল করের কলমে ঝিকিয়ে ওঠে। আর সেই জ্যোৎস্নায় ফটিক দে লেন, কলকাতা কী সান্ত্বনা পায় কে জানে? মরা আলোয় এই সব মানুষ কী উজ্জ্বল রৌদ্রের প্রত্যাশা করে। উপন্যাসে বার বার দেখা দেয় সন্ধ্যার ছবি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সে সন্ধ্যা দিনান্তের বেড়াটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে। বর্ণনায়, বিবৃতিতে, সংলাপে এই সন্ধ্যার প্রবেশ ঘন ঘন। আর সন্ধ্যা কেবল প্রকৃতিতে নয়, মনেও। রুক্মিণীর ক্রোধ নেই আছে 'কেমন এক স্তব্ধতা', আছে 'বিষণ্ণতা', ভাবনাটা হয়ে ওঠে 'ঘোলাটে',। বিমল কর এমন একটা সময়-কে নির্বাচন করেছিলেন যখন কলকাতায় ব্ল্যাক আউট চলছে। সন্ধ্যা-কে বোঝবার আগেই ঝুপ করে অন্ধকার নেমে আসে। ছোট ঘর আর ছোট মনে তার কী অসীম ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া বিমল কর তা দেখিয়ে দেন। 'হুহু করে হাওয়া দিচ্ছে। বৃষ্টি থামে নি। ঝিরঝির করে পড়ছে। সামনে, পাশে, আকাশে-চতুর্দিকে অন্ধকার। ঘন অন্ধকার', 'এখন রাত কত কে জানে'–(জেগে থাকে এই রাতে মা, আরতি, সুধা), 'গলির রাস্তাটা অন্ধকার, দূরে কালো রঙ-লেপটানো গ্যাস পোস্টের তলায়, একটু মিটমিটে আলো', 'সুচারু দেশলাই জ্বালল। আর সঙ্গে সঙ্গে টুক্ করে হলুদ ম্লান খানিকটা আলো জ্বালিয়ে দিল এই অন্ধকারে', 'জায়গাটা অন্ধকার', 'এই মৌনতার আর অন্ধকারের মধ্যে ছড়িয়ে আছে', 'টিমটিমে আলোয় পিচ-রাস্তার চওড়া কালো চেহারাটা অদ্ভুত দেখায়', 'কলকাতার আকাশ আর এক রঙ ধরেছে। সূর্য আরও উজ্জ্বল, রোদ আরও উষ্ণ, পরিষ্কার ঝকঝকে আকাশের কিনারা ঘেঁষে দু-একটা লঘু মেঘ', (এই আলোর পিপাসী মনগুলি খাঁচায় বন্দি), 'ঢাকা বারান্দায় চোরা এক চিলতে আলোয় ওর মুখটা', 'সব যেন হুস করে কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে কোন অন্ধকারে', 'ব্ল্যাক আউটের আবছা-আলো-আভাস', 'আলো জ্বালাল মীনাক্ষী', 'নিবিয়ে দিয়ে আবার অন্য সুইচ টিপল। হালকা নীল আলো ফুটল ঘরে', 'মৃদু স্তিমিত-আভা এ আলোয় ঘরের মধ্যে কোথাও মন রাখার একটা জায়গা' (রতিকীড়ার প্রস্তুতি), 'নিস্তেজ নীলচে আলোয়', 'সুধা দেওয়ালের একটা ময়লা-রঙ ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে। মিটিমটে আলোয় তারিখগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না', 'হালকা অন্ধকার গ্যাঢ় হচ্ছে ক্রমশ',–উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। এই আলো অন্ধকার মানুষের অনুভূতি, উপলব্ধি, তাপ উত্তাপকে প্রকাশ করছে। আলোর বিভিন্ন রঙের প্রতিও বিমল কর মনোযোগী। মনকেমনকরা ভাবের বিভিন্ন শেড যেন সেই আলোর রঙে ফুটে ওঠে। সুধা যখন রঙের বিরাট অফিসে কাজ নেয় তখনও যেন বিমল কর লক্ষ করেন সুধার পরিবর্তনে সেই রঙের খেলা।

বিমল কর প্রায় প্রতিটি উপন্যাসে প্রকৃতিকে এইভাবে মাইক্রো টেকনিকে মেলে দেন। এমনকী বিদ্যুতের, পটচিত্রের রঙকেও তিনি প্রকৃতির পটভূমিকায় আঁকতে প্রয়াসী হন। তেমনই তাঁর উপন্যাসে আসে বিভিন্ন ঋতুর প্রভাব। জীবনানন্দের হেমন্ত ঋতুর কথা কার না মনে পড়বে? বিমল কর যেন একটু শীত ঋতুর অভ্যর্থনা করতে ভালবাসেন। খড়কুটো উপন্যাসে শীতের বর্ণনায় পাঠকের মনে হয় যেন একটা শাল টেনে পায়ের উপরে বিছিয়ে দিলে হয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই শীত পাঠককে একেবারে ঋতুর মাঝখানে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। কলকাতার বসন্তের এবং শীতের কখনও কখনও শিহরণ, বসন্তের খুশির হালকা মেজাজ আর, গ্রীষ্মের দাহ ও দীপ্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে 'দেওয়াল' উপন্যাসে। পূর্ণ অপূর্ণ উপন্যাসে আলো আঁধারের এই ক্ষণিক উদ্ভাস পাঠককে উপন্যাসের টানকে কখনও দ্রুত কখনও গতিচঞ্চল করে তোলে। কিন্তু ছোট ঘর আর ছোট মনের উপর অন্ধকারই যেন টানটান হয়ে চেপে বসে। সুধা সুচারুকে অন্ধকারে ঘন নিশ্বাসের মধ্যে পায়, আর উপন্যাসের শেষে আমরা পাই 'সুচারু আজ আবার হলুদ ম্লান আলোটুকু দেখতে পেল। মনে হল সুধা, এই মুহূর্তে ওই আলোটা আবার জ্বালিয়ে দিয়েছে।____যেন দুই ভগ্ন মূর্তি পরস্পরের মধ্যে গভীরতম যোগসূত্র অনুভব করছিল'।

আগুনের কথা

অরুণ মিত্র

আগুনকে বশ করার কোনো প্রশ্ন নেই! তার মুকুটকে সম্মান করা, তার শক্তির প্রশস্তি গাওয়া এক চমৎকার কর্তব্য। তাতে সৌন্দর্যবোধ আছে, গুণগ্রহণ আছে এবং সবচেয়ে গভীরভাবে আছে সহানুভূতি, সঠিক বলতে গেলে সমানুভূতি। এর ফলে আসল পরিপ্রেক্ষিতটা মানুষ আপনা থেকেই পেয়ে যায়, কিছুতেই এড়াতে পারে না। আমরা সকলে সমান ঃ ধনী ও নির্ধন, কুটীর ও রাজমহল, ঘাস আর বটগাছ, জন্তু আর মানুষ। মুখ পোড়ার আগে হনুমান এক চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিল কথাটা সংক্ষিপ্তসারে বোঝাতে। কিন্তু রাবণসম্প্রদায় আমাদের মতোই ধড়িবাজ। তারা আগুনের শত্রুতা করেছিল।

যাই হোক, মাটির সঙ্গে কোনোরকম সংযোগ যদি থাকে তাহলে ব্যাপারটা বুঝে ফেলতে দেরি হয় না। যেমন আমাদের পক্ষে। আমরা তো সারাজীবন আকাশে উড়ে বেড়াতে পারি না, মাটিতে নামতেই হয়। তখন অগ্নিদর্শনের পাঠ। আমরা সবাই, আমাদের দশদিকের ঘেরে সব কিছুই সমান। আমাদের যে যে আছে, যা যা আছে, সব যোগবিয়োগ করে হাতে থাকে ছাই। দামী ছাই।

এলোকেশী

শঙ্খ ঘোষ

তার আভরণ নেই, তার কোনো আবরণও নেই
আছে শুধু গুল্‌ফ-ছোঁয়া চুল
আর আছে ঘিরে নেওয়া, আর আছে ছিঁড়ে নেওয়া
সমস্ত মাস্তুল।

এসব তো থাকবেই, সেটা তত বড়ো কথা নয়
কথা হলো বেঁচে আছো কি না—
অনেক পায়ের রঙে এখনও কি ভরে নিতে পারো
নিকোনো আঙিনা?

পাঁজরে শিকড় আর হৃৎপিণ্ডে মরা ময়না নিয়ে
দাঁড়িয়ে রয়েছে বাঁকা মঠ।
এ-রকমই হতে থাকে, শতাব্দীর পরে শতাব্দী সে
জপেছে শপথ।

সেখানে হঠাৎ তুমি ছুঁয়েছ যে মুহূর্তের মুখ
সে তো তারও চেয়ে কিছু বেশি?
তাহলে তোমাকে আর কীভাবে ভোলাবে উলঙ্গিনী
সেই এলোকেশী?

অসুখে বিষাদে

দিব্যেন্দু পালিত

প্রত্যেক বুকেই আছে একটা-দুটো অচেনা অসুখ;
শরতে হলুদ রোদ যেমন হঠাৎ হয় মেঘে-মেঘে গাঢ় সম্ভাবনা
তেমনই আকস্মিক, ধরা পড়ে কিংবা পড়ে না—
তবু সঙ্গে সঙ্গে যায়, পাশে বসে ছায়ার মতন
কিংবা টিটকারি দেয় তোমার দীর্ঘশ্বাসে ছিটিয়ে বমন—
যতই চাও না কেন চেনাবে না শোক।

প্রত্যেক মুখেই আছে একটা-দুটো অদেখা বিষাদ;
যেন বা ত্বকের নীচে অন্য ত্বক, সমুদ্র শোষণ হলে
তারও নীচে লতাগুল্মময়
অদৃশ্য মাছের মতো, আছে কিংবা নেই এই স্বপ্ন ছুঁয়ে
জেগে ওঠে ঘুমে—
কখনও দেয় না ধরা, শুধু সম্ভাবনা থেকে মুখ তুলে
হঠাৎ চিনিয়ে দেয় অন্ধকার চোখ।

কোনওদিন

আশিস সান্যাল

সারাদিন কেটেছে বিফল।
সন্ধ্যায় অবসাদে
ঝরে দেখি অসহায় দু'চোখের জল।

কোনখানে কেশবতী
বসে আছো
পাতালপুরীর কোন্ গহন আঁধারে?
এখনও হৃদয় চায়
ফিরে যেতে
ভোরের শিশিরে ভিজে সেই অভিসারে।

অথচ পারি না যেতে।
বুকে বড় ভয়—
যা কিছু হারিয়ে যায়
কোনওদিন সেই সব
কোছে পেতে অনুগত দেয় না সময়।

প্রিয় বন্ধুবিয়োগ

বাসুদেব দেব

প্রিয় বন্ধুর শোক লেগে আছে সর্বাঙ্গে
নতুন সম্পর্ক সংস্কার আর আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে
স্বয়ংক্রিয় জীবন এখন আন্তর্জাতিক
পলকা সেতুর মতো দীর্ঘ নিশ্বাসের মধ্যে
কাঁপতে থাকে আরেক জীবন, আরেক জীবন আমাদের

কে কাকে মনে রাখে এখন? আনুষ্ঠানিক সৌজন্য—
তাড়া খাওয়া পশুর কোনও চারণক্ষেত্র নেই আর
উন্মুক্ত মশান, মরা নদী, আর কোনও আড়াল নেই
কেবল ভোগ কেবলই উচ্ছিষ্ট—

আমি এখন বিজ্ঞাপনের প্রতিটি ছবির ভঙ্গি
প্রতিটি শব্দের টান লক্ষ করি
আরেক রকম জীবন আমাদের সাবানের ফেনায়
রঙিন হালকা, উড়ে যাচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রের ওপর দিয়ে

প্রিয় বন্ধুর শোক শীতশেষের আলোয়ানের মতো
আবার আমরা তুলে রাখব তোরঙ্গে
আমাদের আরেক জীবন

আমি এবার উঠি

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

আজকাল যে কোনও কথাই সহসা গুম-চৌচির চিৎকার হয়ে যায়।
হাঁটা-পথ যেন বেআইনি, যে কোনও দিকে গেলেই রাগী চোখের
হুমকি,
দৌড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে সবখান থেকে সরে লাথি-খাওয়া কুকুরের
অন্ধ আনাচ-কানাচ খোঁজা,
সামনা-সামনি হলেই কেউ কেউ হঠাৎ অন্ধকার, দাগী খুনির মতো
দাঁড়িয়ে।

আজকাল সবকিছুই উপুড়-করা আকাশের মতো উল্টো হয়ে গেছে,
হেসে এগিয়ে এসে সোজাসুজি কাকেও ছোঁয়া যাবে না, হাড়-গোড় ভেঙে
বাঁকতে হবে।
গাছের ডালের মতো হাত বাড়িয়ে আদর করে কারও স্পষ্ট চিবুক
ছুঁলেও
কোনওক্রমেই তার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে তাকে দেখা যাবে না।

হায়, আমরা আর কতকাল কতকাল ঘুরে ঘুরে অবশেষে সময়ের
অসম্পূর্ণ ছেদের মধ্যে পড়লাম।
তোমরা কি পালিয়ে-বেড়িয়ে শেষপর্যন্ত পাথর-বাছাকেই
কোলে টেনে নিলে,
তোমরা তাহলে জেনে শুনেই আজকালের কালের মধ্যে পড়েছ।
বেলা গড়াল। তোমরা থাক। আমি এবার উঠি, আমায়
আজকাল পেরুতে হবে।

খেলা

অরুণ মুখোপাধ্যায়

একে কি বলব, ছাউনি না তাঁবু—
যদি বলি যাদুঘর!
উনুন জ্বলছে, রুটি সেঁকা হবে
হয় যদি তারপর____

তারপর হবে ভাগাভাগি খেলা
খেলা নিয়মিত নয়
সবঘাটে আছে লেখা ত্রিভুবন
পাবে কিছু কড়িপয়!

একে কি বলব - পান্ধি না পাল
শুধু যদি বলি, চল্
নাচতে নাচতে পায়ের কাছেই
সেই এসে যাবে জল!

আসে যদি জল, ক্ষতি কিছু নেই
সবই রয়েছে তোলা—
ছোট্ট একটা বাঁধন কাটলে
বিশাল রাস্তা খোলা।

দেখি কী রয়েছে, খোল দশ হাত
তাই বলো, শুধু চড়া____
ক্ষতি নেই তাতে, থাকলেই হল
নদীজল বুক ভরা।

একে কি বলব, এই ভাঁটি ফুল
বলি যদি সেও খেলা,
খেলতে খেলতে বিভূতিভূষণ
হতে পারি এক বেলা!

তাই

প্রবীরকুমার রায়

প্রত্যক্ষ আলো বলে কিছু নেই
ফিন্‌কি দিয়ে তাই ওঠে রক্ত
তাই হাসে হো হো সময়
আর, শেষমেশ খুচিয়ে তোলে অন্ধকার॥

যা ছিল চুম্বন সূর্যের
বদলে হয়েছে তাই আজ
প্রত্যক্ষের দগ্ধ পোড়া কাঠ

ঠোক্কর খায় তাই যেন হাওয়া
আর, সেঁদিয়ে যায় তাই যা অনায়াস
শিকড়বিহীন পাতালে
দীর্ঘশ্বাসের হাহা রবে

তাই ফোটে কুঁড়ি
তাই ফাটে খোসা বীজের
আর, তাই বসন্ত আসে ঘুরে ফিরে,
ক্রূর সময়েও_____॥

'কন্যা, তুমি মরো!' - সপ্ত দুহিতা কথা

সুমিতা চক্রবর্তী

মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' আমাদের খুবই পরিচিত। আমরা একথাও শুনে আসছি বহুকাল থেকে যে, কর্ণেল জেমস্ টড রচিত 'অ্যানালস্ অ্যান্ড অ্যান্টিকুইটিজ অভ রাজস্থান' (প্রথম প্রকাশ ১৮২৯) গ্রন্থের প্রথম খণ্ড থেকেই মধুসূদন এই নাটকের কেন্দ্রীয় নারী-চরিত্র কৃষ্ণকুমারী-র কাহিনীটি পেয়েছিলেন। 'শুনে আসছি' কথাটা অবশ্য পুরোপুরি ঠিক হল না। মধুসূদন নিজেই বারবার চিঠিপত্রে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'—এর এই উৎসের স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। সে-সব চিঠিপত্রও বাংলা সাহিত্যের অনুরাগীদের কাছে বহুপঠিত। তবু এখানে দুটি পত্রের অংশ উদ্ধৃত হল।—

১। ".....I have been dramatizing, writing a regular tragedy in — prose! The plot is taken from Tod, Vol.1., P.461. I suppose you are well acquainted with the story of the unhappy princess Kissen Kumary. There is one more Act to be written —viz. the fifth."
[রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠি। তারিখবিহীন। তবে সুখ্যাত অভিনেতা ও বন্ধু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা মধুসূদনের অপর একটি চিঠিতে পাওয়া যায় — "Kissen Kumari was finished two days ago. Begun 6th August, finished 7th September—....."। এখান থেকে অনুমান করা যায় যে রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠির তারিখ হবে ১৮৬০-এর সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের যে-কোনও দিন।]

২। "Last Sunday, I submitted another 'Synopsis' of a Drama on an entirely Hindu Subject. I dare say you have already seen it. If so, is it not beautiful? For two nights, I sat up for hours pouring over the tremendous pages of Tod and about I A.M. last Saturday, the Muses smiled! As a true realizer of the Dramatist's conceptions, you ought to be quite in love with কৃষ্ণকুমারী, as I am. Lord! What a romantic Tragedy it will make"!
[কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি। তারিখবিহীন। পত্রে উল্লেখিত প্রসঙ্গ থেকে অনুমান করা যায় ১৮৬০-এর অগাস্ট মাসের দুই-তিন তারিখ নাগাদ লেখা হয়েছিল এই চিঠি।

মধুসূদন—গবেষকেরা জানিয়েছেন যে সুলতানা রিজিয়ার চরিত্র অবলম্বনে একটি নাটক লেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন মধুসূদন। কিন্তু হিন্দুত্ব-গৌরবের সেই জাগরণের যুগে তেজস্বিনী মুসলমান নারীকে কেন্দ্র করে নাটক রচনার প্রস্তাবে উৎসাহ দেখালেন না বেলগাছিয়া থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ। তখন বিশিষ্ট অভিনেতা এবং মধুসূদনের বন্ধু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁকে নাট্যবিষয়ের সন্ধানে রাজপুতানার ইতিহাস পড়তে বলেন। উদ্দেশ্য ছিল স্পষ্ট। রাজপুতদের বীরত্বকাহিনী সেই হিন্দুত্ববাদের পুনরুজ্জীবন ও গর্ববোধের সমকালে বিষয় হিসাবে বাঙালির অতীব মনোমতো ছিল। বেলগাছিয়া নাট্যশালার স্থপয়িতা, পাইকপাড়ার রাজ-ভ্রাতৃদ্বয় প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ এবং তাঁদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, নাট্যরসিক যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পছন্দ হবে এই বিষয় —এমনই ছিল কেশবচন্দ্রের প্রত্যাশা। ওঁর প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়নি। 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' লিখিত, প্রকাশিত ও অভিনীত হয়। মধুসূদন কেশবচন্দ্রকে নাটকটি উৎসর্গ করে কেশবচন্দ্রের সহায়তার স্বীকৃতি দেন। রাজপুতদের সম্পর্কে বাঙালির এই মুগ্ধতার একটি প্রধান উৎস

ছিল টড-এর লিখিত রাজস্থান-কাহিনীমালা। মধুসূদন সেটিই পড়লেন এবং পেয়ে গেলেন কৃষ্ণকুমারী-কে। এক হতভাগ্য কন্যা যাকে মরতে হয়েছিল তার পিতৃবর্ত্তে ইচ্ছায় —পিতৃর রাজ্যের নিরাপত্তা অক্ষুন্ন রাখবার জন্য।

মধুসূদন টড-এর কাহিনী থেকে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'-এর ঠিক কতটা উপাদান নিয়েছিলেন তা নিয়ে মতভেদ আছে। সুকুমার সেনের মতে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'-এর কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাসের কাহিনীর সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে কথাটি ঠিক। টড-এর কাহিনী অনুসারে মারওয়াড়-এর রাজা ভীমসিংহের সঙ্গে মেবারের রাণা ভীমসিংহের কন্যা কৃষ্ণকুমারীর বিবাহের বাগদান হয়েছিল। কিন্তু বিবাহের আগেই মারওয়াড়-রাজ ভীমসিংহের মৃত্যু হওয়ায় রাজা হলেন মানসিংহ। ভীমসিংহের বিধবা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র ধনকুল সিংহকে সামনে রেখে মানসিংহকে সিংহাসনচ্যুত করবার ষড়যন্ত্র করা হয়। এই ষড়যন্ত্রে র নায়ক সওয়াই সিংহ একদিকে জয়পুরের রাজা জগৎ সিংহকে প্ররোচিত করেন কৃষ্ণকুমারীকে বিবাহ করবার জন্য প্রস্তাব পাঠাতে, অন্য দিকে মানসিংহকে বোঝান যে মারওয়াড় রাজের বাগদত্তা নারীকে অপর কেউ বিবাহ করলে তা হবে মারওয়াড়-এর অসম্মান। মানসিংহ ও জগৎ সিংহ উভয়েই, অতএব কৃষ্ণকুমারীর পাণিপ্রার্থী হন এবং যুদ্ধে লিপ্ত হন। ধনকুল সিংহ থাকেন জগৎ সিংহের পক্ষে। এই যুদ্ধে মানসিংহ প্রথমে পরাস্ত হন কিন্তু শেষের দিকে সওয়াই সিংহও হীনবল হয়ে পড়েন। এই সংঘর্ষের মধ্যপর্বে, টড-এর বর্ণনা অনুসারে, আমীর খাঁ নামে এক নবাব রাজা জগৎ সিংহের পক্ষ ত্যাগ করে মানসিংহের পক্ষে চলে যায়। অতীব কূচক্রী এই আমীর খাঁ-ই মেবার-এর দুর্বল রাজা ও কৃষ্ণকুমারীর পিতা অপর ভীমসিংহকে চাপ দেয় মানসিংহকে কন্যাদান করতে অথবা কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যু ঘটিয়ে বিরোধের অবসান ঘটাতে। রাজনৈতিক কারণে কন্যার বিবাহ দেওয়া এবং রাজনৈতিক কারণেই কন্যার মৃত্যু ঘটানো রাজপুতদের মধ্যে কোনও নতুন ব্যাপার নয়। ভীমসিংহ দ্বিতীয় প্রস্তাবটিই গ্রহণ করেন এবং পিতাকে বিপন্মুক্ত করবার প্রয়োজনে কৃষ্ণকুমারীকে বিষপান করতে হয়।

ইতিহাস—কাহিনীর এই কূটনৈতিক জটিলতা কিন্তু সত্যিই 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'-এ দেখা যায় না। কৃষ্ণকুমারীর ট্র্যাজেডি ঘটেছে এক বুদ্ধিমতী তরুণীর সক্রিয়তায়। সেই তরুণী, মদনিকা, সক্রিয় হয়েছে জয়পুর-রাজ জগৎ সিংহের রক্ষিতা ও প্রণয়িনী বিলাসবতীর সাহায্যার্থে। জগৎ সিংহ কৃষ্ণকুমারীকে বিবাহ করলে বিলাসবতী তার প্রেম থেকে বঞ্চিত হবে এই আশঙ্কায় মদনিকাই মরুদেশের (মারওয়াড়) রাজাকে কৃষ্ণকুমারীর নাম করে মিথ্যা প্রেমপত্র পাঠিয়েছে। সেই চিঠিতে লেখা ছিল — মরুদেশের রাজার প্রতি প্রণয়শালিনী কৃষ্ণকুমারীর আত্মনিবেদন ও প্রার্থনার কথা। মদনিকা-ই এক সুন্দর পুরুষের ছবি দেখিয়ে কৃষ্ণকুমারীর চিত্তে অনুরাগ সঞ্চারের চেষ্টা করেছে। মধুসূদনের নাটকে রাজপুত রাজাদের অন্তর্বিরোধের অন্তঃস্রোত অনুভূত হয় না। যদিও তার উল্লেখ কোথাও কোথাও আছে, তাতে কোনও বাতাবরণ সৃষ্ট হয়নি। 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'-এ মরুদেশ ও জয়পুর-এর দুই রাজা কৃষ্ণকুমারীর আকর্ষণেই তাকে বিবাহ করতে চেয়েছে, ভিন্নতর কোনও শত্রুতার কারণে নয়। এজন্যই মুনীর চৌধুরী মন্তব্য করেছেন —"আমরাও মনে করি, মাইকেল টড পড়ে টডের ভাবে মজে, টডের তথ্য নাটকে রূপান্তরিত করায় উৎসাহী ছিলেন না"।[১]

মুনীর চৌধুরীর অভিমত সর্বাংশেই যে গ্রহণ করতে পারি আমরা তা-ও নয়। মধুসূদন কিন্তু টড-এর গ্রন্থের প্রসঙ্গ আরও অনেকবারই উল্লেখ করেছেন তাঁর পত্রাবলীতে। কেশবচন্দ্রকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন যে, বিলাসবতী বিষ্ণুঠা ঐতিহাসিক চরিত্র, টড তাঁর উল্লেখ করেছেন 'কর্পূর-সুরভি' (Essence of Camphor) বলে (তারিখবিহীন পত্র তবে নাটকটি রচনাকালের মধ্যেই লেখা); আর একটি চিঠিতে কেশবচন্দ্রকে লিখেছেন — "I have tried to represent Juggut Sing as I find him in History, a somewhat silly and voluptuous fellow; Bheem Sing as a sad, serious man." (১ সেপ্টেম্বর, ১৮৬০-এ লিখিত পত্র)। ইতিহাসের কৃষ্ণকুমারী যদিও বিষপান করেছিল, আর নাটকের কৃষ্ণকুমারী আত্মহত্যা করেছিল খড়্গাঘাতে, তবু এর মধ্যেই মধুসূদন একটি দৃশ্য দেখিয়েছেন যেটি ইতিহাস থেকেই তুলে নেওয়া। প্রসঙ্গত বলা ভাল, টড-এর গ্রন্থ ঠিক যথাযথ ইতিহাস নয়, অনেকটাই কিংবদন্তি ও লোকশ্রুতির সমাহার। তবু উপন্যাসের মতো সুখপাঠ্য টড-এর এই রাজস্থান-কাহিনীকে মধুসূদন সহ সেই কালের শিক্ষিত বাঙালি ইতিহাস বলেই গ্রহণ করেছিলেন।

যে ঘটনাটির কথা বলছিলাম তা এই — প্রথমবার বিষ পান করেও ইতিহাসের কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যু হল না। তখন ভীম সিংহের জ্ঞাতি ভাই দৌলৎ সিংহকে ছুরিকাঘাতে কৃষ্ণকুমারীকে বধ করবার নির্দেশ দেওয়া হয়। দৌলৎ সিংহ সে নির্দেশ মানতে অস্বীকার করেন। ভীম সিংহের অপর এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা জওয়ান দাস — যিনি ছিলেন বিবাহ-বন্ধন-বহির্ভূত সন্তান (টড লিখেছেন 'ন্যাচারাল সন') — এর পরে কৃষ্ণকুমারী হত্যার ভার নেন। কিন্তু কৃষ্ণকুমারীর তরুণ লাবণ্যরাশি-দীপিত রূপের সামনে দাঁড়িয়ে জওয়ান দাসের হাত থেকেও খসে পড়ে ছুরি। তখন অগত্যা আবার বিষ প্রস্তুত করা হয় রাজকন্যার জন্য। নাটকের কৃষ্ণকুমারীর সামনে দাঁড়িয়ে রাজভ্রাতা বলেন্দ্র সিংহের 'অসি ভূতলে নিক্ষেপ'-এর একটি ঐতিহাসিক মূল আমরা এভাবে পেয়ে যাই। মুনীর চৌধুরী আরও বলেছেন যে, লেখকের পত্র সাক্ষ্য সব সময়ে অবশ্য মান্য মনে করা ঠিক নয়।[২] তাঁর এ মন্তব্যও

খানিকটা স্বীকার্য। কিন্তু সুস্পষ্ট কোনও বিরোধী প্রমাণ না পেলে পত্রসাক্ষ্য সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করবার পক্ষেও জোর পাওয়া যায় না।

আসলে মধুসূদন ইতিহাসের ঘটনাবর্ত সত্যিই তত্টা গ্রহণ করেননি এই নাটকে। রোমান্টিক ট্র্যাজেডি হয়ে ওঠার উপযুক্ত নাট্য-ঘটনা খানিকটা নিজেই সৃষ্টি করে নিয়েছেন। আর সেই সৃষ্টি কল্পনা অনুসরণ করেছে শেক্সপিয়রীয় ধরণের অন্তঃপ্লট নির্মাণের কৌশল। তরুণ-বেশধারী মদনিকা তো একেবারে শেক্সপিয়র-এর কমেডি থেকে তুলে আনা একটি চরিত্র। কিন্তু মধুসূদন প্রধান চরিত্রগুলিকে (ধনদাস, মদনিকা ছাড়া) গ্রহণ করেছেন অনেকটা টড-এর গ্রন্থ থেকেই। তার চেয়েও বড় কথা মধুসূদন মূলত আকৃষ্ট হয়েছিলেন কৃষ্ণকুমারীর চরিত্র ও তার শোচনীয় পরিণামের প্রতি। পুণ্যশ্লোক রূপমন্বী এক কিশোরীকে পিতার ইচ্ছা পূরণের জন্য এবং পিতৃরাজ্য নিরাপদ করবার জন্য প্রাণ দিতে হল - এই রোমান্টিক ট্র্যাজেডি-ই তাঁকে বিচলিত ও বিলোড়িত করেছিল প্রগাঢ়ভাবে।

আমরা লক্ষ করি 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' সম্পর্কে যত কথা তিনি চিঠিতে লিখেছেন তার অনেকগুলোই সরাসরি এই ভাগ্য-বিড়ম্বিত রাজকুমারী সম্পর্কে উক্ত—

"I suppose you are well acquainted with the story of the unhappy princess Kissen Kumari."
(রাজনারায়ণকে লেখা)

"I have finished my Tragedy on the death of the Rajput Princess Kissen Kumari."
(রাজনারায়ণকে লেখা)

".....You ought to be quite in love with কৃষ্ণকুমারী, as I am."
(কেশবচন্দ্রকে লেখা)

"Poor Kissen Kumari will die."
(কেশবচন্দ্রকে লেখা)

টড-এর গ্রন্থে কৃষ্ণকুমারী সম্পর্কেও ওই একই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। টড খুব বড় ইতিহাসবিদ ছিলেন না কিন্তু প্রগাঢ় সাহিত্যানুরাগী এক বিদগ্ধ মানুষ ছিলেন তিনি। রোমান্টিক কবির মন্ত্রেই ছিলেন আবেগপ্রবণ। যে-ভাষায় তিনি কৃষ্ণকুমারীকে মূর্তত দিয়েছিলেন তা প্রায় কবিরই ভাষা। সেই সঙ্গেই তিনি বিশ্বসাহিত্য সম্ভার থেকে তুলে এনেছেন আরও কয়েকটি কন্যাকে —যারা সকলেই মৃত্যু বরণ করেছিল বা করতে চলেছিল তাদের পিতার হাতে।

আবেগ-স্পন্দিত সাহিত্যিক গদ্যে লেখা টড-এর রচনার সেই অংশটি আমরা এখানে উদ্ধার করছি।—

"When the Roman father pierced the bosom of the dishonoured Virginia appeared virtue applauded the deed. When Iphigenia was led to the sacrifincial alter, the salvation of her country yielded a noble consolation. The votive victim of Jephthah's—success had the triumph of a father's fame to sustain her resignation, and in the meekness of her sufferings we have the best parallel to the sacrifice of the lovely Krishna :"[৩]

টড তাঁর গ্রন্থেই আরও তিন নারীর উল্লেখ করেছেন যাদের নিহন ঘটেছিল পিতার হাতে অথবা পিতার নির্দেশে। ভার্জিনিয়া, ইফিগেনেইয়া এবং 'ভিক্টিম অভ্ জেপথাহ্'। কেবল তাই নয়, এই অংশের সঙ্গে টড যোগ করেছিলেন একটি পাদটীকা। সেই পাদটীকায় তিনি লিখেছেন —কৃষ্ণকুমারীর কাহিনী জানার অল্পদিন পরে ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে ক্যাথিড্রল গির্জায় তিনি হ্যান্ডেল-এর রচিত 'জেপথাহ্' (Jephthah) নামক ওপেরাটি দেখেছিলেন। সেই ওপেরায় জেপথাহ্-র কন্যার করুণ গান তাঁর মর্ম বিদ্ধ করেছিল। অল্পকাল পরে ফরাসি নাট্যকার রাসিন (Racine)-এর লিখিত ট্র্যাজেডি 'ইফিজেনি'ও (Iphigenie) – তিনি দেখেছিলেন। এই দুটি মঞ্চ শিল্পই তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছিল কৃষ্ণকুমারীর ট্র্যাজেডির কথা।

মধুসূদন যখন টড-এর গ্রন্থ পড়েছিলেন তখন টড-এর এইসব উক্তিও অবশ্যই তাঁর দৃষ্টিপথে এসেছিল। উল্লেখিত শিল্পকর্মগুলি সবই তিনি পড়েছিলেন কিনা তা নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠা করা না গেলেও অনুমান করা যায় যে ইউরিপিদেস-এর 'ইফিগেনেইয়া হে এন্ আউলিদি' (ইংরেজি অনুবাদ 'Ihpigeneia at Aulis' বাংলা অনুবাদ 'অলিস-এ ইফিগেনেইয়া') অবশ্যই পঠিত ছিল তাঁর। ফরাসি নাট্যকার জাঁ রাসিন (Jean Racine, ১৬৩৯-১৬৯৯) গ্রীক নাটক অবলম্বনেই তাঁর 'ইফিজেনি' (Iphigenie, ১৬৭৪) রচনা করেছিলেন। অবশ্য চরিত্র-পরিকল্পনায়, কোনও কোনও চরিত্র ও ঘটনার উদ্ভাবনে তিনি অভিনবত্ব এনেছেন। চরিত্রায়ণের ভরসায় (শেড) অনেকক্ষেত্রেই ভিন্ন হয়ে গেছে রাসিন-এর নাটকে।

টড-এর লেখায় উল্লেখিত ভার্জিনিয়া প্রাচীন রোমক ইতিহাসে উল্লেখিত ভার্জিনিয়ুস নামে এক অভিজাত ভূম্যধিকারীর কন্যা। পিতার হাতে তার মৃত্যু হয়েছিল। খ্রীস্টপূর্ব ৪৪৯ অব্দে ঘটেছিল বলে কথিত এই কাহিনী অবলম্বনে একটি নাটক লেখেন সপ্তদশ শতকের খ্যাতনামা ইংরেজ নাট্যকার জন ওয়েবস্টার (১৫৭৫? - ১৬২৪?)। তাঁর নাটকের নাম 'আপ্পিয়ুস ও ভার্জিনিয়া' (Appius and Virginia –রচনা আনুমানিক ১৬২০-২১ খ্রিস্টাব্দে)। ইংরেজিতে এলিজাবেথীয় যুগের একটি ট্র্যাজেডি – সুপরিচিত নাট্যকারের – মধুসূদন পড়েননি তা ভাবা যায়

না। যদিও মধুসূদন তাঁর পত্রাবলীতে শেক্সপিয়র-এর নামই করেছেন বারবার, ওয়েবস্টার-এর নয়।

ভার্জিনিয়া-র কাহিনী অবলম্বনে বিশ্বসাহিত্যে আছে আরও একটি বিখ্যাত ট্র্যাজেডি। অসামান্য প্রতিভাশালী জার্মান সাহিত্যিক ও শিল্পতত্ত্ববিদ গটহোল্ড এফরাইম লেসিং (Gotthold Ephraim Lessing, ১৭২৯-১৭৮১) ১৭৫৭ সালে লেখেন 'এমিলিয়া গ্যালোটি' (Emilia Galothi) নামে একটি বিয়োগান্ত নাটক যা জার্মান ভাষার প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি বলে স্বীকৃত। লেসিং চরিত্রগুলির নাম বদলে দিয়েছিলেন, নাট্যাংশও অনেক সংযোজন ঘটিয়েছিলেন; তাঁর চরিত্রচিত্রণ শিল্পীর নিজস্বতারও স্বাক্ষর বহন করে। কিন্তু মূল কাহিনীর আধার ছিল ভার্জিনিয়া -সংক্রান্ত প্রাচীন রোমক কথাবৃত্ত — তাতে কোনও সংশয় নেই।

তাহলে আমরা টড-এর ইতিহাসে বর্ণিত কৃষ্ণকুমারীর চরিত্র স্বরূপ ভাষা-শিল্পের রূপবন্ধে আরও সত্ত্ব কন্যার চরিত্র পাচ্ছি যারা পিতার আদেশে, পিতার হস্তে অথবা পিতার ইচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করেছিল। এই সাতজন হল — বইবলে বর্ণিত জেপথাহের কন্যা;—এই কন্যার কোনও নাম দেওয়া নেই। হ্যান্ডেল-এর ওপেরায় রূপায়িত জেপথাহর কন্যা; ইউরিপিদেস-এর 'ইফিগেনেইয়া'; রাসিন-এর 'ইফিজিনিয়া'; ওয়েবস্টার-এর 'ভার্জিনিয়া'; লেসিং-এর নায়িকা 'এমিলিয়া' এবং মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী'। 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'-এর কিছুকাল পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'সরোজিনী' নাটকেও এমনই আর এক কন্যার শোকান্তক কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু 'সরোজিনী'-কে আমরা আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করছি না। তার প্রধান কারণ এই—চিতোর রাজদুহিতা সরোজিনীর মৃত্যু শেষ পর্যন্ত তার পিতা লক্ষ্মণ সিংহের ইচ্ছায় ও নির্দেশে ঘটতে পারেনি। তার মৃত্যু হল আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণের ফলে রাজপুত নারীদের সমবেত জহরব্রতে অর্থাৎ সকলের সঙ্গে আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে। দ্বিতীয় কারণ—'সরোজিনী'-র চরিত্র রূপায়নে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রায় সর্বতোভাবেই রাসিন-এর ইফিজেনিয়ার ছাঁচ ব্যবহার করেছেন। আবার শেষের দিকে, চিতোরের ইতিহাস এবং হিন্দুমেলার স্বদেশিকতা-যুগের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করবার জন্য ইফিজেনিয়ার আত্মাহুতির সমান্তরাল বহু অংশ তাঁকে বর্জন করতে হয়েছে। ফলে চরিত্রটির নিজস্ব কোনও সত্তা ঠিক মতো গড়ে ওঠেনি।

মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারীকে সামনে রেখে আমরা অপর নায়িকাদের চরিত্রের সঙ্গে মধুসূদনের সৃষ্ট নায়িকার কিছুটা তুলনা করবার চেষ্টা করব।

প্রথম তুলনাটি করা যাক—টড-এর বর্ণনার কৃষ্ণকুমারী আর মধুসূদনের কল্পনার কৃষ্ণকুমারীর মধ্যে। "Krishna Kumwari Bai, the 'Virgin Princess Krishna' was in her sixteenth year" লিখেছেন টড—"....she added beauty of face and person to an engaging demeanour, and was justly proclaimed the 'Flower of Rajasthan'" মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারীও জননী এবং উদয়পুরের রাণা ভীমসিংহ-পত্নী অহল্যার উক্তিতে—"কৃষ্ণা যে এই পোনেরতে পা দিয়েছে!" (২য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক)। সে অসামান্য সুন্দরী এবং সুশীলা। রানীর কথায় সে পদ্মফুলের মতো—"নাথ, তোমার কি এই ইচ্ছা যে কোন পাষণ্ড যবন এসে এই কমলটিকে এ রাজসরোবর থেকে তুলে নে যায়"(২/১); "মহারাজ, দিল্লীর অধিপতি কিংবা অন্য কোন যবনরাজ, জনরবস্বরূপ বায়ুসহযোগে এ পদ্মের সৌরভ পেলে কি আর রক্ষা থাকবে?"(২/১)। রাজঅন্তঃপুরে যাতায়াত করেন এমন এক উদয়পুর-রাজপরিবারের শুভাকাঙ্খিনী তপস্বিনীর কথায় কৃষ্ণকুমারী স্বর্ণপদ্ম-সদৃশ —"মহিষি, যখন আমি উধর্ষ্বায় যাই, তখন আপনার এ কনকপদ্মটি মুকুল মাত্র ছিল।"(২/১); তাঁরই তুলনায় কৃষ্ণকুমারীর গান 'সুরসুন্দরী'-র কণ্ঠস্বরের সমান —"... আমার জ্ঞান ছিল যে সুরসুন্দরী ভিন্ন এস্বর অন্যের হয় না।"(২/১)। কৃষ্ণকুমারীর মতেই মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারীও রূপে ও ব্যক্তিত্বে অসামান্যা। রানীর উক্তি "ওর রূপলাবণ্য, সচ্চরিত্র, আর বিদ্যাবুদ্ধি দেখে, আমার মনে যে কত ভাব উদয় হয়, তা বলতে পারিনে।" (২/১)। কৃষ্ণকুমারীর রূপের খ্যাতি উদয়পুর ছাড়িয়েও বিস্তৃত হয়েছিল। জয়পুর-রাজ জয়সিংহ তার রূপের খ্যাতি শুনেছিলেন। জয়পুরের মন্ত্রী কৃষ্ণকুমারীর সৌন্দর্যর প্রসঙ্গে বলেছেন — "লোকে বলে যে যাজ্ঞসেনী স্বয়ং পুনরায় ভূমণ্ডলে অবতীর্ণা হয়েছেন!"(১/১)। দ্রৌপদীর সঙ্গে এই তুলনার ক্ষীণ পূর্বাভাস হয়ত টড-এর উক্তিতে ছিল। কৃষ্ণকুমারীর সঙ্গে গ্রীক মহাকাব্যের হেলেনের তুলনা করে টড লিখেছেন—".....who like Helen of old, involved in destruction her own and the rival Houses." হেলেন স্বেচ্ছায় স্বামীকে ত্যাগ করে ট্রয়-রাজপুত্র প্যারিস-এর সঙ্গে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর স্বভাবের সঙ্গে কৃষ্ণকুমারীর কোনও তুলনা চলে না। কিন্তু অসামান্য রূপের খ্যাতি ছিল হেলেনের এবং তাঁরই জন্য ট্রয় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল, বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল গ্রীসের। হেলেন ও যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদীর মধ্যে এই তুলনা চলতে পারে। রূপের ক্ষেত্রে ছাড়াও দ্রৌপদী সম্পূর্ণত না হলেও কিছুটা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কারণ হয়ে উঠেছিলেন। সেই সঙ্গে পাণ্ডবদেরও বহু ক্ষতির মূলে তাঁরও কিছুটা ভূমিকা ছিল—যদিও মূলত অনিচ্ছাকৃত। স্বভাবের মিল হেলেনের সঙ্গে কৃষ্ণকুমারীর একেবারেই ছিল না, দ্রৌপদীর প্রবল ব্যক্তিত্ব গরিমার সঙ্গেও কৃষ্ণকুমারীর কৈশোর-সারল্য তুলনীয় নয়। এ তুলনা কেবল রূপেরই।

টড-এর বর্ণিত কাহিনী ও মধুসূদনের নাটকের কাহিনীর মিল এবং অমিল আগে উল্লেখিত হয়েছে। এখানে আমরা দুই কিশোরীর ব্যক্তিত্বের পার্থক্যটি নির্দেশ করব।

পিতা কর্তৃক প্রাণবধের নির্দেশ শুনে টড-এর কৃষ্ণকুমারী কোনও চাঞ্চল্য, অস্থিরতা বা শোক ব্যক্ত করেনি। পর পর দুবার বিনা প্রতিবাদে বিষের পেয়ালা মুখে তুলেছিল সে কিন্তু তাতে মৃত্যু হয়নি তার। ছুরিকাঘাতে তাকে বধ করতে অপারগ হয়েছিলেন তার পিতৃব্য জওয়ান দাস। তারপর বিশেষভাবে তীব্র বিষ দিয়ে প্রস্তুত হল পানীয়। পানপাত্র নিয়ে আসা হল তার কাছে। টড লিখেছেন —"As the messenger presented it in the name of her father, she bowed and drank it, sending up a prayer for his life and prosperity."

মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারীও ইতিহাসের কৃষ্ণকুমারীর মতেই মৃত্যুর সামনে ছিল সম্পূর্ণ নির্ভয়। মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ ছিল না কারোরই। অথবা সত্যিই কি ছিল না? টড-এর কৃষ্ণকুমারীর সংলাপে কিন্তু দু'একটি মর্মান্তিক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আছে। জননীকে শোকবিহ্বল দেখে সে বলেছে "দুঃখময় জীবনের সমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে, এতে কষ্ট পাচ্ছ কেন মা? মরতে আমি ভয় পাই না। আমি কি তোমার মেয়ে নই?" এর পরেই তার কথায় প্রদাহ-জ্বলকিত হয়ে উঠেছে সেই আগুনের কণাগুলি - "আমরা তো জন্মমৃত্যুর থেকেই বলিপ্রদত্ত হবার জন্য চিহ্নিত হয়ে থাকি; পৃথিবী থেকে আমাদের সরিয়ে দেওয়া হবে বলেই আমরা পৃথিবীতে আসি —এর অন্যথা হয় খুবই কম। আমার পিতাকে ধনাবাদ কারণ — আমি এতদিন ধরে বেঁচেছিলাম!"- এই কথা বলে সে বিষের পাত্র গ্রহণ করল হাসিমুখে, প্রার্থনা করল যেন — শেষ হয় এই পুনরাবৃত্ত হননপর্ব এবং পান করল সেই পাত্রভরা বিষ। টড-এর ভাষায় কৃষ্ণকুমারীর উক্তিটি দেখি —"Why afflict yourself, my mother, at this shortening of the sorrows of life? I fear not to die. Am I not your daughter?..... We are marked out for sacrifice from our birth; we scarcely enter the world but to be sent out again; let me thank my father that I have lived so long!"

টড-এর কৃষ্ণকুমারীর এই মৃত্যু-ভাষণে কিন্তু চাপা এক ক্ষোভের সুর শোনা যায় পিতার সম্পর্কে যতটা —তার চেয়েও বেশি সমগ্র রাজপুত সমাজ সম্পর্কেই। রাজপুতদের দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতপ্রিয়, নির্ভীক যোদ্ধার জাতি বলেই ভাবতে চিরকাল অভ্যস্ত হয়েছি আমরা। খানিকটা টড-এর রাজপুত-প্রীতি-নিষিক্ত গ্রন্থটি বাঙালিকে চালিত করেছিল। তার চেয়েও বড় ছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পারিপার্শ্বিকের প্রভাব। স্বদেশিকতাবোধের উন্মেষলগ্ন আর হিন্দুত্ব-গৌরব সচেতনতা মিশে গিয়েছিল হিন্দু বাঙালি-মানসে। ব্রিটিশ-বিরুদ্ধ-চেতনার উৎসারণ ঘটেছিল কাব্যে ও নাটকে রাজপুতদের পাঠান ও মুঘল-বিরোধিতার প্রসঙ্গ রূপায়নে। মুসলমান-বিরুদ্ধতার মনোভাবও ছিল না বলা চলে না। সার্বিক স্বদেশিকতাবোধের এক বাতাবরণের মধ্যে (তখন সবেমাত্র ১৮৫৭-র সিপাহি-বিদ্রোহ আর নীল-আন্দোলন ঘটে গেছে) ১৮৬০ সালে নাটক লিখতে গিয়ে স্বদেশপ্রেমের সুর কিছুটা স্বাভাবিকভাবেই বেজেছিল মধুসূদনের লেখনীতে। মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী প্রথম থেকেই খানিকটা স্বদেশিকতার উপলব্ধিতে উদ্বুদ্ধ। যখন জয়পুর ও মরুদেশ উভয় রাজ্যের রাজাই তার পানিপ্রার্থী এবং সে নিজে মরুদেশ-রাজ্যের অনুরাগিনী তখনও কিন্তু তার কাছে রাজা বা রানি কেউই রাজ্যের সংকটের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেননি। তবু কৃষ্ণকুমারী আপনা থেকেই আকাশে বাদ্যতরঙ্গ শুনেছে, শুনেছে অনিন্দ্য নারী-কণ্ঠ-নিঃসৃত আকাশবাণী —"যে যুবতী এ বিপুল কুলের মান আপন প্রাণ দিয়া রাখে, সুরপুরে তার আদরের সীমা থাকে না"।(৩/২)। দেশের জন্য আত্মত্যাগ করলে অতুল যশস্বিনী হবে—এই কথাই তাকে শুনিয়েছে সেই নারীকণ্ঠ -যে আত্মপরিচয় দিয়েছে পদ্মিনী বলে। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে, পিতৃব্য বলেন্দ্র সিংহের হাতে খড়্গ দেখে এবং তার মৃত্যু পিতা ভীমসিংহের অভিপ্রায় শুনে নাটকের কৃষ্ণকুমারীর মনে কোনও ক্ষোভ বা অভিযোগের ভাব দেখা দেয়নি। সে তার স্বজবসিদ্ধর সঙ্গল ও মধুরভাবে পিতার দর্শন প্রার্থনা করেছে। অপ্রকৃতিস্থ ভীমসিংহ তার সামনে আসতে পারেননি। কৃষ্ণকুমারী কোনও অভিমান না রেখে নিজের হাতে এবং একান্ত মনে মৃত্যু বরণ করেছে খড়্গাঘাতে। মৃত্যুর সময়েও কৃষ্ণকুমারী বলেছে —"জীবন কখনই চিরস্থায়ী নয়। যে আজ না মরে সে কাল মরবে। কুলমান রক্ষার জন্য প্রাণদান অপেক্ষা আর কি পুণ্যকর্ম আছে?"(৫/৩)। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে সে নিজেকে 'দুঃখিনী' বলে উল্লেখ করে জননীর কাছে বিদায় নিয়েছে কিন্তু সে উক্তি স্বাভাবিক বিনয়ের —কোনও অবরুদ্ধ ক্ষোভের নয়।

আমরা লক্ষ করি, স্বদেশপ্রেমের প্রসঙ্গ টড-এর কৃষ্ণকুমারীর সংলাপে অভিব্যক্ত হয়নি। তা হবার কথাও নয়। রাজপুত-ইতিহাসের যে-সময়টিকে টড বিবৃত করতে চেয়েছেন তখন স্বদেশ-সম্পর্কিত কোনও সর্বায়ত ভাবনা সাধারণ মানুষের মনে গড়েও ওঠেনি। রাজপুতেরা এক একটি গোষ্ঠীতে আবদ্ধ থাকতেন। রাজারা ছিলেন প্রকৃতপক্ষে আঞ্চলিক গোষ্ঠী-নেতা। প্রতিটি গোষ্ঠীর মধ্যেই ছিল তীব্র অন্তঃকলহ, ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতার সঙ্গে বংশমর্যাদা, জাতিবর্ণের উঁচু-নিচু ভেদ, আভিজাত্যবোধের অহমিকা রাজপুতদের বৈশিষ্ট্য ছিল। কোনও বহিরাগত শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাঁরা কখনও দাঁড়াতে পারেননি। স্বাধীনতা তাঁদের প্রিয় ছিল সত্যিই, মৃত্যুভয়ও ততটা ছিল না কিন্তু এ-সবের মূলে ছিল গোষ্ঠী-বংশ-জাতভিমান —ইত্যাদি আঁকড়ে থাকার প্রবণতা —ঠিক দেশপ্রেম নয়। এই বংশগৌরব ও অর্ন্তদ্বন্দ্ব প্রায়ই জটিল হয়ে উঠত নারীকে কেন্দ্র করে। কুল-গৌরবে ন্যূন কেউ যদি উচ্চতর কুলের কন্যার পাণিপ্রার্থী হতেন তাহলে উচ্চকুলের গোষ্ঠীপতিরা অপমান বোধ করতেন। অথচ ক্ষমতার অভাবে সবসময়ে তা রোধ করতেও পারতেন না। এই সব সংকটকালে

কন্যাকে মৃত্যু বরণে বাধ্য করে আশু সংকটমুক্তির চেষ্টা রাজপুতদের রাজত্বে বারবারই ঘটেছে। রাজনীতির দেনা-পাওনার এবং দাবার চালে তাদের ঘুঁটির মতো ব্যবহার করা হবে—এ-সত্য রাজপুত-কন্যারা সতিই জেনে আসতেন আশৈশব। রাজপুত-ইতিহাসে এ ধরণের ঘটনা বারবার ঘটেছে। সাধারণ মানুষের মধ্যেও কন্যার বিবাহজনিত সমস্যা, পুত্র-কামনার আতিশয্য, পণপ্রথার পেষণ—ইত্যাদি কারণবশত কন্যাশিশু হত্যার প্রচলনও রাজস্থানে ছিল সর্বমিত্র। কাজেই টড-এর বিবরণে মৃত ইতিহাসের কৃষ্ণকুমারীর মনে দেশপ্রেম-ভাবনা যদি না জেগে থাকে; পরিবর্তে যদি জেগে থাকে রাজপুত রাজন্যবর্গের প্রতি, পিতার প্রতি, রাজপুতদের সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি ক্ষোভ — তাহলে তা ঘটেছে ইতিহাসের সত্যতাকে স্বীকার করেই।

কেবল এটুকু আমরা বলতে পারি টড-এর কৃষ্ণকুমারীর ওই শান্তিক কন্ঠ তার চরিত্রটিকে অনেকখানি নাটকীয় করে তুলেছিল; মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারীর সরল-বাচন এবং সরল মনোভঙ্গি তার চরিত্রে নাটকীয় অন্তর্দ্বন্দ্বে জেলে দিতে পারেনি। মধুসূদনের কল্পনার কিশোরী নায়িকা সর্বতোভাবে ছিল সুশীল ও পুষ্পকোমল। তবে দেশানুরাগের স্পর্শ এবং মৃত্যু সম্পর্কে পরিপূর্ণ নির্ভীকতা তাকেও একধরণের কোমল অথচ দৃঢ় স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে।

সাহিত্য-রূপকল্প-কৃত যে-কন্যাদের পরিচয় আমরা উদ্ধৃত করেছি তাদের মধ্যে সর্ব-প্রাচীন সৃষ্টি হল ইউরিপিদেস-এর 'অলিস-এ ইফিগেনেইয়া' নামের ট্র্যাজেডি। এই নাটকটি ইউরিপিদেস-রচিত সর্বশেষ নাটক বলে জানা যায়। খ্রিস্টপূর্ব ৪০৭ এবং ৪০৬ অব্দের মধ্যে ট্র্যাজেডিটি রচিত। গ্রীক পুরাকথায় সংক্ষেপে বর্ণিত এক ঘটনা থেকে পল্লবিত করে তোলা এই করুণ নাটক ইউরিপিদেস-এর এক মহৎ সৃষ্টি — বিশ্বসাহিত্যের এক অনন্য সম্পদ। কাহিনীটি এই যে— গ্রীস থেকে ট্রয় নগরীর দিকে যুদ্ধযাত্রার কালে অলিস বন্দরে এসে সহসা দেবী আর্টেমিস-এর বিমুখতায় হাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। আর্টেমিস-এর একটি হরিণকে আগামেমনন বধ করেছিলেন বলেই দেবীর এই ক্রোধ। অনুকূল বায়ুর অভাবে গতিহীন হয়ে যায় সমুদ্রপোত। দৈববাণী শুনে গ্রীক বাহিনীর নেতা, আর্গোস-রাজ আগামেমনন নিজের কন্যা ইফিগেনেইয়া-কে দেবীর উদ্দেশে উৎসর্গ করলে আবার অনুকূল হাওয়া বইতে থাকে। পালতোলা জাহাজ সচল হয়। কোনও কোনও পরিবর্তিত কাহিনীতে উৎসর্গমুহূর্তে ইফিগেনেইয়া অদৃশ্য হয়, বলির স্থলে দেখা যায় এক হরিণীকে, ইফিগেনেইয়াকে দেবী নিয়ে যান অ্যাথিনীর মন্দিরে পূজারিণী হবার জন্য।

ইউরিপিদেস-এর নাট্যকাহিনীর প্লট সুনির্মিত এবং নাটকীয় উৎকণ্ঠাবহুল। ট্রয় যাত্রার পথে হাওয়া সহসা বন্ধ হয়ে গেলে কিলিত হয়ে ওঠা রাজাকে দৈবজ্ঞ কল্চাস বা কাল্‌কাস শোনান দেবী আর্টিমিস-এর বিরাগের বৃত্তান্ত। তিনিই বলেন যে রাজার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে উৎসর্গ করলে তবেই দেবী প্রসন্ন হবেন আবার। রাজকন্যা ইফিগেনেইয়া ছিল ক্লাত্তেমেনস্ত্রা। আগামেমনন চিঠি পাঠালেন পত্নী ক্লাত্তেমেনস্ত্রা-কে। পত্রের মর্মার্থ — গ্রীক বীর অ্যাকিলিস-এর সঙ্গে কন্যার বিবাহ স্থির হয়েছে — কন্যাসহ রানি যেন চলে আসেন অলিস-এ। মাঝে অবশ্য দ্বিধাগ্রস্ত রাজা কন্যা ও পত্নীকে আসতে নিষেধ করে এক পত্র পাঠান যেটি পথে কেড়ে নেন মেনেলাউস। আনন্দিত মাতা ও কন্যা অলিস-এ এসে উপস্থিত হলে দ্বিতীয় চিঠি নিয়ে যাওয়া সেই বৃদ্ধ ভৃত্য সমগ্র ষড়যন্ত্র গোপনে প্রকাশ করে দেয় রানির কাছে। আগামেমনন-কে ইফিগেনেইয়া হত্যার ব্যাপারে দ্বিধা দূর করতে প্ররোচনা দিয়ে চলেন রাজভ্রাতা, হেলেন-এর স্বামী মেনেলাউস। ইফিগেনেইয়াকে উৎসর্গ করবার ব্যাপারে সর্বক্ষণ তৎপর থাকেন তিনি। ক্লাত্তেমেনস্ত্রা প্রকৃত ঘটনা অবগত হয়ে প্রবল ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন, চেষ্টা করেন কন্যার মৃত্যু রোধ করতে। রাজা কর্ণপাত না করলে অ্যাকিলিসকে সব কিছু বলে রানি অনুরোধ করেন তার প্রস্তাবিত পত্নীকে রক্ষা করবার জন্য। বীর অ্যাকিলিস ইফিগেনেইয়াকে বাঁচাবার সর্বতোমেয় প্রয়াসে ব্রতী হন। এ কারণে অ্যাকিলিসকে সমালোচনা ও বিদ্রূপ করেছে অন্যান্য গ্রীক সৈনিক ও রাজপুরুষেরা। কিন্তু ইফিগেনেইয়ার মনে ধীরে ধীরে আসে পরিবর্তন। প্রথমে সে তীব্রভাবে বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু যখন সে অনুভব করে তার মৃত্যু চাইছেন তার পিতা, চাইছে সমগ্র সেনাবাহিনী এবং সারা দেশ—তখন অমোঘ ভবিতব্যের সমগ্র আয়তনটি সে অনুভব করে। সে বোঝে সহজভাবে নিশ্চিন্তে বেঁচে থাকার সুখভোগ তার জন্য নয়। বৃহৎ উদ্দেশের জন্য, দেশ ও জাতির স্বার্থের জন্য কারও কারও অদৃষ্টে থাকে এরকমই মৃত্যু এবং ও মেনে নিতে হয়। ইফিগেনেইয়া প্রস্তুত হয় আত্মোৎসর্গের জন্য। প্রথমে সে একের স্বার্থে অপরের বিনাশের বিপুল ও নিষ্ঠুর বিশ্বনিয়মের উদ্দেশে শোকস্তোত্র উচ্চারণ করে, তারপর তার আত্মদানে গ্রীসের সম্ভাব্য যুদ্ধজয়ের প্রশস্তি গায়। সবশেষে সীমাহীন জীবন-বৈরাগ্য আর সদ্যস্ফুট কিশোরীজীবন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার অ-তল বেদনা এক হয়ে যায় তার অন্তিম বাণীতে।

নাটকের শেষ দৃশ্যে অবশ্য আছে একটি 'মিরাক্ল' যা ইউরিপিদেস-এর ট্র্যাজেডিতে প্রায়ই ঘটে। বলি-প্রদত্ত হবার মুহূর্তে দেখা যায় দৈববলে ইফিগেনেইয়া অদৃশ্য হয়ে গেছে - বেদি-তল শূন্য। সেখানে আছে এক হরিণী। এই ঘটনা ব্যক্ত করে পুরোহিত ব্যাখ্যা করেন — দেবতারা (অথবা দেবী আর্টেমিস) স্বয়ং তাকে নিয়ে গেছেন নিজের কাছে, মানুষের হাতে তার নিধন যাতে না ঘটে—সেজন্যই। কেন এভাবে নাটক শেষ করলেন নাট্যকার তা অনুমানের বিষয়। এক হতে পারে ইফিগেনেইয়ার বধকার্য প্রকৃতই সমাধা হল হয়ত পাঠক-দর্শকের চিত্তে ন্যায়পরায়ণ বিশ্ব-শৃঙ্খলার ধারণা ব্যাহত হবে বলে মনে হয়েছিল তাঁর। সম্পূর্ণ নিরপরাধ

কিশোরীর কেন মৃত্যু হবে? এমনকী সফোক্লিস-এর আন্তিগোনেও রাজার আদেশ লঙ্ঘনের ঔদ্ধত্য দেখিয়েছিল সম্পূর্ণ জেনে বুঝে। তার মৃত্যু খানিকটা মেনে নেওয়া চলে কিন্তু যুদ্ধ জয়ের স্বার্থে নিরুপায় কিশোরীর প্রাণ-বিনাশ যেন একটি জাতির ও দেশের বিবেকের পক্ষেও বেশি ভারি হয়ে যায়। তাই তার মৃত্যু নয়, অদৃশ্য হয়ে যাওয়া এবং তাতেই সন্তুষ্ট দেবসত্তা আবার অনুকূল বাতাসের প্রসাদ দান করেন গ্রীক সেনাবাহিনীকে। দ্বিতীয় কারণ হতে পারে – এই নাটক লেখার আগেই 'ত্রোরিস এ ইফিগেনেইয়া' নামে আর একটি নাটক লিখেছিলেন ইউরিপিদেস। সেটি এই নাটকের পরবর্তী ঘটনাংশ নিয়ে রচিত। সেখানে ট্রয়-যুদ্ধের পরে ইফিগেনেইয়াকে ত্রোরিস-এ অ্যাথিনির মন্দিরের পূজারিণি রূপে দেখা যায়। সেখানে স্বামীঘাতিনী জননী ক্লাত্তেমেনস্ত্রা-কে বধ করবার পর তারই ভাই ওরিস্তিস এসে পড়েছে তার কাছে। কাজেই আগে যাকে জীবিত দেখিয়েছেন তাকে এই নাটকে মৃত দেখালে স্বাভাবিক যুক্তিক্রম বিপর্যস্ত হবে—এরকম হয়ত ভেবেছিলেন নাট্যকার।

'অলিস-এ ইফিগেনেইয়া' আর 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'-এর মধ্যে পরিকল্পনাগত মিল বিশেষ নেই। উদয়পুর রাজ্যের রাজা ভীম সিংহ কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেননি। কৃষ্ণকুমারীর বিবাহ করা নিয়ে যেমন দ্বন্দ্ব বেধেছে মরুদেশ ও জয়পুরের রাজার-তেমন কোনও ঘটনা নেই গ্রীক নাটকে। পত্র প্রেরণ, আবার পত্র প্রেরণ এবং দ্বিতীয় পত্র না-পৌঁছনো – ইত্যাদি কিছুই নেই 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'-য়ে। বিলাসবতী, ধনদাস, মদনিকাকেন্দ্রিক ঘটনাবর্তের কোনও অবকাশই নেই গ্রীক নাটকটিতে। তবু টড তাঁর গ্রন্থে ইফিগেনেইয়ার নাম করেছেন—তা-ও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক নয়। দেশের স্বার্থে, পিতার নির্দেশে কন্যার মৃত্যু—এই কেন্দ্রীয় বিষয়টি দুটি নাটকেই রয়েছে। তাই তুলনা হতে পারে আগামেমনন-এর সঙ্গে ভীমসিংহের এবং ইফিগেনেইয়ার সঙ্গে কৃষ্ণকুমারীর চরিত্রের। আমরা এই দুই কন্যাকে পাশাপাশি রাখব।

কিশোরী ইফিগেনেইয়া, তারও বয়স পনেরো, জীবনের গুরুভার ও জটিলতার স্বরূপ তখনও সে ভাল জানে না, পিতার প্রতি তার প্রগাঢ় ভালবাসা আর আস্থা। অলিস-এ এসে বহুদিন পরে পিতাকে দেখে সে আনন্দে বিহ্বল —

"Fain am I, father, on thy breasts to fall/After so long!"

যখন সে দেখে উৎসর্গের জন্য বেদি প্রস্তুত হচ্ছে তখনও সে কিছু বোঝে না —

"Father shall I lead dances round the alter?"

মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারীরও পিতার প্রতি একই বিশ্বাস ও ভালবাসা আছে। রাজকার্যে ব্যস্ত পিতাকে অন্তঃপুরে পেয়ে সে তার হাতে তৈরি বাগানটি দেখাতে চায়।—"পিতঃ, আপনি অনেকদিন আমার উদ্যানে পদার্পণ করেন নাই, ও আজ একবার চলুন! আহা! সেখানে যে কতপ্রকার ফুল ফুটিছে, আপনি দেখে কত আনন্দিত হবেন এখন।"(২/১)। রাজাকে আবার চলে যেতে হয় রাজকার্যে। কন্যা দুঃখিত হয়ে বলে—"দেখ, মা, আজ পিতা একবার আমার উদ্যানটি দেখলেন না?"(২/১)।

ইফিগেনেইয়া যখন জানতে পারে যে তাকে মৃত্যু স্বীকার করতে হবে পিতার ইচ্ছায়—তার পর থেকেই ইউরিপিদেস এই কিশোরীকে নাটক-কেন্দ্র স্থাপন করেন—একবারও তাঁর আলোক-সম্পাত-বলয় থেকে তাকে সরিয়ে রাখেন না। এই প্রাধান্য কোনও সময়েই কৃষ্ণকুমারী পায়নি মধুসূদনের নাটকে। সে যে-মুহূর্তে জানতে পারে যে, পিতার ইচ্ছায় এবং 'কুলমান' বজায় রাখার জন্য তার মৃত্যু প্রয়োজন প্রায় তখনই সে বিনা অন্তর্দ্বন্দ্বে খড়্গাঘাতে নিজের প্রাণ বিনাশ করে। তার মনোভাবের কোনও পরিবর্তন আমরা অনুভব করি না। অপরপক্ষে ইফিগেনেইয়ার মানস-পরিবর্তনের স্তরগুলি উন্মোচিত করাই ইউরিপিদেস-এর প্রধান অভিপ্রায়। মৃত্যু-আজ্ঞা শুনে প্রথমেই সে বলে ওঠে —

"আমাকে মেরো না অসময়ে!
আলো কি মধুর ঃ
জোর করে দেখিও না পাতাল-আঁধার!"

বাবরার পিতাকে সে শৈশবকালের স্নেহ-সম্ভাষণ স্মরণ করিয়ে দেয়। সে বলে—

"আমি তো রেখেছি মনে সে-সব সংলাপ; তবু ঃ
তুমি গেছ ভুলে।
তুমি হত্যা করবে আমাকে।"

হতাশ ও মরিয়া যুক্তি প্রয়োগে সে বোঝাতে, হয়ত বা বুঝতেও চেষ্টা করে —

"আমার কোথায় দায়
প্যারিসের হেলেন-সঙ্গেতে?"
"What part have I in paris's rape of Helen?"

সে পিতার অনুকম্পা, দয়া প্রার্থনা করে —

"আমাকে করুণা করো, আমার তারুণ্যের প্রতি
দয়াশীল হও।"

সে বলে- "মৃত্যু যে প্রার্থনা করে সে উন্মাদ!"
সুগভীর নিরাশ্বাস কষ্টে সে পিতাকে ও দেবী আর্টেমিসকে স্মরণ করে আর্তনাদ করে—

"আমাকে করল গ্রাস সেই শিকারিনী
প্রথম শিকার-ফল তার।
আমার নিজের পিতা ত্যাগ করল সন্তানকে,
ভাঙল বিশ্বাস
দুর্ভগিনীতমা দুহিতার—"

বাঁচবার জন্য এই ব্যাকুলতার চিহ্নমাত্র দেখা যায় না মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারীর উক্তিতে ও আচরণে। টড-এর কৃষ্ণকুমারী তবু একটি

ক্ষুরধার বাক্যে সেই এষণা ও অধিকারবোধ প্রকাশ করেছিল। মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী নিজেই প্রসন্ন সান্ত্বনা দিয়েছে তার জননী ও পিতৃব্যকে "এর নিমিত্তে আপনি এত কাতর হচোন কেন? –কাকা, আমি রাজপুত্রী! রাজকুলপতি ভীমসিংহের মেয়ে। আপনি বীরকেশরী। আপনার ভাইঝি। আমি কি মৃত্যুকে ভয় করি?" (৫/৩)। পুনশ্চ পিতারও ইচ্ছা যে, তার মৃত্যু হোক –এক্ষণা জেনেও সে বলে – "কাকা, পিত্ত এমন কচোন কেন? পিত্ত, আপনি এ সামান্য বিষয়ে এত আক্ষেপ করেন কেন? জীব মাত্রেই শমনের অধীন। যে আজ না মরে সে কাল মরবে। কুলমান রক্ষার জন্যে প্রাণদান অপেক্ষা আর কি পুণ্যকর্ম আছে?"(৫/৩)। মৃত্যুকালে জননীর কাছে সে নিজেকে 'দুঃখিনী' বললেও তা যতটা বাঙালির বাচনভঙ্গি 'অভাগাকে মনে রেখো' জাতীয় – ততটা দুঃখবোধের পরিচায়ক নয়। কোনও অপরাধই সে করনি তবু বারবার সকলের কাছে মার্জনা চেয়ে প্রাণত্যাগ করেছে সে। দেশের জন্য আত্মদানের গর্ববোধও তার সংলাপে স্ফুট নয়। দু'একবার যশের প্রসঙ্গ উল্লেখ করলেও কাজটিকে সে পুণ্যকর্ম বলে মনে করেছে এবং এক ধরণের জীবন-ঔদাস্য থেকেই যেন পৃথিবী ছেড়ে গেছে। ভারতীয় সমাজের প্রেক্ষাপট মনে রাখলে কৃষ্ণকুমারীর এই আচরণ খুব অস্বাভাবিক মনে হয় না। যে-দেশে আত্মপীড়ন নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে ধর্ম-সাধনার একটি পথ, যে-দেশে নারীর আত্মপীড়ন এমন পর্যায়ে পৌছেছিল যে জ্বলন্ত চিতায় পুড়ে মরাকে অনেক নারীও পবিত্র ও গৌরবময় কাজ বলেই বিবেচনা করতেন – সে-দেশে কৃষ্ণকুমারীর আচরণ উনিশ শতকের বাঙালি দর্শকের কাছে চরিত্রোপযোগী বলেই মনে হত, অন্যরকম হলেই তা হত অস্বাভাবিক। নাট্যকারকে তৎক্ষণিক দর্শক-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন থাকতেই হয়।

ইউরিপিদেস-এর ইফিগেনেইয়াকে বাঁচাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অ্যাকিলিস। গ্রীক সহযোদ্ধাদের হাতে অ্যাকিলিস-এর লাঞ্ছনার কথা শুনতে শুনতে ইফিগেনেইয়ার মনের পরিবর্তন হয়। ততক্ষণে সে এ-ও বুঝেছে যে পিতার মতের বদল হবে না আর। তখন সে বলেছে —

"যদি মৃত্যুই নিয়তি আমার;
তবে তা ঘটুক দীপ্ত গরিমায়।"

ক্রমে দেশের সম্মান-রক্ষার জন্য আত্মদানের উদ্দীপনা তাকে প্রকৃতই নির্ভীক করে তোলে —

"আমাকে উৎসর্গে করো, নিশ্চয় করে দাও ট্রয়;
এই হবে আমার যশের স্তম্ভ যুগ যুগ ধরে ঃ
এই হবে বিবাহ, সন্তান আর
মহিমা আমার।
জয়ধ্বনি করো তরুণীরা, অর্ঘ্য আনো,
শুদ্ধ ভোজ্য আনো —
দ্যাখো, আসছি আমি নিরাপদে হেলাস-কে দিতে
জয়ের মুকুট।"

প্রাথমিক মৃত্যু-অনীহা অতিক্রম করে, অ্যাকিলিস-এর প্রণয়ের স্বীকৃতি দিয়ে — তা-ও উত্তরিত হয়ে ইউরিপিদেস-এর ইফিগেনেইয়ার এই আত্মদান সিদ্ধান্ত অনেক বেশি নাটকীয় ও মর্মস্পর্শী মনে হয় আমাদের।

ইফিগেনেইয়ার শেষ উচ্চারিত বাক্যগুলি বিশ্লেষণের অতীত এক উচ্চতা স্পর্শ করেছে। মৃত্যুর সিদ্ধান্তে স্থির; অথচ জীবন-মহার্ঘ জীবন– ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে বলে হৃদয়ের নাভিমূল মথিত করে উঠে আসা ব্যথার বাণী এক চিরন্তন শোকগান হয়ে বাজে তার কণ্ঠে –

"Hail light divine!
Hail day in whose hands doth
the world's torch shine.
In a strange new life must I dwell,
And a strange new lot must be mine!
Farewell, dear light, farewell!"[১৯]

জয় হোক দিব্য আলোকের!
জয় হোক দিবসের, যার হাতে প্রজ্বলিত
ধরার মশাল।
আমাকে থাকতে হবে নতুন, অচেনা এক জীবনে,
আমাকে মানতে হবে
নতুন অজানা এক ভাগ্য!
বিদায়, হে প্রিয়তম আলো, বিদায়!

এই সংহত শোক প্রতিমা ইফিগেনেইয়াকে আমরা আর কোনও কন্যার মধ্যেই পাব না। কারও কারও মতে নাটকের এখানেই সমাপ্তি। পরবর্তী অংশ –যেখানে বেদিতল থেকে ইফিগেনেইয়া অন্তর্হিত, পরিবর্তে আছে এক কিশোরী হরিণ –তা অপর কারও সংযোজন।

ফরাসি নাট্যকার জাঁ রাসিন ইউরিপিদেস-এর নাটকটিকে অবলম্বন করেই ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেছিলেন তাঁর 'ইফিজেনি' (Iphigenie) নাটক। কিন্তু সপ্তদশ শতকের নাট্যকার সমকালের প্রচলিত পঞ্চাঙ্ক নাটকের রীতি অনুসারে জটিলতর ঘটনাবর্ত এবং অন্তঃপ্লট আমদানি করলেন নাটকে। গ্রীক যুগের ঋজুগতি-বিশিষ্ট নাটকের জায়গায় নব্য ধ্রুপদী যুগের ঘোরালো প্লট পরিকল্পনার দৃঢ়ন্ত পাই এখানে। ইস্‌কাইলাস ও সফোক্লিস-এর নাটকে ইফিগেনেইয়াকে সত্যিই হত্যা করা হয়েছিল। ইউরিপিদেস-এর নাটকে ঘটেছিল ইফিগেনেইয়ার বদলে হরিণীর বলিদান। রাসিন আমদানি করেছেন এক দ্বিতীয় ইফিগেনেইয়াকে –যে ইরিফাইল ছদ্মনামে অ্যাকিলিস-এর প্রেম-প্রত্যাশী ও ইফিগেনেইয়ার প্রতি ঈর্ষা ও বিদ্বেষভাবসম্পন্ন। তারই ষড়যন্ত্রে

ইফিগেনেইয়ার মৃত্যু আসন্ন হয়ে ওঠে। এই নাটকে দৈবজ্ঞ পুরোহিত কালকাস দেবীর বাণীর ব্যাখ্যা করেছিলেন এই বলে – দেবী চান হেলেন-এর সঙ্গে রক্তের সম্পর্কে অন্বিত কোনও কন্যা –'A maid of Helen's blood'। এই সূত্রেই আগামেমনন্-এর জ্যেষ্ঠা কন্যাকে সেই নারী বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু আসলে ইরিফাইল, অর্থাৎ দ্বিতীয় ইফিগেনেইয়া-ই ছিল উদ্দিষ্ট –যে থিসিউস-এর ঔরসজাত হেলেন-এর গর্ভের সন্তান। কাহিনীর অন্যান্য অংশ – পরপ্রেরণ, মাত্ত ও কন্যার আগমন, অ্যাকিলিস-এর সঙ্গে বিবাহ প্রস্তাব –ইত্যাদি ইউরিপিদেস-এর নাটকের মতোই। কেবল আগামেমনন্ ও অ্যাকিলিস-এর মধ্যে এক অতিরিক্ত বিদ্বেষভাব দেখিয়েছেন রাসিন। এই বিদ্বিষ্টতা কিন্তু হোমার-এর ইলিয়াড-এর একটি প্রধান দিক। ইউরিপিদেস-এ তা ততটা অনুভাব করা যায় না।

রাসিন-এর ইফিগেনেইয়া অ্যাকিলিস-এর প্রতি প্রগাঢ় অনুরক্ত। এই অনুরাগ বর্ণময় ভাষায় প্রকাশ করেছেন রাসিন। রাসিন-এর অ্যাকিলিস ইউরিপিদিস-এর অ্যাকিলিস-এর চেয়ে বেশি উদ্দীপ্ত। সহযোদ্ধারা তাকে নিরস্ত করতে পারেনি, উলটে অ্যাকিলিস-এর প্রভাবেই নিরপরাধ কিশোরীর প্রাণবধের প্রতিবাদে আগামেমনন্ আর ক্যালক্যাসকে অভিযুক্ত করেছে তারা। প্রাক খ্রিস্টীয় গ্রীসে রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের অন্যথা চিন্তা করা শেলি। সপ্তদশ শতকের ফ্রান্স ব্যক্তিস্বাধীনতায় বেশি আস্থাশীল। এই পার্থক্যও অনুভূত হয় নাটক দুটিতে। এর মধ্যেও ইফিজেনিয়া, রাসিন-এর নাটকে অ্যাকিলিস-এর প্রণয় স্বীকার করেও কিন্তু পিতার প্রতি সহানুভূতিশীল। পিতা তাকে বধের আদেশ দিয়েছেন জেনেও সে পিতার প্রতি বিরূপ হতে পারেনি। আগামেমনন্-এর সংকট সে অনুভব করেছে পুরোপুরি। অ্যাকিলিস আগামেমনন্-এর উদ্দেশে রূঢ় বাক্য উচ্চারণ করলে প্রতিবাদ করেছে সে—"আমি আবার বলছি, প্রভু, তিনি আমার পিতা। পিতা, যাঁকে আমি ভালোবাসি ও সম্মান করি। আজ পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকে স্নেহ ছাড়া আর কিছু পাইনি। শৈশব থেকে আমার যে হৃদয় কন্যার কর্তব্য জেনেছে সে তাঁর প্রতি আঘাত-বাক্যে গভীর দুঃখ বোধ করে।" আগামেমনন্ কে কিছুটা সমর্থন করেই সে বলেছে—"যদি উপায় থাকত তাহলে কেন তিনি আমাকে বিনাশ করবেন? তাঁর চোখে অশ্রু দেখেছি, বিশ্বাস করো। তাঁকে দোষী কোরোনা প্রভু! তাঁর হৃদয় দুঃখ পরিপূর্ণ, তীব্রভাবে পীড়িত, তোমার ঘৃণা তাকে বিচূর্ণ না করুক।"(৩/৭)।

রাসিন-এর ইফিগেনেইয়া প্রধানত তার কথা অ্যাকিলিসকেই শুনিয়েছে; ইউরিপিদেস-এর ইফিজেনিয়ার মতো নিজেকে ও বিশ্বকে নয়। আত্মদানের সিদ্ধান্তে তার কোনও দ্বিধা নেই – "পিতার আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হবো আমি? যে-মৃত্যু গৌরবের তাকে অস্বীকার করব? আমার পবিত্রতম কর্তব্যকে এইভাবে করব অস্বীকার?"(৫/১)।

রাসিন-এর ইফিগেনেইয়া অ্যাকিলিস-এর প্রেমকেও দিয়েছে পূর্ণ স্বীকৃতি। অলিস-এ এসেই মৃত্যুর বার্তা শুনে তার আক্ষেপ- 'এই তবে আমার বিবাহ!' ক্রমে মুছে গেছে। সে অ্যাকিলিস-এর প্রেমিকারূপেই উৎসর্গ করতে চেয়েছে নিজেকে—

"Make Trojan widows wail and weep for me,
This prospect lets me die calm and content,
If life with my Achilles is denied me,
I hope at least in happier times to come,
My memory to your immortal deeds
May cling, my death the fountain of your fame."[২০]

আমারই কারণে ট্রয়ের বিধবারা আর্তকান্নায় ভাঙবে—
একথা মনে করে মৃত্যু মেনে নিই শান্তভায় আর তৃপ্তিতে,
আমার অ্যাকিলিস আমার এ-জীবনে যদি না
মিলনের সাথী হল,
এ আশা অন্তত আগামী সুখময় দিনগুলির তরে
রেখে যাই,
তোমার কীর্তির অমর মহিমায়
নিবিড় মিশে যাক একাকার
আমার স্মৃতি, আর আমার মৃত্যুই তোমার
সুযশের উৎস হোক।

রাসিন-এর ইফিগেনেইয়ার মৃত্যু হয়নি শেষ পর্যন্ত। ষড়যন্ত্রকারিনী ইরিফাইলকেই মরতে হয়েছিল তার জায়গায়। কিন্তু ইফিগেনেইয়ার চরিত্রটিকে বড় যত্নে এঁকেছেন রাসিন। পিতার অনুরাগিনী দুহিতা, প্রেমিকের প্রণয়িনী আর দেশের জন্য প্রাণ-উৎসর্গকারী-তিনটি ভূমিকা একই সঙ্গে চমৎকার ফুটেছে তার চরিত্রে। মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারীর চরিত্রে নাটকীয় ভাব-পরিবর্তন, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, আবেগের উত্থান-পতনের অভাবের দিকটি আবারও মনে পড়ে যায় আমাদের। বিশেষত, কৃষ্ণকুমারীর অন্তরেও এক প্রেমের উন্মেষ দেখিয়েছেন মধুসূদন। কিন্তু মৃত্যুকালে একবারও সেই প্রেমের অনুভূতি মনে মনেও ব্যক্ত করেনি কৃষ্ণকুমারী। প্রেমিকার স্বাভাবিক মিলনপ্রত্যাশা, প্রিয়-সঙ্গ-তৃষ্ণা থেকেও তার মৃত্যুসংকল্প কয়েক মুহূর্তের জন্য কম্পিত হতে পারত। হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যুমুহূর্তে তার প্রেমের তরঙ্গটি ঝংকৃত হয়নি একবারও। হয়ত মধুসূদন এখানেও ঔচিত্যবোধের দ্বারাই চালিত হয়েছেন। পশ্চিমের দেশের মেয়েরা অভিভাবকদের সামনেও প্রেম ও প্রেমিককে স্বীকার করে নিতে লজ্জা পায় না। ভারতীয় মেয়েরা প্রণয়ভাব গোপন রাখতেই অভ্যস্ত হয়, সামাজিকভাবেও খানিকটা তা করতে বাধ্য থাকে। কিন্তু কৃষ্ণকুমারী যেমন আগেও নিজের মনে নিজের অনুরাগকে লালন করেছে এবং স্বগতোক্তির পদ্ধতিতে নাট্যকার তা আমাদের শুনিয়েছেন—সেভাবেও মরুদেশের

রাজাকে স্মরণ করে অতি সঙ্গোপনে দুই বিন্দু অশ্রুমোচন করতেও পারত সে। একবারের জন্যও ভাবতে পারত —'বাঁচতেই চাই'। এখানে মধুসূদন চরিত্রটির সামান্য নাট্য-সম্ভাবনার প্রতিও কিছু অবহেলা দেখিয়েছেন বলে মনে হয়।

টড হ্যান্ডেল-এর রচিত ওপেরা 'জেপথাহ'-র উল্লেখ করেছেন। এই ওপেরাটি ১৭৫১ সালে লিখতে লিখতেই অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন হ্যান্ডেল। তাঁর ওপেরা-সম্ভারের মধ্যে 'জেপথাহ' সর্বশ্রেষ্ঠগুলির অন্যতম বলে বিবেচিত হয় না। এই ওপেরাটির সন্ধান কলকাতায় বসে এখনও আমরা করে উঠতে পারিনি। তবে 'জেপথাহ'-র মূল কাহিনীটি বাইবল্ থেকে আমরা এখানে উদ্ধার করতে পারি।

পুরনো বাইবল-এ আছে রাজা গিলিয়াদ-এর পুত্র ছিলেন জেপথাহ্ কিন্তু তাঁর জননী ছিলেন এক বারাঙ্গনা—গিলিয়াদ-এর বিবাহিতা পত্নী নন। গিলিয়াদ-এর মৃত্যুর পর তাঁর বৈধ-সন্তানেরা জেপথাহ্-কে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত ও বিতাড়িত করেন। জেপথাহ্ তখন এক মরুদস্যুতে পরিণত হন এবং অসমসাহসী ও শৌর্যশালী বীররূপে পরিচিত হন। কিছুকাল পরে অ্যামোনাইট গোষ্ঠীর লোকেরা গিলিয়াদ-পুত্রদের ভূসম্পত্তি অধিকার করে নিলে ভাইরা আবার জেপথাহ্-কে অ্যামোনাইটদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য আহ্বান করেন। যুদ্ধ জয় হলে জেপথাহ্-ই তাঁদের নেতৃপদে থাকবেন এবং হবেন প্রধান বিচারক —এই শর্তে ভাইরা সম্মত হলে জেপথাহ্ এসে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেন। তিনি ঈশ্বরের কাছে জয়লাভের প্রার্থনা জানিয়ে সংকল্প করেন যে যুদ্ধ জয় করে যেখানে পথে গৃহ থেকে নির্গত প্রথম যে-প্রাণী তাঁর দৃষ্টিপথে পড়বে তাকেই তিনি উৎসর্গ করবেন ঈশ্বরের উদ্দেশে। যুদ্ধজয়ী বীর জেপথাহ যেখানে পথে দেখলেন — তাঁরই একমাত্র কন্যা - কুমারী কন্যা মাল্য ও অর্ঘ্য নিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে আসছে। আমরা বাইবল্-এর কবির বর্ণনার ইংরেজি অনুবাদে কাহিনীটি শুনতে পারি। — 'জাজেস' অধ্যায়ের একাদশ পরিচ্ছেদে আছে এই কাহিনী —

30. And Jeph-thah vowed a vow unto the Lord, and said, If thou shalt without fail deliver the children of Ammon into mine hands,
31. Then it shall be, that whatsoever cometh forth of the doors of my house to meet me, when I return in peace from the children of Ammon, shall surely be the Lord's, and I will offer it up for a burnt offering.

তারপর যখন বিজয়ী পিতাকে অভ্যর্থনা জানাতে সানন্দে প্রথম বেরিয়ে এল কন্যা তখন দুঃখিত পিতা ব্যক্ত করলেন সংকল্পের কথা। লক্ষণীয় জেপথাহ্ দুঃখিত হলেও কোনও দ্বিধা তাঁকে স্পর্শ করেনি।

35. "I have opened my mouth unto the Lord, and I cannot go back."

বাইবল্ নাটক নয়, ঠিক কাব্যও নয়। বাইবল এক ধর্মানুগত মানবজাতির মহা-ইতিহাসের বিপুল সংকলন। কোনও কিছুই সেখানে নাটকীয়ভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে না। সবকিছুই সেখানে ধীর-গম্ভীর-সংহতভাবে বর্ণিত। জেপথাহ্-র কথা শুনে তার কন্যা কেবল বলে —

36. And she said unto him, My father, if thou hast opened thy mouth unto the Lord, do to me according to that which has proceeded out of thy mouth

জেপথাহ্র এই কন্যার কোনও নামও নেই বাইবল্-এ। তবে জীবন ছেড়ে যেতে তার যে শোক—তার উল্লেখ আছে পরবর্তী সূক্ত-তে।-

37. And she said unto her father, Let this thing be done for me : let me alone two months, that I may go up and down upon the mountains, and bewail my virginity, I and my fellows.

"সেই কন্যা তার পিতাকে বলেছিল, আমাকে একটি অনুগ্রহ করো। দু'মাস আমাকে সময় দাও। যাতে আমি পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই পথে পথে বিচরণ করতে পারি আমার সঙ্গিনীদের নিয়ে, আর শোক করতে পারি আমার কুমারী জীবনের জন্য।"

জেপথাহ্ সম্মত হলে কন্যা দুমাসের জন্য চলে গেল অরণ্য-নির্জনে। তারপর ফিরে এল মরবার জন্য। সংকল্প রক্ষা করলেন জেপথাহ। বাইবল্-এর কবি বলেছেন — "and she knew no man" কোনও পুরুষকে জানবার আগেই পৃথিবী ছেড়ে গেল এক অনাঘ্রাত কুমারী। অবশ্য বাইবল্-কার তাকে একেবারে বিস্মৃত হতে দেননি। কন্যার চল্লিশদিনের জন্য ইজরেল-এর মেয়েরা কুমারী জেপথাহ্-কন্যার জন্য শোকগীতে গাইতে উঠে যায় পাহাড়ের উপর।

জেপথাহ্-কন্যার সঙ্গে কৃষ্ণকুমারী-র কোনও মিল নেই। কোনও বিপন্নতায় বা স্বার্থসিদ্ধির কারণে নয়, সাধারণ প্রার্থনা হিসাবেই জেপথাহ্ যখন উৎসর্গ-সংকল্প করেন তখন দুহিতার কথা ভাবেননি একেবারেই। আবার অন্যদিকে কোনও ছল-চাতুরি বা দ্বিধার আভাস নেই তাঁর আচরণে। কন্যাও কোনওরকম অভিযোগ করেনি পিতাকে, প্রতিরোধ করেনি প্রস্তাবের। বেদনার সঙ্গে কিন্তু অবিচলভাবে মেনে নিয়েছে মৃত্যুর ভবিতব্য। সম্পূর্ণ ঈশ্বরানুগত এক জনগোষ্ঠীর আচরণ যুক্ট উঠেছে পিতা ও কন্যার ব্যবহারে। যা একবার উচ্চারিত হয়ে গেছে ঈশ্বরের নামে, তার আর নড়চড় নেই!

জনকের হাতে সন্তানের উৎসর্গ বিশ্বসাহিত্যে আরও দেখা যায়। সব সময়ে কন্যাকেই উৎসর্গ করা হয়েছে, এমনও নয়।

মহাভারতের কর্ণ পুত্রকে বধ করেছিলেন অতিথিকে মাংসে তৃপ্ত করবার জন্য। ঈশ্বরাদেশে ইহুদিদের আদি-নেতা এব্রাহামপুত্র আইজ্যাক-কে অগ্নিতে উৎসর্গ করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন কিন্তু শেষ মুহূর্তে ঈশ্বর তাকে জীবিত রাখবার আদেশ দেন ও পরিবর্তে একটি মেষ পাঠিয়ে দেন উৎসর্গের জন্য। কর্ণ-পুত্রও জীবন ফিরে পেয়েছিল পরে। কিন্তু অভাগিনী জেপথাহ্-কন্যার পরিবর্তে কোনও মেষ বা মৃগ আবির্ভূত হয়নি। ইফিগেনেইয়ার ব্যাপারেও দুটি মত আছে। কোনও কোনও মতে তার প্রাণকিশা সম্পন্ন হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে কন্যাদের ক্ষেত্রে উৎসর্গটা হয়েই যেত প্রায় ক্ষেত্রে, বাধা হত না কোনও। পুত্রদের ক্ষেত্রে ধর্মের ও পুরাণের বিধান ছিল কখনও কখনও কিছু ভিন্ন!

জেপথাহ্-কন্যার সঙ্গে কৃষ্ণকুমারীর তুলনা আমরা টানব না। কাহিনীগত মিল না থাকলেও চরিত্রগত এটুকু সাদৃশ্য তাদের মধ্যে আছে—দুজনেই পিতার প্রতি কোনও অভিযোগ না রেখে মৃত্যু বরণ করা উচিত বিবেচনা করেছে, নিজেদের অদৃষ্ট মেনে নিয়েছে অ-প্রতিবাদে।

কিন্তু আমাদের কল্পনায় জেপথাহ্-দুহিতার এক আশ্চর্য মূর্তি জেগে ওঠে। দু'মাস ধরে পার্বত্য পথে পথে কেবলই কি শোকগাথা গেয়েছিল সেই মেয়ে? নাকি সে চেয়েছিল তার জীবনের শেষ দুটি মাস বনে ও পাহাড়ে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে থাকতে? দেহের কোষে কোষে, সর্ব ইন্দ্রিয়ে, প্রতি রোমকূপ-পথে সে কি পান করে নিতে চেয়েছিল সূর্যালোক, শুদ্ধ হাওয়া, পল্লব-মর্মর, পাখির কূজন, বৃষ্টি-বিন্দু, ঘাসের সবুজ, পুষ্প-গন্ধ? এমনকী সে হয়ত শানিত পাথর, তীক্ষ্ণ কন্টক-মুখ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, হিংস্র শ্বাপদের ভয়ের অনুভবের মধ্যেও দু'মাসের জন্য পূর্ণভাবে পেতে চেয়েছিল নিজেকেই। ভোগ করে নিতে চেয়েছিল নিজের বেঁচে থাকা! নিজের কুমারীত্বের জন্য অতৃপ্তির হাহাকারও তার মধ্যে এমন এক জীবন-পিপাসার ইঙ্গিত দেয় যা অন্য কোনও কন্যার মধ্যে আমরা পাই না।

হ্যান্ডেল কোনদিক থেকে এই কন্যাকে দেখেছিলেন তা আমরা জানতে পারিনি। তবে, মনে হয় — টড-এর উল্লেখ সত্ত্বেও হ্যান্ডেল থেকে তেমন কিছু গ্রহণ করেননি মধুসূদন। কাহিনী ও চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ওয়েকটার-এর ভার্জিনিয়া-কেন্দ্রিক ট্র্যাজেডি নিশ্চিত পঠিত থাকলেও সেখান থেকে মধুসূদন কিছু গ্রহণ করেননি। গ্রহণ করবার অবকাশও তেমন ছিল না। টড লিখলেও ভার্জিনিয়া ও কৃষ্ণকুমারীর চরিত্রে তেমন সাদৃশ্য নেই।

প্রাচীন রোমক ইতিহাসে আছে ভার্জিনিয়া-র কাহিনী। প্রাচীন ইতিহাস কিছুটা গল্প ও লোকশ্রুতি মিশ্রিত হয়। সেই সূত্রে ভার্জিনিয়ার কাহিনী মধ্যযুগে খুবই প্রচলিত ছিল। সেখান থেকে তা বহু ভাষা-শিল্পরূপের বিষয়রূপে গৃহীত হয়েছে। ভার্জিনিয়ুস ছিলেন এক ধনী ভূম্যধিকারী, অভিজাত-বংশীয়, অহংকারী, কুলগৌরব-সচেতন, আপাত-রুক্ষ এবং রূঢ়—কিন্তু এক খাঁটি মানুষ। তাঁরই সুন্দরী কন্যা ভার্জিনিয়া। আপ্পিয়ুস্ ক্লডিয়াস (Appius Claudius) নামে এক রাজপুরুষ তার প্রতি কামুক হয়ে ওঠে এবং তাকে হরণে উদ্যোগী হয়। এক পাপকর্ম-সহায়ক বন্ধুর সহায়তায় ভার্জিনিয়া-কে ক্রীতদাসী-কন্যা বলে আদালতে নিষ্পত্তি ঘটিয়ে আপ্পিয়ুস্ ভার্জিনিয়াকে কারারুদ্ধ করে রাখে। ক্রীতদাসী-কন্যা বলে তার স্বাধীনতাও হরণ করা হল—তাকে হতে হবে আপ্পিয়ুস-এর সম্পত্তি। এই সময়ে কন্যাকে দেখতে এসে ভার্জিনিয়ুস দুহিতাকে ছুরিকাবিদ্ধ করে হত্যা করলেন। কন্যাকে তিনি লালসার ভোগ হওয়া থেকে মুক্তি দিলেন, নিজেরও আভিজাত্যের মর্যাদা রাখলেন অক্ষুণ্ণ। ইতিহাস-কাহিনীতে আছে — এরপর সৈন্যরা আপ্পিয়ুস-এর প্রতি বিদ্রোহী হয় এবং আত্মঘাতী হয় আপ্পিয়ুস।

ওয়েকটার-এর নাটকের ঘটনাবর্ত প্রায় একই রকম। 'Appius and Virginia A Tragedy' (1620) নাটকে মোটের উপর এই চরিত্রগুলিকেই রোমক যুগের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করা হয়েছে। ভার্জিনিয়ুস আভিজাত্য-গর্বী এবং সততাসম্পন্ন বীর সেনানায়ক। তার কন্যা ভার্জিনিয়া ভালবাসে ইসিলিয়ুস নামের এক সাহসী ও ন্যায়পরায়ণ যুবককে। আপ্পিয়ুস প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী, সেনেট-এর সদস্য। সে ভার্জিনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হল প্রবলভাবে। বন্ধুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে একইভাবে ভার্জিনিয়াকে ক্রীতদাসী-সন্তান বলে প্রতিপন্ন করে তাকে বন্দিনী রাখল সে। প্রতিবাদ করেছে বলে বন্দি করল ইসিলিয়ুস-কেও।

নাটকটিতে অতীত রোমের নাগরিক প্রশাসনিকতা, যুক্তিবাদ অথচ মসৃণ শাসনব্যবস্থার আড়ালে ক্ষমতাবানের অন্যায় ও লুব্ধতার কার্যকলাপ দেখানো হয়েছে। কিন্তু-দৃশ্যের গুরুত্ব নাটকে খুব বেশি। বারবার বিচার সভা বসেছে এবং নাট্যীয় ঘটনাবলী প্রায়শই ঘটেছে বিচারশালাতেই। দাস ও স্বাধীন নাগরিকের মধ্যে বিপুল মর্যাদা ও অধিকারের পার্থক্য দেখতে পাই নাটকে।

ওয়েকটার-এর ভার্জিনিয়া নির্ভীক ও তেজস্বিনী তরুণী। বারবার সে ধিক্কার দিয়েছে আপ্পিয়ুস-এর লোভকে। তার ভীতিপ্রদর্শনে কর্তব্যকে বিসর্জন দেখানো হয়নি। কাহিনী ও চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ওয়েকটার-এর ভার্জিনিয়া-কেন্দ্রিক ট্র্যাজেডি নিশ্চিত পঠিত থাকলেও সেখান থেকে মধুসূদন কিছু গ্রহণ করেননি। গ্রহণ করবার অবকাশও তেমন ছিল না। টড লিখলেও ভার্জিনিয়া ও কৃষ্ণকুমারীর চরিত্রে তেমন সাদৃশ্য নেই।

প্রাচীন রোমক ইতিহাসে আছে ভার্জিনিয়া-র কাহিনী। প্রাচীন ইতিহাস কিছুটা গল্প ও লোকশ্রুতি মিশ্রিত হয়। সেই সূত্রে ভার্জিনিয়ার কাহিনী মধ্যযুগে খুবই প্রচলিত ছিল। সেখান থেকে তা বহু ভাষা-শিল্পরূপের বিষয়রূপে গৃহীত হয়েছে। ভার্জিনিয়ুস ছিলেন এক ধনী ভূম্যধিকারী, অভিজাত-বংশীয়, অহংকারী,

মধ্যযুগে খুবই প্রচলিত ছিল। সেখান থেকে তা বহু ভাষা-শিল্পরূপের বিষয়রূপে গৃহীত হয়েছে। ভার্জিনিয়ুস ছিলেন এক ধনী ভূম্যধিকারী, অভিজাত-বংশীয়, অহংকারী,

হস্তে মৃত্যু প্রার্থনা করেছে — যাতে তার কুমারীর পবিত্রতা ও আভিজাত্য লোভী কামুকের হাতে কলঙ্কিত না হয় এবং তাকে ক্রীতদাসী-কন্যা রূপে বন্দিনী থাকতে না হয়। ওয়েবস্টার-এর নাটকে অবশ্য আসন্ন মৃত্যু সম্পর্কে ভার্জিনিয়ার কোনও উক্তি নেই কারণ মৃত্যু এসেছে আকস্মিক। তবে ভার্জিনিয়স যেভাবে তাকে হত্যা করেছেন এবং সেই সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন সংলাপ তা এখানে উদ্ধৃত হল —

"Thus I surrender her into the court (kills her)
of all the Gods, And see proud Appius see,
Although not justly, I have made her free,
And if thy lust with this act be not fed,
Bury her in thy bowels, now she's dead."[১৫]

এইভাবে তাকে আমি সমর্পণে
উপঢ়ৌকন করছি দেবতদের কিচার-কক্ষে, (ভার্জিনিয়াকে হত্যা)
দেখ, দর্পিত আপ্পিয়ুস দেখ!
যদিও ন্যায়ের পথে নয়, আমি তাকে মুক্তি দিয়েছি।
তোমার প্রলুব্ধ কাম এতেও তৃপ্ত যদি না হয়,
এখন সে মরে গেছে, তোমার খাদ্যগহ্বরে তাকে সমাধিস্থ করো।

কাজেই ওয়েবস্টার-এর ভার্জিনিয়ার সঙ্গে মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী নাটকের কোনও সাদৃশ্য আমরা পাব না—নাট্য-গঠন বা চরিত্র-চিত্রণ কোনও স্তরেই। মধুসূদন ওয়েবস্টার-এর নাম না করে ঠিকই করেছেন। চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই ভার্জিনিয়ার মৃত্যু ঘটেছে। নাটকের প্রায় অর্ধেক তখনও বাকি। নাটকটি বস্তুত পিতা কর্তৃক কন্যার প্রাণ বিনাশের নাটকও নয়। এটি রোমক পুরুষদের ক্ষমতা ও আভিজাত্যের সংঘাতের নাটক। সবশেষে আপ্পিয়ুস ভুল স্বীকার করে আত্মহত্যা করে। কিন্তু নাট্যকারের সহানুভূতি থেকে সে বঞ্চিত হয়নি। তার তীব্র কামনা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ভার্জিনিয়াকে ভালোবাসার দহন, ভার্জিনিয়ার মৃত্যুতে শোক এবং নির্দ্বিধভাবে নিজের হাতে শাস্তি গ্রহণ করা — তাকেই এই নাটকের প্রধান চরিত্র করে তুলেছে। আপ্পিয়ুস-ই নায়ক এই ট্র্যাজেডির। তারই প্রকৃত ট্র্যাজেডি ঘটেছে। তার প্রতিদ্বন্দ্বীরাও স্বীকার করেছেন

".....(Appius) died boldly,
Died like a Roman."

এই ছিল রোমক সাম্রাজ্যে প্রশস্তির শেষ কথা-'রোমান-এর মত!' এ জাতীয় কোনও চরিত্র মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'-এ নেই। দুটি নাটক সম্পূর্ণই পৃথক। আপ্পিয়ুস-এর বন্ধুর সঙ্গেও ধনদাসের সাদৃশ্য নেই। আপ্পিয়ুস-এর বন্ধুও এক অহংকারী রোমান। ভার্জিনিয়ুস-এর সঙ্গে শত্রুতা ছিল বলে সে ভার্জিনিয়ুস-এর সর্বনাশ করতে উদ্যত। ধনদাস কেবলই হীনস্বভাব ও অর্থলোভী এক প্রতারক।

ভারজিনিয়ার কাহিনী অবলম্বন করে আরও একটি সুগঠিত ট্র্যাজেডি রচিত হয়েছিল জার্মান ভাষায়। অষ্টাদশ শতকের বিখ্যাত জার্মান সাহিত্যিক এবং শিল্পতত্ত্ববিদ জি.ই. লেসিং ১৭৫৭ সালে লিখেছিলেন এই ট্র্যাজেডি — 'এমিলিয়া গ্যালোটি' (Emilia Galotti)। জার্মান সাহিত্যে প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডিরূপে এই নাটকটি পরিচিত। এ নাটকের চরিত্রগুলির নাম পরিবর্তিত করে দিয়েছেন লেসিং কিন্তু নাটকের ঘটনাবৃত্ত ভার্জিনিয়া-কাহিনীর অনুরূপ।

এই নাটকের নায়ক হল এক ধনী এবং উচ্ছৃঙ্খল যুবক—যে প্রিন্স নামে পরিচিত। তার দুষ্কর্মের সঙ্গীর নাম মারিনেল্লি (Marinelli)। সুন্দরী এমিলিয়াকে তীব্রভাবে কামনা করে প্রিন্স কিন্তু এমিলিয়া এবং কাউন্ট আপ্পিয়ানি (Count Appiani) পরস্পরকে ভালবাসে। এমিলিয়া এবং আপ্পিয়ানি-র বিবাহ-রাত্রে মারিনেল্লি-র প্ররোচনায় এবং ষড়যন্ত্রে এমিলিয়াকে অপহরণ করল প্রিন্স। নিজের অন্তঃপুরে নজরবন্দি করে রাখল এমিলিয়াকে। এমিলিয়া-র পিতা ওডোয়ার্ডো গ্যালোটি (Odoardo Galotti) ভার্জিনিয়ুস এর মতোই আভিজাত্যগর্বী, উচ্চবংশীয়, প্রশস্ত-হৃদয় পুরুষ। লেসিং-এর ভাষায়—"Veteran, proud and unpolished, but upright and brave."। লেসিং-এর এমিলিয়াও সেই আভিজাত্যের গর্ব এবং ব্যক্তিত্বের প্রকৃত মর্যাদার অহংকার বহন করে। আপ্পিয়ানি-র পরিবর্তে চরিত্রহীন এবং লোভী প্রিন্সকে গ্রহণ করতে বাধ্য হওয়া তার কাছে মৃত্যুর অধিক পীড়াদায়ক।

এই পরিস্থিতিতে এমিলিয়ার পিতা এমিলিয়ার সঙ্গে দেখা করতে যান এবং বলেন যে, এমিলিয়াকে হয়ত প্রিন্স-এর হাতেই বন্দি থাকতে হবে তাকে—এর অন্যথা সহজে করা সম্ভব নয়। তখন এমিলিয়া গর্বিত কন্ঠে বলে—"I remain in his hands? Never, my father —or you are not my father."। যে-পিতা লুব্ধ অপহারকের হাতেই কন্যা বন্দিনী থাকবে মনে করেন — তাঁকে প্রকৃত পিতা বলতে দ্বিধাবোধ করেছে এমিলিয়া। এর পরেই সে আত্মহত্যা করবার জন্য বারবার ওডোয়ার্ডোর কাছে ছুরিকা প্রার্থনা করে। "Give me the dagger."। ওডোয়ার্ডো ছুরি দিতে ইতস্তত করলে এমিলিয়ার কণ্ঠে আমরা শুনলাম এক চমকপ্রদ সংলাপ —

"In former days there was a father, who to save
his daughter from disgrace plunged the first
deadly weapon which he saw, into his
daughter's heart — and thereby gave her life,
a second time. But these were deeds of Ancient
times, such fathers exist not now."[১৬]

অনেক পরানো কালে, ছিল এক পিতা, চেয়েছিল অপমান থেকে যেন বাঁচে কন্যা তার; প্রাণঘাতী যে-অস্ত্রটি প্রথম সে দেখেছিল, নিয়াছিল তুলে, বিদ্ধ করেছিল তার তনয়ার

বুকে — এভাবেই দিয়েছিল বাঁচবার অধিকার তাকে
আরও একবার। অনেক প্রাচীন কীর্তি কিন্তু এই সব,
একালে কোথাও নেই সেই সব পিতা।

এই চমৎকার সংলাপ-খণ্ডটির শৈল্পিক তাৎপর্য অপরিসীম। একদিকে প্রাচীন ভার্জিনিয়া-কাহিনীর প্রতি ঋণের স্বীকৃতি দিয়েছেন লেসিং। অন্যদিকে এখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পূর্ববর্তী নায়িকা থেকে এমিলিয়ার স্বতন্ত্রতা। পিতা তাকে মারতে চাননি। সে নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে পিতৃহস্তে মৃত্যু বরণ করবার। তার স্বাধীন নারী-ব্যক্তিত্বের মর্যাদা এভাবেই রক্ষা করেছে সে। লোভীর হাত তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। পিতৃ-নির্দেশে কন্যার মৃত্যু নয়; এখানে কন্যার নির্দেশেই পিতা হয়েছেন কন্যা-ঘাতী।

এমিলিয়া ছুরিকাখাত খেয়ে বলেছে "Oh let me kiss this kind parental hand."। অরপর হত্যাপরাধে পিতার শাস্তি হবে মনে করে সে শেষ জবাবনবিদ দিতে গিয়েছিল যে, সে নিজেই আঘাত করেছে নিজেকে। কিন্তু ওই মহান মুহূর্তে ওডোয়ার্ডো-র চরিত্রের পূর্ণ বিশালত্ব পরিস্ফুট হয়। তিনি বলেন —"Quit not this world with falsehood on thy lips."— পার্থিব প্রাণ ত্যাগ করবার কালে/ওষ্ঠে রেখো না মিথ্যা উচ্চারণ। এইভাবে রক্ষিত হয় পিতা ও কন্যার পারস্পরিক মর্যাদা। এই নাটকেও প্রিন্স-কে এমিলিয়ার অনুরক্ত দেখানো হয়েছে কিন্তু আপ্পিয়ুস-এর মতো সুপরিস্ফুট চরিত্র হয়নি প্রিন্স। মারিনেল্লি-ও ধনদাসের তুলনায় অনেক সম্ভ্রান্ত চরিত্র।

মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারীর সঙ্গে ভার্জিনিয়া বা এমিলিয়া কারোরই তুলনা চলে না। এই দুই নারী—পূর্ণ ব্যক্তিত্বময়ী যুবতী—কৃষ্ণকুমারীর মতো সরল কিশোরী নয়। তাদের মৃত্যুও ঘটেছে ব্যক্তিগত আভিজাত্য-মর্যাদা রক্ষণের জন্য, বিপন্ন দেশ বা রাজ্যের কোনও পরিমণ্ডলগত চাপ ছিল না তাদের উপর। কৃষ্ণকুমারীর ক্ষেত্রে তা ছিল। প্রণয় বিস্তৃত ভূমিকা নিয়েছে দুই নায়িকারই জীবনমৃত্যুর ইতিকথায়। এ-দুটি নাটক প্রণয়-দ্বন্দ্বের ট্র্যাজেডি। কৃষ্ণকুমারীর চিত্তে মৃদু প্রেমের ভাব জাগলেও তার মৃত্যুতে তার প্রেমের বিশেষ ভূমিকা নেই। তার প্রেমের ব্যাপারটা প্রায় সবই মদনিকার কারসাজি। মৃত্যুকালে প্রেমের কথা মনেও পড়েনি কৃষ্ণকুমারীর। "কৃষ্ণকুমারী নাটক" একটি দেশ-দ্বন্দ্বের ট্র্যাজেডি। অথবা মদনিকার ষড়যন্ত্রের কাহিনীও বলা যায় যা ডেকে এনেছে উদয়পুরের সর্বনাশ।

মধুসূদন 'এমিলিয়া গ্যালোটি' বা লেসিং-এর নাম করেননি কোথাও। টড-এর গ্রন্থেও এই কন্যাটির কোনও উল্লেখ নেই। তবু নাটকটি পড়লে মনে হতে পারে মধুসূদন এটি পড়েছিলেন। হয়ত 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'-এর পরিকল্পনায় 'এমিলিয়া গ্যালোটি'-র কিছু চিহ্নও আছে। প্রথমত জগৎসিংহের বিলাসবতীর মতোই প্রিন্স-এর এক রক্ষিতার চরিত্র আছে এখানে যাঁকে প্রিন্স এক সময়ে ভালবাসত, পরে আর বাসে না। তাঁর নাম কাউন্টেস অরসিনা (Countess Orsina)। এই নাটকে অরসিনার কিছুটা সক্রিয়তা আছে। দ্বিতীয়ত, 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'-এ এক সুন্দরীর চিত্র দর্শনে কৃষ্ণকুমারীর ছবি ভেবে প্রলুব্ধ হয়েছে জগৎ সিংহ। লেসিং-এর নাটকে এক চিত্রকর সুন্দরী এমিলিয়ার ছবি দেখিয়েছে প্রিন্সকে। সেই ছবি দেখে এমিলিয়াকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছে প্রিন্স। তবে দুটি নাটকের গঠনে, ভাবকল্পনায় এবং এমিলিয়া ও মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারীর মধ্যে মূলগত পার্থক্যও যে আছে—তা উল্লেখিত হয়েছে আগেই।

পিতার নির্দেশে বা ইচ্ছায় বা পিতার হাতে কন্যার মৃত্যু - এই বীজ কাহিনী মাঝে মাঝেই নানা রূপে দেখা দিয়েছে বিশ্ব-সাহিত্যে। এক একটি বীজ-রূপ নিয়ে রচিত হয়েছে একাধিক কাব্য, নাটক এবং ওপেরা। ইফিগেনেইয়া আর ভার্জিনিয়া বহু ভাষা-মাধ্যমের শিল্প-রূপবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে ঘুরে ফিরে। আমরা এখানে বাংলা ভাষায় লেখা 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'-এর প্রাসঙ্গিকত্রয় বিশ্ব-সাহিত্যের কয়েকটি সুপরিচিত নিদর্শনের উল্লেখ করলাম। মানুষের গড়া সভ্যতার বিবর্তনে নারীর অবস্থান চিরকালই অত্যন্ত জটিল। নারীর শরীর যে নারীরই শরীর এবং জোর করে সে শরীর ভোগ করা, সে শরীরকে গর্ভ ধারণে বাধ্য করা পুরুষের পক্ষে অসম্ভব নয় —এই প্রাকৃত সত্যের কারণে নারীর উপর অধিকার বিস্তার করবার বিভিন্ন প্রক্রিয়া বহুকাল ধরে চালু আছে। তা দিয়েও এক একটা যুগের সভ্যতাকে কিছুটা চেনা যায়। হয়ত তারও একটি রেখাঙ্কন এই প্রবন্ধে কিছুটা পাওয়া যাবে।

১। চৌধুরী মুনীর, তুলনামূলক সমালোচনা, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৯, পৃঃ ২৩৩
২। তদেব, পৃঃ ২২৭-২২৮
৩। Tod James, Annals and Antiquities of Rajasthan, Ed. & Introduction William Crooke, Vol.1, London, Oxford University Press, 1920, p. 539
৪। ibid, p. 539
৫। ibid, p. 536
৬। ibid, p. 540
৭। ibid, p. 540
৮। Euripides, Plays Vol.2, London, Tr by A.S. Way, Introduction by John Warrington, J.M. Dent & Sons, Ed.1956, p. 249
৯। ibid, p. 250
১০। ibid, p. 265
১১। ibid, p. 273
১২। Racine Jean, The Dramatic Works (Vol.2), Tr by Robert Bruce Boswell, London, George Bell & Sons, 1901, p. 194
১৩। Webster John, The Complete works of John Webster. Ed. by F.L. Lucas, Vol.3, London, Chatto & Windus, 1927, p. 208
১৪। Lessing G.E., The Dramatic works of G.E. Lessing, Tr. from German, Ed. by Ernest Bell, London, George Bell & Sons, 1878, p. 224

(অন্য উদ্ধৃতিগুলিও এই গ্রন্থ থেকে গৃহীত)

বিজ্ঞান ও প্রকৃতি ঃ পুরুষ ও নারী

মহাশ্বেতা চৌধুরী

সাধারণত মনে করা হয় বিজ্ঞানের লক্ষ্য সত্যের সন্ধান। সেইমত বিজ্ঞানীকেও সত্যের পূজারী বলে সম্মান করা হয়। 'সন্ধান' কথাটির ব্যবহারে বোঝা যায় সত্য কী তা জানা সহজ নয়। ঋষিবাক্য মন্ত্রে গুহায়াং নিহিতং না হলেও তাকে খুঁজে বার করতে হলে অনেক পরিশ্রম ও জ্ঞানদৃষ্টির প্রয়োজন। ফ্রান্সিস বেকন বিজ্ঞানের নবলব্ধ পদ্ধতি প্রয়োগে মুগ্ধ হয়ে বিজ্ঞানকে জ্ঞানের নতুন দিশা বলে বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতির নবনব রহস্য উন্মোচন বিজ্ঞানকে সাধারণ জ্ঞানের তুলনায় অনেক বেশি মর্যাদামণ্ডিত করেছে। সাধারণ মানুষের কাছে যা আশ্চর্য; বিজ্ঞান প্রকৃতির সেই সব অনাবিষ্কৃত সত্যকে আবিষ্কার করে তথ্যে রূপায়িত করেছে।

বেকন ও পরবর্তী যুগে মিল বিজ্ঞানে প্রকৃতির নানাস্তরে সত্যসন্ধানের উপায় হিসাবে, আরোহপদ্ধতিকে নির্ণিত করেছেন। এই মতে প্রকৃতির ঘটনার জটিল জটাজাল থেকে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের সাহায্যে আরোহযুক্তির মাধ্যমে কার্যকারণ নির্ণয়ের দ্বারাই খাঁটি সত্যের নির্যাস লাভ করা যায়। এই হল তাঁদের বক্তব্যের সারাংশ। অ্যারিস্টটলের অবরোহ পদ্ধতির প্রধান হেতুবাক্য সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের সুযোগ রাখে; বিজ্ঞানে তাই তার স্থান নেই। প্রকৃতির জটিল ঘটনাবলী থেকে সত্য এবং কেবলমাত্র সত্যকে নিরাশিত করার প্রয়াসে বিজ্ঞান শুধু তথ্যের অনুসারী, কোনও পূর্বপ্রচলিত ধারণার অনুগামী নয়। বিজ্ঞানের রোমাঞ্চময় রূপের এই ব্যাখ্যা সনাতন রোমান্টিক মতবাদ বলে আখ্যা পেয়েছে।

এই মতে বিজ্ঞান প্রকৃতিকে জানার প্রয়াসে এমন এক যাদুমন্ত্রের আবিষ্কার করেছে যা নিশ্চিত সত্যের, অনিবার্যজ্ঞানের সন্ধান দিতে পারে। আরোহের ওপর, অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ বস্তুর পর্যবেক্ষণ থেকে সামান্য কনে উপস্থিত হওয়ার পদ্ধতির ওপর বেকনের আস্থা এত অগাধ যে একে এমন এক 'যন্ত্র' ('inductive machine') বলেছেন যা সত্যকে নিরাশিত করতে পারে। প্রকৃতিকে জানা বিজ্ঞানের অপরিসীম ক্ষমতায় সম্ভব। জ্ঞানই শক্তি সুতরাং বিজ্ঞান শক্তিশালী। প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করতে পারলে, তাকে শৃঙ্খলিত করা সম্ভব। তা ঘটলে প্রকৃতির ওপর বিজ্ঞানের তথা মানুষের নিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যাবে। আরোহ এমনই এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যে প্রকৃতির সব রহস্যই প্রকাশিত হবে। নিশ্চিত ও নির্ভুল জ্ঞান মানুষকে আরও শক্তিশালী ও প্রকৃতিকে সেই শক্তির কাছে পরাজিত, বশীভূত দাসে পরিণত করবে। বিজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিকে জয় করার প্রচেষ্টা। 'দুঃসাহসী অভিযান', 'দুর্লঙ্ঘ্য অন্বেষণ', 'প্রকৃতি বিজয়', 'সভ্যতার অগ্রগতি', 'বিজ্ঞানের জয়যাত্রা'—ইত্যাদি নানা উৎসাহব্যাঞ্জক ভাষায়, বিজ্ঞান ও প্রকৃতির এই হারজিতের খেলাকে বর্ণনা করা হয়। নির্ভুল পদ্ধতি, নিশ্চিত জ্ঞান, অবধারিত সত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে সমার্থক হয়ে উঠেছে। এমন কি নিউটন পর্যন্ত বলেন 'আমি আন্দাজে কিছু করি না'। জগৎপ্রকৃতি যেন এক বিশাল যান্ত্রিক ব্যাপার বিজ্ঞান যাকে সম্পূর্ণ জয় করতে সক্ষম এক শক্তি।

বিজ্ঞানের এই অতিগৌরবান্বিত রূপ কিন্তু সত্যিই ঠিক নয়। প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ জানা অর্থাৎ প্রকৃতি সম্বন্ধে নির্ভুল তথ্যলাভ সম্ভব এ কথাও অতিসরলীকরণ ছাড়া কিছু নয়। পূর্বলব্ধ জ্ঞান ছাড়া, পূর্বসূরীদের সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে কোনও জ্ঞানই সম্ভব নয়। কিছু ধারণা না থাকলে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ কি করে সম্ভব? বস্তুত আমাদের সব জ্ঞানই পূর্বলব্ধধারণা, জ্ঞানের দ্বারা অন্তঃপক্ষে প্রভাবিত। বিজ্ঞানী নানা প্রকল্পের (hypothesis) দ্বারাই প্রাকৃতিক জ্ঞান লাভ করে। যদি কোনওটি ভুল প্রমাণিত হয়, তখন নতুন একটি দিক থেকে প্রয়াস ঘটে। তবে নতুন কোনও উন্নততর

(যা বেশি ঘটনাকে ব্যাখ্যা করে ও সংযুক্ত করে) থিয়োরির অভাবে পূর্বতনটিই কাজ চালায়। বিজ্ঞান সত্যের অন্বেষণ, করে। এই অন্বেষণই বিজ্ঞানকে অন্যান্য শাস্ত্র থেকে আলাদা করেছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে বিজ্ঞান নির্ভুল সত্যকে সম্পূর্ণভাবে আবিষ্কার করতে সক্ষম। অর্থাৎ প্রকৃতি বিজ্ঞানের অপরিসীম ক্ষমতার কাছে সম্পূর্ণ পরাভূত হবে—এ বড় দুরাশা। সত্যের সন্ধানী হলেও বিজ্ঞান নিশ্চিতসত্যের নয়, আরও বেশি জ্ঞানের প্রয়াসী। বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটেছে, প্রকৃতির অনেক রহস্যও উন্মোচিত হয়েছে তবু অনাবিষ্কৃত সত্য প্রাকৃতিক ব্যাপারে থাকবেই। বস্তুত, কোয়ান্টাম মতবাদ অনুযায়ী আণবিক স্তরে জড়ের একদিক যদি নির্ণয় করা যায় তাহলে অন্যদিক অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। ক্যামেরায় যেমন একটি বস্তুকে ফোকাস্ করলে অন্যগুলি অস্পষ্ট হয়ে যায়, কিছুতেই সবগুলিকে একসঙ্গে ধরা যায় না, বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ(Scientific realism) অনুসারে প্রকৃতির আণবিক স্তরেও সেরকম ঘটনা ঘটে। অধরা মাধুরী কিছু অংশে অনাবিষ্কৃতই থেকে যায়। সুতরাং সনাতন বিজ্ঞানের দাম্ভিক প্রকৃতিজয় কিংবা অন্তত প্রকৃতিকে 'জানা'র দাবি পুরোপুরি যুক্তিসঙ্গত নয়।

সনাতন ধারণায় বিজ্ঞান ও প্রকৃতির এই বিজেতা-বিজিত জাতীয় সম্পর্ক আবার পুরুষ ও নারীর লিঙ্গভেদের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সত্যিই শুদ্ধবিজ্ঞান নিছক সত্যের অনুসন্ধানী হলেও এর প্রায়োগিক দিকটি অবজ্ঞা করার মত নয়। অজানা প্রকৃতির নানা বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতি মানুষকে আকর্ষণ করেছে শুধুই জ্ঞানের খাতিরে, জ্ঞানের জন্য নয়। বাঁচার প্রয়োজনে তাকে অতিক্রম করার তাগিদেও বটে। শত্রুকে পরাক্রান্ত করতে হলে তাকে জানতেও হবে ভাল করে। পুরুষ-নারী তুলনাটি সুতরাং প্রাথমিকভাবে তত উপযুক্ত নয় কারণ পুরুষের চোখে নারী রহস্যময়ী ঠিকই তবে সে রহস্যভেদ না করতে পারলে আক্ষরিক অর্থে বাঁচাবারও প্রশ্ন ওঠেনা। তবে বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি প্রকৃতি বিজয়ের সূচক এবং সেই অনুপাতে পুরুষের শক্তি ও যুদ্ধং দেহি মনোভাবের সঙ্গে তুলনীয়। নিষ্ক্রিয়তায় অর্থাৎ বাধা দেওয়ার মত শক্তির (ও বুদ্ধির) অভাবেও প্রকৃতি নারীর সঙ্গে তুলনীয়। পৃথিবীতে বিজ্ঞান, পৌরুষ, শক্তি, সক্রিয়তা যেমন একদিকে পরাক্রমশালী প্রতিযোগী; প্রকৃতি, নারী, নম্রতা ও নিষ্ক্রিয়তা ঠেমন অন্যদিকে দুর্বল প্রতিপক্ষ। আগেই বলা হয়েছে 'দুঃসাহসী অভিযান', 'বিজয়', 'দুর্লঙ্ঘ্য অন্বেষণ' জাতীয় বিশেষণে বিজ্ঞানকে বীর আখ্যায় অভিষিক্ত করার মধ্যে শত্রুপক্ষের নারীলুণ্ঠনের মন্ত্রে উল্লাস প্রকাশ পায় এবং তাতে বিজ্ঞান ও প্রকৃতিকে পুরুষ-নারীর পক্ষে প্রযোজ্য সক্রিয় সবল ও নিষ্ক্রিয় দুর্বলের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। বহু নারীবাদ সমর্থক বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে বিজেতা পুরুষের সঙ্গে তুলনা করে নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তারের অহমিকা বলে মনে করেন। সভ্যতা প্রসারের নামে প্রকৃতির নির্ঝির লুণ্ঠন ও শিল্প বাণিজ্যের লোভী থাবার আক্রমণ উপলব্ধি করলে এই কথার যাথার্থ্য বোঝা যাবে। পরিবেশ সচেতনতা তাই প্রকৃতিকে বিজ্ঞান ও তার সহচর কারিগরী বিদ্যার দুর্দম লালসা থেকে বাঁচাবার প্রচেষ্টা। নারীবাদী আন্দোলন সাধারণত তাই 'প্রকৃতি/পরিবেশ বাঁচাও' সংগ্রামে স্বাভাবিকভাবেই সোচ্চার। উত্তর ভারতের 'চিপ্‌কো' আন্দোলন পরিবেশ ও নারী আন্দোলনের এক অপূর্ব সমন্বয়।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় অভিভূত হবার রোমান্টিকতা অবশ্যই মূঢ়তা, বস্তুত, পার্থিব বিষয় সম্বন্ধে আমাদের কোনও জ্ঞানই অনিবার্যভাবে সত্য নয়। বিজ্ঞানের অনুসন্ধান পদ্ধতি যুক্তিমূলক সন্দেহ নেই, তার ওপর আমাদের অগাধ আস্থাও যুক্তিগ্রাহ্য তবু জগৎ সম্বন্ধে কোনও ধারণাই প্রশ্নাতীত নয়। গাণিতিক/যৌক্তিক সত্য ছাড়া সব ধারণাই সংশয়যোগ্য। বিজ্ঞান জগৎ সম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গত ধারণার অন্বেষণ করে ঠিকই, তবে তার প্রায়োগিক সাফল্য ধ্রুবসত্যের নির্দেশ দেয় না; জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসেও এ কথার সাক্ষ্য মেলে। আজ যাকে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ধারণা বলে মনে হয় কাল তা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়, আজ যা অজানা কাল তা সাধারণজ্ঞান হয়ে ওঠে। 'সূর্য ওঠে', 'সূর্য ডোবে' প্রচলিত বাক্যবন্ধ হলেও তা যে বৈজ্ঞানিক ভাবে সঠিক তথ্য নয় একথা এখন প্রায় সবাই জানে। আবার বৈজ্ঞানিক ভাবে অসত্য প্রমাণিত হয়েছে এমন অনেক তত্ত্বও দৈনন্দিন জীবনে কার্যকরী। বৈজ্ঞানিক ভাবে কার্যকারণ সম্বন্ধ নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি অথচ নিয়ত পরম্পরা রয়েছে এমন বিষয়ে আস্থা রাখা অযৌক্তিক তো নয়ই বরং প্রাত্যহিক জীবনকে সহজ করে। তমাকের সঙ্গে ফুসফুসের ক্যান্সার রোগের মধ্যে নিশ্চতভাবে কোনও কার্যকারণ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়নি তবু তমাকবর্জন সূক্ষ্মজীবনযাপনের পক্ষে অনুকূল। ভেষজ বা অন্যান্য বহু সনাতন ওষধির কার্যকারিতা ও সাফল্য এখন বহুলভাবে স্বীকৃত। যার ফলে মূলধারার পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের বিকল্প ওষধি (alternative medicine) সম্বন্ধে অবজ্ঞা ও অগ্রাহ্যের মনোভাব এখন পরিবর্তনের পথে।

বিজ্ঞানের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার এই পালাবদল স্বীকার করলে তার সনাতন রূপটির বদল ঘটে। অকলঙ্ক ধ্রুব সত্যের দিশারী বিজ্ঞান প্রকৃতিবিজেতা, দুর্দম পৌরুষের প্রতীক—এই ভাবমূর্তি আর থাকে না। বস্তুত গত তিন দশক থেকে বিজ্ঞানদার্শনিকদের অনেকেই বিজ্ঞানকে সত্যসন্ধানের বা প্রকৃতিকে জানার পবিত্রপ্রয়াস বলে মনে করেন না। বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় সামাজিক ক্ষমতা ও সম্মানের জোরে তত্ত্বপ্রতিষ্ঠা করেন। তত্ত্বপ্রতিষ্ঠার মূলে সত্যের সন্ধান তত নয় যতটা আছে ক্ষমতগ্রাস ও কায়েমী রাখার স্বার্থ। 'প্রচার, মিথ্যা, দন্ড' ইত্যাদির দ্বারা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়-সত্য বা যুক্তির জোরে নয়। এই উক্তি বিজ্ঞানবিরোধী, বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক পল ফায়রাবেন্দের। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের অহমিকা

ও দাবি যে সঙ্গত নয়, তীব্র ভাষায় তার ইতিহাস দ্বারা সমর্থিত বিবরণ আছে তাঁর Against Method গ্রন্থ এবং অন্যান্য রচনায়। সামাজিক কারণে নাকি নির্ঝে যুক্তির জোরে বিজ্ঞান তত্ত্বের সন্ধান করে–এ বিতর্ক বহু আলোচনায় প্রায় তিক্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। বিজ্ঞান সমাজ-নিরপেক্ষ যুক্তির অনুসারী কি না (যদিও আমি মনে করি বিজ্ঞান তাই) এ বিতর্কে না গিয়েও এ কথা বলা যায় যে এই শতাব্দীতে কোয়ান্টাম থিয়োরীর কথা মানলে অন্তত পারমাণবিক স্তরে বস্তুর অনির্ণেয় প্রকৃতি বোঝা যায়। হাইসেনবের্গ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণাতীত বলেই বর্ণনা করেছেন। পরমাণবিক স্তরে ব্যাপারটি ক্যামেরায় কোনও বস্তুকে ফোকাস করার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। একটি বস্তুকে ফোকাস করলে যেমন অন্যগুলি অস্পষ্ট হয়। সেইরকম বস্তুর একটি দিক নির্ণয় করা গেলে অন্যদিক অজ্ঞাত ও অনিয়ন্ত্রিত থেকে যায়। সুতরাং কোনও সার্বিক ও নিরপেক্ষ মানদণ্ড দিয়ে বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় সম্ভব নয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় বিজ্ঞান, প্রকৃতি ও তাদের সম্পর্ক লিঙ্গভিত্তিক–নারীবাদের এই বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয়। সে আলোচনার আগে (নারীবাদীদের কাছে প্রকৃতি ও নারীবিরোধী বলে আক্রান্ত), বিজ্ঞানের সনাতন ভাবমূর্তির বিরুদ্ধে দু'চারটি কথা :

প্রথম, জাত্য-জেয়, মন/প্রকৃতি ইত্যাদি জরাজীর্ণ পার্থক্য দার্শনিকেরা নিজেরাই বর্জন করেছেন। জগৎ সম্বন্ধে যান্ত্রিক ধারণা নিউটনীয় দেশ কাল গতি 'ইস্কাবন, চিড়েতন, হরতনের' মত 'অতি সনাতন ছন্দে' নর্তন করে না। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের চৈতন্যময় জগৎ নিউটনবর্ণিত সুনিয়ন্ত্রিত জগৎ থেকে অনেক দূর।

দ্বিতীয়, বিজ্ঞানের এই ভাবরূপ প্রকৃতির ওপর আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণকে উৎসাহিত করে। প্রকৃতির নির্বিচার লুণ্ঠন, বিজ্ঞানের খাতিরে পশু ও মানুষের শোষণ, পরিবেশের ক্রমবর্ধমান ক্ষয়ক্ষতি ও দূষণ ইত্যাদি বিজ্ঞানের আগ্রাসী পরাক্রমের বলিদান। প্রকৃতির দুর্বলতর শ্রেণীকে (প্রাণী, দরিদ্রদেশ ও তার অধিবাসী, নারী ইত্যাদি) নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষায় পুরুষোচিত আধিপত্য স্থাপনের গতানুগতিক ভাবরূপ দেখা যায়। প্রকৃতিকে বন্দি করার নেশায় তা উদ্দাম। দৃষ্টান্ত হিসেবে দরিদ্রদেশে নতুন ওষুধ বা অন্যান্য রাসায়নিক বা তেজস্ক্রিয় বস্তু নিয়ে পরীক্ষণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যা অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিকর এবং নানা ব্যাধি বা অন্যান্য দুর্যোগ ডেকে আনে। দরিদ্রতর দেশের মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে বাণিজ্য পরীক্ষা নিরীক্ষার আর এক বীভৎস লালসার দৃষ্টান্ত। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মদ্দাবী প্রকৃতিবিজয়ের পরিচয় মেলে এই ধরণের অজস্র শোষণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে।

সাধারণভাবে প্রকৃতিকে জানার অর্থাৎ জয় করার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। নারীবাদ সমর্থকরাই প্রথম বিজ্ঞানের এই দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধে নারীবাদী যুক্তি উপস্থিত করার আগে বিজ্ঞান ও লিঙ্গ বিষয়ে কিছু প্রচলিত ধারণার আলোচনা প্রয়োজন, অন্তত নারীবাদীরা যেগুলিকে ধরে নিয়ে খণ্ডণ করেছেন। সেগুলি এইভাবে বলা যেতে পারে :–

(১) বিজ্ঞানচর্চায় এমন কিছু জ্ঞানগত ক্ষমতা ও প্রতিভার প্রয়োজন যথা গাণিতিক ও যান্ত্রিক পারদর্শিতা–নারীর মধ্যে যা বিরল।

(২) বিজ্ঞানচর্চার পক্ষে অত্যাবশ্যক যুক্তিবাদী মনোভাব, নিরপেক্ষ ইত্যাদি গুণ শুধুমাত্র পুরুষদের মধ্যে থাকে।

(৩) বিজ্ঞান গবেষণার চরম উদ্দেশ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সামরিক প্রয়োগ, নারীদের যা আকর্ষণ করে না। এসব যে শুধু প্রচলিত ধারণা তা নয়। 'বিজ্ঞান পুরুষের স্থান' এমন ধারণার 'বৈজ্ঞানিক ভিত্তি' আছে–এরকম বক্তব্যও যথেষ্ট সাধারণ। শুধু তাই নয়, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব (Theory) গুলির রন্ধ্রে রন্ধ্রেও পুরুষতান্ত্রিকতার পরিচয় মেলে। Molecular Biology-তে 'master molcule'-এর সন্ধান করা হয় যা কোষগত ক্রিয়া প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। নারীবাদী সমালোচনার মূল বক্তব্য হলঃ বৈজ্ঞানিক গবেষণার লক্ষ্য আধিপত্য বিস্তার, এবং নিয়ন্ত্রণ ও পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

প্রথমত সাধারণ স্তরে বিজ্ঞান ও পুরুষতান্ত্রিক উদ্দেশ্য একই। প্রকৃতি বিজয় ও নিয়ন্ত্রণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীকে বশ্যতা স্বীকার ও শাসনের সঙ্গে তুলনীয়। জড় প্রকৃতিই শুধু নয়, মানবদেহ, জীবদেহ নিয়ে বিজ্ঞানের নামে পরীক্ষা নিরীক্ষা, নিয়ন্ত্রণ চলে এবং গবেষণার ফলে অনেক সময় ব্যর্থতা এমনকী দুর্যোগও ঘটে যায়। এদিক থেকে পিতৃতান্ত্রিক শাসনের সঙ্গে গবেষণার মিল আছে, ব্যক্তির চেয়ে যেখানে সামাজিক লক্ষ্যই প্রধান। আদর্শ বিজ্ঞান আর প্রকৃত বিজ্ঞানচর্চা এক নয়।

দ্বিতীয়ত বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নারীবিষয়ক সমস্যার বৈজ্ঞানিক গবেষণার পুরুষতান্ত্রিক ধারণা/সংস্কার নানারকম বাধার সৃষ্টি করে। নারীদেহবিষয়ক গবেষণা-নারীবাদীদের মতে যথেষ্ট গুরুত্ব পায় না। প্রজননজনিত সমস্যা, নারী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিষয়ক বহু অসুবিধার এখনও সার্থক চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়নি। সমস্যার নির্বাচন খুব গুরুত্বপূর্ণ কেন না বৈজ্ঞানিক গবেষণার সিংহভাগ অর্থই সামরিক-খাতে ব্যয় হয়, যে অবশিষ্টাংশ থাকে তাতে বাকি সব সমস্যার প্রতিবিধান করা হয়।

পুরুষের একাধিপত্যের আরেক নিদর্শন হল বিজ্ঞানচর্চায় নারীর যথেষ্ট প্রতিনিধিত্বের অভাব। বিশ শতাব্দীর শেষভাগেও বৈজ্ঞানিক সমাজে নারী এখনও সংখ্যালঘু। যদি বা নিম্নস্তরে মেলে উচ্চপদে বা স্বাধীনসিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মত অবস্থানে নারী এখনও বিরল।

নানা সামাজিক কারণে নারী ও পুরুষের জ্ঞানগত ভঙ্গি ভিন্ন।

নারীর পর্যবেক্ষণে বিচ্ছিন্নতা বা নতুনত্বের চেয়ে সম্পর্ক ও পারম্পরিকতা বেশি গুরুত্ব পায়। দৃষ্টান্তঃ দেখা গেছে একটি ছোট ছেলের কাছে 'আমবুল্যান্স' শব্দটি গাড়ি, লরি, ট্রাক ইত্যাদির অনুষঙ্গী, অন্যপক্ষে একটি ছোট মেয়ের কাছে তা হাসপাতাল, নার্স, রুগী, ডাক্তার ইত্যাদির কথা মনে করায়। জ্ঞানগত বিষয়ে লিঙ্গভেদসূচক গবেষণায় এই বৈষম্যমূলক মনোভাবের পরিচয় সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় বলে মনে করেন নারীবাদীরা। যেমন পুরুষ ও নারীর দৃষ্টি ও স্থান বিষয়ক তথ্যজ্ঞাপন (Visuospatial information) বিষয়ে গবেষণায় (E. Fox-Keller (edtd.), Feminist Approaches to Science-এ Blier এর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। H. Seigel, "Genderized Cognitive Perspectives and the Redefinition of Philosophy of Education", Teachers College Report 85, 1983) পুরুষের তথ্যকে নারীর চেয়ে উন্নততর বলে মনে করা হয়। এ কথা ঠিক যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা অতীতে বহু বৈষম্যমূলক সংস্কারকে সমর্থন করেছে। নাৎসী সমাজে ইহুদি ও কবিবিদ্বেষী সমাজে কালোদের 'বৈজ্ঞানিক কারণ' দেখিয়ে বুদ্ধিমত্তার পরিমাপে 'নিম্নতর মস্তিষ্কক্ষমতার অধিকারী' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অতীতে বেকন ও পরে অবরোহবাদী/যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী বর্ণিত বিজ্ঞানের সনাতন রোমান্টিক মতবাদ সম্বন্ধে নারীবাদী আপত্তিগুলি যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক ও যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ নেই। তবে বিজ্ঞান সম্বন্ধে অকারণ ভ্রান্তিবিলাসও আজ নেই। বর্তমান আলোচনার প্রথমদিকে এই সম্বন্ধে কিছু বলা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব (Theory) যে অভ্রান্ত নয়, এবং নিশ্চিত না হলেও জগৎ সম্বন্ধে অনেক বিশ্বাস যে গ্রহণযোগ্য এ কথা বিজ্ঞান দার্শনিকেরা সবাই মানলেন। আর যদি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সংশয়যোগ্য (fallible) হয় তাহলে বিজ্ঞানের সনাতন প্রকৃতিবিজয়ী রূপের উদ্ভাসে বিষ্ণুটা ভাঁটা পড়বেই। অর্থাৎ বিজ্ঞানকে পরাক্রমশালী বিজয়ী বীরপুরুষের ভাবমূর্তিতে কল্পনা করা যাবে না। সেক্ষেত্রে নারীবাদী তীব্র প্রতিবাদ তখন অকারণ ও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। কারণ প্রকৃতিকে যদি সম্পূর্ণ জানা না যায় তাহলে নারীর বশ্যত্বস্বীকারের মতো প্রকৃতিকে শৃঙ্খলিত ও শেষপর্যন্ত ধর্ষিত করার উপমাও সেক্ষেত্রে অনুপযুক্ত হবে।

বিজ্ঞানের আরও একটি পর্যায়ে নারীবাদী যুক্তি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় ব্যাপারে বিজ্ঞান ও তার প্রযুক্তি কৌশলের অভিযান গর্ব করার মন্ত্রে সফল হয়েছে। অর্থাৎ আকাশ, মাটি এমনকী পাতাল অভিযান চালিয়ে প্রকৃতিকে নিজস্বার্থে বন্দি করা হয়েছে। ক্রমাগত ধর্ষণে তার সম্ভার দূষিত ও প্রায় নিঃশেষিত করে উল্লাস প্রকাশও করা যেতে পারে। আমাদের চেনাশোনা মাঝারি মাপের পৃথিবী সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা যদি বা দিগ্বিজয়ের দাবি করতেও পারে, অতিবিশাল সৌরজগৎ বা অতিক্ষুদ্র পরমাণুজগতের ক্ষেত্রে কিন্তু এ গর্ব চলে না। প্রকৃতি সেখানে এখনও পরাক্রান্ত প্রতিযোগী। যেখানে সে শুধু অজেয়শক্তিই নয়, তার অনন্ত রহস্য নির্ণয় করা কঠিন। বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের এবং ক্ষুদ্র গ্রহবীসীর পক্ষে তার অনন্ত সম্ভবনার সম্পূর্ণ পরিমাপ দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। নিউটনের যান্ত্রিক ব্যাখ্যায় যে রূপ পাওয়া যায় এই শতাব্দীতে আইনস্টাইনের আপেক্ষবাদ দেশ কাল গতি সম্বন্ধে সনাতন ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে সেই তত্ত্ব খণ্ডণ করেছে। আধুনিক বিজ্ঞান বদ্ধ পৃথিবীর বন্দিদশা থেকে ('From The Closed World to The Infinite Universe') অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দরজা খুলে দিয়েছে।

পরমাণবিক স্তরে প্রকৃতির খেলা আরও বিচিত্র। আগেই বলা হয়েছে ক্যামেরায় ফোকাস করার মতো বস্তুর একদিক নির্ণয় করা গেলে অন্যদিক অস্পষ্ট ও অনির্ণেয় থেকে যায়। কোনও নির্দিষ্ট সূত্র দিয়েই সেখানে অণুপরমাণুর অগাধ রহস্য সম্পূর্ণ ভেদ করা যায় না। প্রচণ্ড শক্তির আধার হলেও আণবিকস্তরে গতি, শক্তি, ভর, আয়তন সম্বন্ধে প্রচলিত বৈজ্ঞানিক সূত্র বা নিয়মকানুন অচল। যেমন পার্থিবস্তরে একটি বস্তুর বিভাজন করলে অংশগুলি সমগ্র বস্তুটির সমান বা বড় হতে পারে না। পরমাণবিকস্তরে কিন্তু সেই সূত্র কার্যকরী নয়। প্রকৃতির নানা রহস্য এই স্তরে অপরিমেয়, সুতরাং বিজ্ঞানের অপ্রতিহত অভিযানের দাবি এখানে অবৈধ। যদি তাই হয় তাহলে নারীবাদ বর্ণিত বিজ্ঞানের কাছে প্রকৃতির শৃঙ্খলায়িত বন্দিনীরূপের আলোচনাও অবান্তর। আর বিজ্ঞান-দর্শনের ভেতর থেকেই যদি নিয়ন্ত্রণবাদ খণ্ডনের যুক্তি মেলে তাহলে বস্তু-কল্পিত উপমায়িকের সাহায্যে বিজ্ঞানের চিরাচরিত স্পর্ধিত ভূমিকার ওপর আঘাতও অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। বিজ্ঞানের প্রচলিত ব্যক্তিনিরপেক্ষ, সত্যনিষ্ঠ ও যুক্তিনিষ্ঠ রূপ যে ঠিক নয় কোয়ান্টাম মতবাদ সেই দিকে নির্দেশ করে। বিজ্ঞান বস্তুনিষ্ঠ না ব্যক্তিনিষ্ঠ এ বিতর্ক আজও অমীমাংসিত, তবে এই প্রশ্ন তুলে কোয়ান্টাম মতবাদীরা বিজ্ঞানের প্রথাসিদ্ধ বস্তুনিষ্ঠ সত্যসন্ধানী (অর্থাৎ প্রকৃতিজয়ী) রূপ যে অবিসংবাদিত নয় এই বিষয়টিকে দার্শনিক তর্কের পর্যায়ভুক্ত করেছে।

নারীবাদী যুক্তি বিকল্প জ্ঞানতত্ত্বের দাবি করে, অর্থাৎ দাবি করে যে সনাতন বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানতত্ত্বের পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি জগৎপ্রকৃতিকে জানার জন্য একমাত্র পথ নয়। নারীর দৃষ্টিকোণ (শিশু, দরিদ্র বা কালোদের দৃষ্টিকোণও তহলে) ভিন্ন হতে পারে। সুতরাং প্রকৃতিকে জানার কোনও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নেই। ভিন্ন perspective থেকে প্রকৃতির অর্থাৎ পার্থিব বস্তু ঘটনা, সমস্যা ইত্যাদির ভিন্ন ভিন্ন রূপ হতে পারে। শেষ উক্তিটি কিন্তু নিছক নারীবাদী জ্ঞানতত্ত্বেরই সমর্থক নয়, কারণ কেন নারীবাদী দৃষ্টিকোণ বিজ্ঞান তথা বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হবে এ প্রশ্নের

সন্তোষজনক উত্তর তাঁদের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা বা প্রচারের জন্য আবশ্যিক।

বৈজ্ঞানিক সমস্যার নির্বাচনে নারী সংক্রান্ত বিষয়ের অবহেলা, বিজ্ঞানসমাজে নারীর পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্বের অভাব এগুলি অনস্বীকার্য, নানা সামাজিক কারণে 'পুরুষ নারীর তুলনায় বেশি যুক্তিক এবং বিশ্লেষণী ক্ষমতার অধিকারী' ও 'নারী বেশি আবেগ তাড়িত'—ইত্যাদি নানা ভ্রান্ত ধারণার লালনপোষণ বহুদিন ধরে চলে এসেছে। নারীবাদী জ্ঞানতত্ত্ব তাই শুধু প্রতিবাদীই নয়, এইসব ধারণার অলীক 'বৈজ্ঞানিক ভিত্তি'কেও খণ্ডন করার যথার্থ সৎপ্রচেষ্টা।

বিজ্ঞানের অতিগৌরবান্বিত সত্যের দিশারী রূপ অথবা 'সত্য, নিরপেক্ষ যুক্তি বা বৈধ অনুসন্ধান পদ্ধতি বলে কিছু নেই' জাতীয় নয়া-নৈরাশ্যবাদ দু'টির কোনওটিই গ্রহণ না করেও বিজ্ঞান ও লিঙ্গ প্রশ্নটির (যাকে জ্ঞানতাত্ত্বিক সুসান হ্যাক 'বিজ্ঞানের লিঙ্গ' না বলে 'লিঙ্গের বিজ্ঞান' নামক সমস্যা বলে অভিহিত করেছেন) বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। বিজ্ঞানকে পুরুষজাতীয় মূল্যবোধে ভারাক্রান্ত সামাজিক নির্মাণ বলা হলেও, কেন বিজ্ঞানের নারীবাদী ব্যাখ্যা বেশি গ্রহণযোগ্য হবে—এ প্রশ্ন বৈধভাবে করা যেতে পারে। তাছাড়া বিজ্ঞান সম্বন্ধে 'নিরপেক্ষ', 'যুক্তিগ্রাহ্য' 'সত্যের সন্ধানী' ইত্যাদি বিশেষণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজের আরোপ হলে জগৎ সম্বন্ধে আমাদের নানা ধারণা/বিশ্বাসের পার্থক্য কি মাপকাঠিতে বিচার করা যাবে সেটিও বৈধ সমস্যা। সত্য ও যুক্তিনিষ্ঠাকে বাদ দিলে আমাদের সব ধারণাকেই কি সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করা হবে? এ তো-ঠিক যে সব ধারণাই যুক্তিসঙ্গত নয়, সব বিশ্বাস নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে এক নয়। যে কোনও বিকল্প জ্ঞানতত্ত্বকে—বিশেষ করে নারীবাদী জ্ঞানতত্ত্বকে এই সব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। প্রশ্নগুলির সন্তোষজনক উত্তরই শুধু নয় তার সঙ্গে জড়িত সমস্যাগুলিরও পর্যাপ্ত আলোচনা ও সমাধান প্রয়োজন। কেন 'অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ বেশি বিশ্বাসযোগ্য তাও প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নারীবাদী দৃষ্টিকোণ কেন বিজ্ঞানের (মূলত পুরুষ) দৃষ্টিভঙ্গির মতো প্রকৃতিকে কলুষিত/নিয়ন্ত্রিত করবে না তার উত্তরও দেওয়া প্রয়োজন। আশ্চর্যের ব্যাপার নোবেল বিজয়ী (যাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার স্বীকৃতি বহু দেরিতে ঘটেছে) বারবারা ম্যাকলিনটক DNA-র Master Molecule ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটালেও 'প্রকৃতি আমাদের কাছে কথা বলে', 'সত্যের অনুভূতি' এই ধরণের বস্তুবাদী উক্তি করেছেন যা নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা সনাতনবিজ্ঞান বিষয়ে সযত্নে বর্জন করেছেন।

এ কথা ঠিক যে বিজ্ঞানের নারীবাদী ও অন্যান্য সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তা হল বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর প্রতি অটল আস্থা যার ফলে বিজ্ঞানচর্চার সম্পূর্ণ ধারাই তর্কাতীত বা প্রশ্নাতীত হয়ে পড়ে। কোনও চর্চা বা ধারার প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা স্বাস্থ্যকর লক্ষণ নয়। তবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বা বিজ্ঞানীর প্রতি আস্থা (যাকে কোনও কোনও তাত্ত্বিক বিদ্রূপ করে ধর্মানুষ্ঠান ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির সঙ্গে তুলনা করেছেন) কিন্তু নিছক পৌরুষের শক্তিমত্তা বা বুদ্ধিমত্তার প্রতি মুগ্ধতার পরিচায়ক নয়। এই আস্থা বিজ্ঞানের যুক্তি ও পদ্ধতির প্রতি আস্থা। কারণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তথ্য ও নিরপেক্ষ যুক্তির প্রতি সংবেদনশীল। অবশ্য ইতিহাস বা গোয়েন্দা কাহিনীও তথ্য ও যুক্তির ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং তথ্য ও যুক্তি বিজ্ঞানের একান্ত বৈশিষ্ট্য নয়। নারীবাদী বা অন্যান্য সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাছাড়া সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিজ্ঞান আমাদের বহু প্রত্যাশাই পূরণ করতে পারেনি। 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি' আদর্শ পদ্ধতি অর্থাৎ যা হওয়া উচিত তাকে বোঝায়। যদিও বাস্তবে বিজ্ঞান প্রায়ই সেই আদর্শ থেকে ক্ষিপ্ত হয়। এই অভিযোগও অনেকাংশে ঠিক যে বিংশশতাব্দীর শেষভাগে বিজ্ঞান পেশাদারী প্রাতিষ্ঠানিক এমন কি বহুমাত্রায় ব্যবসায়িক হয়ে উঠেছে। গ্যালিলেও-নিউটন-আইনস্টাইনের আদর্শ থেকে আজ তা বহুদূর। বিজ্ঞান সম্প্রদায়ের ভেতরেও নানা সমস্যা ও চাপের সৃষ্টি হয়েছে। গবেষণার আকাশচুম্বী ব্যয়, রেষারেষি, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক নানা প্রভাব বিস্তর, প্রশাসনমূলক কার্যক্রমের চাপ, সরকারি, বেসরকারি শক্তির নানা বিক্রিয়া ইত্যাদি বিজ্ঞানের নিরলস সাধনার পরিপন্থী। তবে এসব বাধা ও সমস্যা তো সবক্ষেত্রেই আছে। কবি, শিল্পী কিংবা দার্শনিক কি আজ সনাতন প্রথায় সুন্দর ও সত্যের পূজারী? তাদেরও তো নানা সামাজিক সমস্যার চাপের মুখোমুখি হতে হয়। সামাজিক নির্মাণ হলেও বিজ্ঞানের প্রতি আস্থা ও সম্মানসূচক মনোভাব নিছক অহেতুক নয়। অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় এ পর্যন্ত বিজ্ঞানই সবচেয়ে সফল কারণ বিজ্ঞানের অনুসন্ধানপদ্ধতি অনেক দোষত্রুটি সত্ত্বেও তথ্যভিত্তিক এবং ব্যাখ্যামূলক। জগৎ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ও বিশ্বাসের দৃঢ়ভিত্তির নোঙর তথ্য ও ব্যাখ্যার ভূমিতে ফেলা হয় বলেই বিজ্ঞান এখনও সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠান। নারীবাদ ও অন্যান্য বিকল্প জ্ঞানতত্ত্বকে বিজ্ঞানের চেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্য হতে হলে বিজ্ঞানের দোষত্রুটি যে সেখানে নেই সেকথা প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। নইলে বিজ্ঞানবিরোধী শ্লোগান ফাঁকা আওয়াজে পর্যবসিত হবে।

স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নুইয়র্ক এবং পিট্সবের্গে প্রদত্ত বক্তৃতার রূপান্তর।

ঈশেন

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

বাড়ির দুপাশে দুটুকরো বাগান। সেঁকুলগাছের বেড়া। ঘেঁষঘেঁষ সবুজ রোঁয়াওঠা কুলপাতায় আর তার জিরজিরে কাণ্ডের জন্যে ভেতরে চোখ চলে না। সদাসর্বদা অন্ধকার। সে অন্ধকারে আর বড়গাছের টোপা, ঝরা, পাতার জলে চারাগাছ বাঁচে না। ওই বেড়া ভেদ করে, আলোর দুঃখ কী, যে গিয়ে দাঁড়াবে? হয়ত সেজন্যেও বাগানে পাঁশ পড়ে। পাঁশ পড়ে পাহাড় তৈরি হয়। সে পাঁশটিবি জুড়ে মানের জঙ্গল। মান আর ওল। কেলেকচুও আছে। শোলাকচু নেই, ওদের জন্যে এককোমর জল চাই। পাশে জুব্বারের ডোবা ডুবলে তখন এ বাগানে অস্থায়ী জল, ঢেউ-এর মতন। ইস্টিশানে যারাই যায়, পা ধুতে জুব্বারের ডোবায় সবাই। তালগুঁড়িতে পা ঘষে, পিঙ্গী কিংবা দাশনিক কি আজ সনাতন প্রথায় সুন্দর ও সত্যের পূজারী? পাঁক-কাদা-গদ তোলে। এবং আশ্চর্য এ-ডোবার বুক পর্যন্তই বেলেমাটি। এই গদ-কাদার পচা দেশে এমনটা হওয়া আশ্চর্যের বৈকি! ঈশান পন্ডিত অবিশ্যি অন্য কথা বলে। তার ধারণা, একসময় এখানেই জগীরথীর মূল ধারাটি ছিল। টুঁচুঁকুঁড়া নদীজলে ভেসে বেড়াত ডিঙিনৌকা। আর তাই যদি না হবে, সামনের বাদা পেরুলেই আজকের নেয়েপাড়া এল কোত্থেকে? নেয়ে মানে নাইয়া—নাবিক থেকে নরম হয়ে, ছোট হয়ে—কথাটি একটি পরিপূর্ণ সমাজ তৈরি করে বাদা ভেঙে বসেছে!

ঈশান পন্ডিত এমন অনেক কথাই বলে, সবকিছু ধর্তব্যের মধ্যে নিলে চলেও না।

এই বাড়ি, যার দুপাশে দুটুকরো বাগান—সবই ঈশান পন্ডিতের। দুপুরুষের বাস। বাড়ি বাগান, তার পেছনে পুকুর, তার পেছনে অল্পস্বল্প ধানীজমি। ভাগে দেওয়া আছে। বাড়ির ভেতরে উঠোন, উঠোনের ভেতরে গোলা আর ধানের মড়াই—সব আছে। গোয়াল আছে, গাই আছে। খাঁটি দুধের জন্যে কারু দুয়ারে ধর্না দিতে হয় না। মানুষ না হলে বাঁটে মুখ দিয়ে পালান-ভরা দুধ টেনেই নিত! সে ছাড়া আর খাওয়ার লোক কেউ নেই, সে আর তার গাই-এর ধবলা বাছুরটা। পুকুরে মাছ আছে, গোলায় আছে ধান। একটা মানুষের হয়ে-হয়ে উপচে পড়ে। পাড়পড়সি চেয়ে খায়। ঈশান মানুষ ভাল, মনও পন্ডিতের। সুদূর বয়েস হয়েছে বলেই একটু বা খিটখিটে। তা না হলে-সব ভাল বুড়ের। বলত ঈশানী। পন্ডিতের বউ আজ বছর পাঁচ ছয় হল গত হয়েছে। সে গেছে না বুড়োকে মেরে গেছে! এখন বুড়ো একা। ব্রহ্মদত্যির মতন খটাখট খড়ম বাজিয়ে বাজিয়ে বাগানময় ঘোরে। রাতভিতের তোয়াক্কা করে না। সবসোজা প্রায় সাত ফুট উঁচু কৃষ্ণকান্ত পন্ডিত ডাল বায়, সাঁতার কাটে, মাটি কোপায় আর নিত্যক্ষণ গাছের নিচে ঘুরঘুর করে। পাতার পেছন থেকে

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর লেখকজীবন শুরু করেছিলেন গদ্য লেখা দিয়ে। তারপর তিনি খ্যাতি অর্জন করেন পদ্যকার হিসাবেই। এই খ্যাতি যখন তাঁর তুঙ্গে তখন মাঝে মধ্যে তিনি যে উপন্যাস লেখায় মনোযোগী হতেন—এখবর অনেকেরই জানা। কিন্তু কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় যে ছোটগল্পও লিখেছেন—এখবর তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের বাইরে খুব বেশি প্রচারিত নয়। চতুরঙ্গের বর্ষ ৩৪ বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৯ সংখ্যায়—ছাপা হয়েছিল এরকম একটি ছোটগল্প। এই দুর্লভ নমুনাটি এখনকার পাঠকদের গোচরে আনার জন্য বর্তমান সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হল।

মাকড়সার বাসা ভাঙলে পাতা ছিঁড়ে-ছুঁড়ে ফালে, গাছের গায়ে পিঁপড়ের বাসায় আগুন দেয়, গোড়া খোঁচে, জল ঢালে—এইসব কত কী করে। কার সঙ্গে কথা বলে যেন, মনে মনে! কার সঙ্গে? কাউকে অকস্মাৎ দেখলে চোখ পাকিয়ে তেড়ে আসে। ভাবটা এই, আমার নির্জনতাকে তুমি ভাঙতে এসেছ? দেখাচ্ছি মজা, মাথা ভেঙে একেবারে দুফাঁক করে দেব, হারামজাদা। আমার সঙ্গে এসেছ ইয়ার্কি করতে? নাম জানো আমার? আমার নাম ঈশেন। রাঙা করমচার মতন চোখ। যেমন কালো, তেমনি কদাকার। সেই কালো পরিপ্রেক্ষিতে ভেদ করে নদীর মতন বা বলা ভাল বিদ্যুৎরেখার ভাবে পৈতে।

আবার কখনও সদয়। শব্দ শুনেই পেছন ফেরে, কী চাই?

—আজ্ঞে মাষ্টার একপালি চাল।

—আমার বাপের চালকল আছে? পেয়েছ কি? সেই যে গতমাসে নিয়েছিলে দু পালি। তা শুধেছ?

—না মাষ্টার।

—তবে?

—খেতে পাচ্ছিনে।

—খেতে পাচ্ছ না, ঘাস-পাতা খাও, গরুর জাব খাও। বাচ্চাগুলো কী খাচ্ছে?

—দুদিন খায়নি।

—তবে আর কি, আমার গা জল করে দিলে। হি হি—নেও একপালি এবারের মতন। কাল এসে আমার বাগানটা একটু পোয়ার করে দিওদিকি। একদিনে হবে না, দিন চারপাঁচ লাগবে। এক হপ্তার খোরাকি দেব। সকলেরই দেব—পরে কিন্তু কোনওদিন আসবে না। আমার ছায়াও মাড়বে না। আগে থেকে বলে দিচ্ছি। আমিই বা খাব কী—এত দিলে-থুলে আমায় তো ঘন্টা চুষতে হবে শেষমেশ, তখন তোমরা কেউ হাত উপুড় করবে? সবাইকে জানি বাবা—আমার আর জানতে বাকি নেই, নিজের ছেলেই যেখানে উপুহস্ত করে না—সেখানে তোমাদের আর দোষ কি? তা কাল কাজে আসবে তো? এই একপালিতে কিন্তু কাল চললেও, পরশু পেটে হাত দিয়ে বসে থাকতে হবে। তখন আমার বাড়ির দিকে ঠ্যাং বাড়াতে এসো—

—বলছি তো কাল আসব।

—এসো তাহলে দয়া করে, এখন মশায়ের আসতে আজ্ঞা হোক। নমস্কার।

ঈশান পন্ডিত বেড়ার ধার থেকে আবার বাগানের ভেতর ঢুকে যেতে থাকে। অন্ধকারের মধ্যে কথা বলতে-বলতে তার ওই প্রশ্নান ভারি তাৎপর্যময়।

মথুরাপুর হাই-স্কুলের থার্ড পন্ডিতমশায় ঈশান ভটচায্যির আজীবন পন্ডিতির পর, এখন পূর্ণ অবসর। খালি পা, হাতে পাখা ঈশান পন্ডিতকে এ-অঞ্চলের সবাই চেনে। লোকে আড়লে বলে বেহ্মদত্যি, মুখের ওপর কিছু বলে না। বলার দরকার নেই, সাহসও নেই। দীর্ঘ দশাসই বদমেজাজী এই লোকটাকে ভয় করে না, গাঁয়ে, এমন লোক খুবই কম। নিজে তেমন লেখাপড় করেনি, ইস্কুলের প্রসপেক্টাসে নামের পাশে লেখা থাকত : প্লাকড ফর ম্যাট্রিক। তাতে কিছু যেত আসত না—ঈশান নিচু ক্লাসে ইতিহাস-ভূগোল পড়াত। সংস্কৃত পড়াতে কেউ কখনও শোনেনি। হয়ত পুরুতগিরি করত বলেই পন্ডিত।

সেই ঈশান জন্মের মতো ছুটি পেয়ে গেল। এক ছুটি দিল হাইস্কুল, অন্য ছুটি দিয়ে গেল ঈশেন-বুড়ি। এই তো সেদিনের কথা। এখনও চোখ বুজলে সদুর সিঁথিময় মাথা স্মৃতির দুয়ারী। মুখ নয়, উপস্থিতির অন্য কোনও প্রত্যন্ত নয়। পাকা চুল সিঁদুরে রাঙা। ঈশান রঙ্গ করে বলত, তোর মাথায় না সূয্যি প্রথম অস্ত যায় দেখিস। সদু যে কাকে প্রণাম জানাত কে জানে! কথার দেবতা কথা সত্যি বটে রেখেছে। হাওয়া খেলে ইন্দিশানের পুকুর যেমন কুলি-কুলি ঢেউ-এ অস্থির। সদুর মাথায় একচাল চুলও ঠিক তাই। কবে হাওয়া লেগেছিল, হয়ত, সে কোন্ কৈশোরে—সেই থেকে পানের ডিবের ওপরকার চুলগুলো কুচো-কাচা ঢেউ-এ স্বণু, স্বগিত। কী শোভ! হায়-ঈশানের মন কেমন করে ওঠে। সটান গিয়ে দাঁড়ায় সদুর আলতামাখা পদছাপের সামনে। একটু ছোট-বড়। এমন ছিল কি? নাকি মানুষ মারা গেলে তার সবকিছুই একটু ছোটবড় হয়ে যায়—অন্যরকম হতে হবে বলে, অন্যত্র যেতে হবে বলে! ঈশান ঠাহর পায় না।

খিড়কি পুকুরের পাশটিতে গিয়ে দাঁড়ায়। এই তো স্থলপদ্ম গাছ—তুমি রুয়েছিলে। ধান নয়, ধানের মতন একজায়গা থেকে পুকুরপাড়ে এনে পুঁতেছিলে বলেই, একথা বললাম। বলেছিলে, জলের নিচেকার মাছ তুমি দেখতে পাও না, তাই ডেমরেল মাছ এককোষ ছেড়েছিলাম। ওপর-ওপর বেড়াবে বলে—নিচেকার মাছেদের চৌকিদারের মতন। তুমি রান্নার ওপর বসে পুকুরের দিকে তাকিয়ে থাকবে, আনমনা। কিছু ভাবতে কি? গভীর ঝরা থাকে—তাদের কথা কি? কিছুই বলতে না, কীরকমভাবে হাসতে অল্প-অল্প। আমার ভয় হত, তুমি কি তাহলে এখানে সুখী নও? এটা এমন একটা বয়েস, যখন ছেলেদের কাছে পেলে তোমার ভাল লাগত। তাদের কাছে গিয়ে থাকার ইচ্ছে কি তোমার মনে মনে ছিল? নিজের দিক দেখতে গিয়েই-সেদিকে নজর গেল না। তাই কি? আমি যেন বুঝেও বুঝতাম না। আমি যেন নিজেরই

আড়লে আত্মজদের সঙ্গে এক বিষম প্রতিযোগিতায় নেমেছিলাম। ওদের কথা উঠলেই, আমার ভেতরটা কেমন গুমোট হয়ে যেত। মুখে বলতাম হয়ত, ওরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। কাজকম্ম আছে, তার ওপর দুজনেই খুব ন্যানজারি হয়ে পড়েছে। বুড়ো বাপ-মাকে মনে করার সময় কোথায়?

—এ তোমার রাগের কথা।

—রাগ? না, রাগ তো নেই। নিজের ছেলেদের ওপর কেউ রাগ করে, শুনেছ? আর তাছাড়া, আমি তো ওদের মুখাপেক্ষী নয়। ওদের পড়াশুনো শিখিয়েছি, মানুষ করে দিয়েছি। এখন যে যার নিজেরটা বুঝে নিতে চাইলে রাগ করার কী আছে সদু? এ তো ভালই।

—ছোটকু নিজে বিয়ে করেছে বলে, তুমি রাগ করোনি?

—তা করেছিলাম প্রথম-প্রথম। এখন আর ওসব কিছু ভাবি না। কে কার জন্যে ভাবে বল তো? বেশ করেছে, ঠিক করেছে। ভাল আছে তো? তাহলেই আমি খুশি। সুখে থাকতে পারাটাই আসল, জানো গিন্নি। আমরাও সুখে আছি। একেও তো সংসার-সুখ বলে, বলে না?

—হ্যাঁ, তা একরকম, বলে বৈকি।

—বুঝেছি, তোমার আরও ছড়িয়ে সংসার করার ইচ্ছে ছিল। তা, কী আর করবে বল, তোমার ভাগ্য! ভাগ্যই বটে। মাঝেমাঝে মনে হয়, আমাদের যেন সব থেকেও নেই। ওরা যখন ছোট ছিল, অত কষ্টের মধ্যেও আমরা কীরকম সুখে ছিলুম, তোমার মনে আছে?

—মনে নেই? নিশ্চয় আছে। ওইসব নিয়েই তো আছি—ওইসব নিয়েই থাকে মানুষ। তুমিও আছ।

—আমি? তা হবে। তোমার মতন করে ভাবতে তো পারি না—চোখ দিয়ে দেখি-দেখি যে উঠোনে কেউ খেলে বেড়াচ্ছে না, জল জমলে দাবার ওপর থেকে ঝুঁকে কাগজের নৌকো ভাসাচ্ছে না কেউ, নারকোল তেকলো ধরে পুকুরে ঝাঁপ নেই, ঘরদুয়ারে ভাঙচুর নেই, শব্দ নেই—সব যেন হঠাৎ থমকে গেছে। গুছুয়ে বলতে পারছি না—তবু যেন এমন শান্তি আমি চাইনি! আরেকটা ভয় হয়, আমি গেলে তুমি থাকবে কেমন করে?

—কষ্ট বই ঠিকই-থাকব, থেকে যাব। গরু-বাছুর বাড়াব। গাছপালা লাগাব। উঠোন কুপোব। মাটি থেকে মুথা ঘাসের বীজ-মূল বেছে ফেলব। থাকব-থেকে যাব। এ নিয়ে ভেব না সদু। ভাবলেই কষ্ট, ভাবলেই অসুখ বাড়ে।

—তবুও সদু একদিন এরকম ভাবতে-ভাবতে চলে গেল। বড়কু-ছোটকু এল। মায়ের শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলে বলল, আপনি তো এবারে যেতে পারেন বাবা আমাদের সঙ্গে?

—আমাকে বলছ? হ্যাঁ, তা যাওয়াই উচিত। দেখি ভেবে-ভেবে দেখাই ছিল। ওরাও মনে মনে জানত। ভদ্রতা করল। বাপের সঙ্গে একটু ভদ্রতা করে গেল আর কি! বলা উচিত, নয়ত বউ-দের কাছে ছোট হয়ে যেতে হয়, বউ-দের আত্মীয়-স্বজনদের কাছে।

ইচ্ছে হচ্ছিল বলি, তা তোমরাও তো বাপু কলকাতার পাট উঠিয়ে এখানে থাকতে পারতে। আমার তো ঘরদুয়ারের কমতি নেই। এখান থেকে শহরে পৌঁছুতে এক ঘন্টার মতন সময় লাগে। তোমাদের বাসা থেকে কত? বাস-ট্রামে? না, কিছু বলিনি। বলার হলে ওরাই বলবে।

—মায়ের শ্রাদ্ধসূত্রে যেকদিন ছিল, আমার ভাল লেগেছিল, আশ্চর্য। ভাবিনি, ভাল লাগবে। সে কি ওদের মায়ের জন্যেই! বড়কু-ছোটকু দুজনকেই ওর মায়ের মতন দেখতে। মায়ের মুখ পেয়েছে। সুখী হবে। বড়টা রং পেয়েছে আমার। ছোট মায়ের। ভাগাভাগি করে নিয়েছি দুজন দুই ছেলেকে। হিসেবে মিলছে। আর কী চাই। ওরা আছে, বাড়ি ভর্তি করে আছে। চলে গেলে-

ঈশান পন্ডিত কদিনের জন্যে কোথায় যেন গিয়েছিল। কোথায়? কেউ জানে না। গাঁয়ের লোক দেখল ঈশান আসছে। রোদে-পোড়া মুখ, চোখ বসে গেছে। মাথার চুল হাওয়ায় উড়ছে। শিখি জাগ্রত। পায়ের খড়ম, গোক্ষুরে যেমন, সুরকি উড়ছে। আওয়াজ হচ্ছে খট্‌খট্ খটাস্ খট্। প্রকট রোদ্দুর। মাথার ওপর গামছা। কাঁধে একটা মরা-মরা গাছ। শেকড়গুলো এক চিবি কাদামাটির ভেতর গোঁজা। দুহাতে বুকের ওপর চেপে একরূপ পাগল আদরে ঈশান জক্ষেপহীন হেঁটে আসছে।

কোথা থেকে যোগাড় করেছে কেউ জানে না। পন্ডিত বলছে, চীনে গাছ নাম জানো? লিভিং ফসিল। অর্থাৎ দেখতে মরা-মরা হলে হবে কী, ভেতরে ধুকপুক করছে জীবন। ভেতরটা কাঁচাই আছে। এভাবেই বেঁচে থাকবে, বড় হবে, বুড়ো হবে। এ-গাছের মৃত্যু নেই। ঠিক আমার মতন। দাম কত জানো? এক জীবন দাম। প্রচুর দাম—একজীবনের জমানো টাকা দিয়েও কেউ কিনে উঠতে পারে না। ভাগ্যে কেনে। যেমন আমি। সবার হাতে এ গাছ বাঁচেও না। তোমরা জীবনে দ্যাখোনি। তোমরা দেখবে কী করে? শহর কলকেতার কটা লোকই বা দেখেছে, শুনতে পাই? বটানিকেও নেই। শুনেছি দার্জিলিং-এর বটানিকে আছে। আমি দেখিনি, শুনেছি, বই-এ পড়েছি।

—ফুল হবে?

—ফুল! না বোধহয়। ফুল হলেই বা কি, না হলেই বা কি।

ফুলের মতন দেখতে তো আর হবে না!

—সুতরাং—

—জল খাবে?

—নিশ্চয়। জল না খেলে মানুষ বাঁচে?

—আর কী খাবে?

—সক্কলে যা যা খায়—ওকেও তাই খেতে দিতে হবে—অচ্ছেদ্দা করলে চলবে না। হুঁ হুঁ বাবা—একটা গাছের মতন গাছ হল এতদিনে।

ঈশান মাষ্টার বহুৎ খুশি। মাটিতে পা পড়ে না, এমনভাবে হাঁটে।

উঠানের মধ্যিখানে প্রকাণ্ড গর্ত খোঁড়ে নিজহাতে। কোদাল শাবল ঝোড় চতুর্দিকে ছড়ানো। দেখলে মনে হবে নিজের শোবার ব্যবস্থাই পাকা করতে লেগেছে পাগল ঈশান।

গাছ বসল। কাদামাটির সঙ্গে একটু ইটপাথর খাবে। খাওয়ালো ঈশান। ডালমন্দ দেবার জন্যে একটা সুড়ঙ্গ মতন রইল হাত পেতে, শিবলিঙ্গের মতন। ওখানে রেখে ঝুরুকঝুরুক জল দিলেই জিনিসটা ভেতরে নেমে যাবে।

পাতাগুলোর চেহারা অনেকটা ঝাউ-এর মতন খড়-রং। কোনওক্রমে লেগে আছে ডালপালার গায়। ঝড় উঠলে নির্ঘাৎ-অতও লাগবে না। কাছে বসে কোনও দীর্ঘশ্বাসে ঝরে পড়বে বলেই বিশ্বাস। কিন্তু না, গাছ বাড়তে থাকে। ঈশান গাছের গায়ে একটা ব্যাঁকারি পুঁতে ইঞ্চি-দাগ কেটে দিয়েছে। বছরে কতটা বাড়ে লক্ষ করতে হবে। অবিশ্বাসীকে বোঝাতে হবে। মানুষের জন্যে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন বজায় আছে।

ঈশানের সব-সমস্ত কাজ বাতিল। গরুবাছুর দিয়ে দিয়েছে কাকে না কাকে। পুকুরবাগান দিয়েছে জমায়। স্নান-খাওয়া লাটে উঠেছে। কেমন সন্নিসীর মতন চেহারা হয়ে গেছে লোকটার। ওই দশাসই চেহারা পাটকাঠি। চুলদাড়ি জমজমাট। জটাও পড়েছে ঘাড়ের দিকে। কারুর সঙ্গে কথা বলে না। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ডেকে সাড়া পায় না কেউ। গাঁয়ের লোক আগে ফিসফিস করে ঈশেনকে নিয়ে কথা বলত। এখন চেঁচিয়ে গাঁ মাত করে। ছোটরা পাঁচিল বাইয়ে ঢিল ফ্যালে, কাদার তাল ছোঁড়ে। ভ্রূক্ষেপ নেই ঈশেনের। লোকটা কি মরেই গেল নাকি শেষমেষ? বড়র ঘাড়ে ছোট উঠে দ্যাখে। নাঃ, আছে তো—ঠায় বসে আছে গাছটার সামনেই। বিড় বিড় করে বকছে। রামায়ণ-মহাভারতের মুনিঋষির মতন চেহারা।

কে যেন শুনতে পেল ঈশান পন্ডিত চেঁচিয়ে বলছে,—সদু সদু—শুনতে পাচ্ছ? একা নেই, আমিও একা নেই। একা থাকতে আমারও ভাল লাগে না।

ঈশান পন্ডিতের শ্রাদ্ধ শেষ। বৃষোৎসর্গ করল ছেলেরা। গাঁ-গেরামের সবাই পাত পেড়ে খেল! বাড়ি জমজমাট। লোকজন কাতরে কাতরে দেখতে আসছে। উঠোন জুড়ে মেহগিনি পালঙ্ক। তার ওপর ফুলশয্যা। দুধসাদা বালিশে ঈশানের ফটোগ্রাফ। জটাজুটমন্ডিত সাধু যেন অন্তিমশয্যায় শুয়ে রয়েছে। পেছনে মরা-মরা গাছটার ছবি।

উঠোনের মাঝখানে এটা আর কী রে? বিদঘুটে কাণ্ড। মানুষ হাঁটতে চলতে পারছে না, আর এই মরা গাছটাকে এখানে আবার কে পুঁতল?

বাবা পুঁতেছিলেন। খুব দামি গাছ। লিভিং ফসিল। ছোটকু উত্তর করে। কোথা থেকে যেন এনেছিলেন। চিনদেশে হয়।

বড়মামা বললেন,—তোর বাপ আবার চিনে গেসল কবে? আঁ—আশশেওড়া না গাবভেরেন্ডার মতন চেহারা—আমাদের নোনাদেশে এরকম গাছ শয়ে শয়ে—কেটে ফেল্ কেটে ফেল্।

বড়কু কুড়ুল নিয়ে গোড়া চেপে কোপ মারে।

চতুরঙ্গের আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে ইতিহাসবিদ প্রফেসর বিনয় চৌধুরীর ধারাবাহিক—'ঔপনিবেশিক পূর্ববাংলার হিন্দু-আদিবাসী সাংস্কৃতিক সম্পর্ক', শেষ কিস্তি। অস্বাভাবিক ব্যস্ততার কারণে লেখকের পক্ষে এবার এই কিস্তি লিখে শেষ করে ওঠা সম্ভব হয়নি।

কাশ্মীর কি রাষ্ট্রীয় অভিশাপ? অথবা এক মহনীয় চ্যালেঞ্জ?

শ্রীনিরপেক্ষ

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে আমি বিস্মিত বোধ করেছিলাম যে, পাকিস্তানের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের রাজনীতি, বিশেষত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী এবং নির্বাচনকালীন উক্তিগুলিকে আমাদের বিদেশমন্ত্রী ইন্দ্রকুমার গুজরাল যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন না। শ্রীযুক্ত গুজরালের সঙ্গে একটি দীর্ঘ একক সাক্ষাৎকারের সময় আমাদের প্রতিবেশী প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতবর্ষের নবনির্মীয়মান সম্পর্কগুলির তিনি নিজেই একে একে, তালিকাবদ্ধভাবে, আলোচনা করেন। তাঁর বিশ্লেষণের মূল প্রতিপাদ্য ছিল, "গুজরাল ডক্‌ট্রিন"। একটু সলজ্জ যদিও, তবু দেখা গেল, সংবাদপত্রের দেওয়া শিরোনামটি ব্যবহারে তাঁর আত্মপ্রসাদ যথেষ্টই পরিস্ফুট। "গুজরাল ডক্‌ট্রিন" কথাটির অর্থ যাঁরা বুঝতে পারছেন, তাঁরা তো পারছেনই। যদি আমি আপনি এর নিহিতার্থটি সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে না পারি, তাহলে ইন্দ্রকুমারবাবু একটি স্ফীতকায় ফাইল আপনাকে ধরিয়ে দেবেন। তাতে আপনার জন্য রাখা আছে দেশবিদেশের খবরের কাগজের প্রায় দুই ডজন ক্লিপিঙের সুস্পষ্ট প্রতিলিপি। ওই ক্লিপিঙ সংকলনের প্রত্যেকটি লেখাতেই আপনি পাবেন, গুজরাল এবং তাঁর ডক্‌ট্রিন, অর্থাৎ তাঁর অধুনা সমুজ্জ্বল মতাদর্শ সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা, কিছু বন্দনা।

আস্বরুলম্বিত তাঁর একদা ঘন কেশদাম এখন মসৃণ পাটের সূত্রের মতো। অতি পরিচ্ছন্ন যে—'গোটি'কে এতকাল ইন্দ্রকুমারের ব্যক্তপরিচয়ের একটা প্রধান সূচী হিসাবে গণ্য করতাম, সেই বিখ্যাত এবং অধুনা, ভারতীয় যুবসমাজে জনপ্রিয়—নূরটি এখন সম্পূর্ণ পক্ককেশ।

কণ্ঠস্বরে এবং ভাষায় ইন্দ্রকুমারবাবু সতত ভদ্র। বিনীতও বটে। কিন্তু যখন "গুজরাল ডক্‌ট্রিনে"-র প্রবেশদ্বার খোলা হয়, তখন তাঁর মিটিমিটি চক্ষে আনন্দের রেখাগুলি উজ্জ্বলতর হয়। তিনি নিজেই অবশ্যই লজ্জার মাথা খেয়ে আপনাকে বুঝিয়ে দেবেন, এই ডক্‌ট্রিন, বা মতাদর্শের আসল অর্থ কি। "পাড়ায় পাড়ায় ভাই ভাই।"

তিনি বাংলাদেশ দিয়ে আরম্ভ করে নেপাল, শ্রীলঙ্কা এবং এমনকী ভুটানের কথাও বললেন—কী অসাধারণ পল্লীপ্রেমের স্রোতধারা ভারতবর্ষ সৃষ্টি করতে পেরেছে এবং এর গুপ্ত ঐশ্বর্য কোথায় ইত্যাদি বিশ্লেষণ অনেকক্ষণ সময় নিল। এই উপহাসাত্মক বর্ণনার একটিই মাত্র উদ্দেশ্য—পল্লী-প্রতিবেশী প্রেম-পাড়ায় পাড়ায় ভাই ভাই—এই যদি ডক্‌ট্রিনটির ন্যাসশীলা হয়, তাহলে এর মুখপ্রবক্তা একবারও পাকিস্তানের কথা উল্লেখ করছেন না কেন? পাকিস্তানকে বাদ দিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ভাই ভাই পাতানোর যে-অর্থ দাঁড়ায়, তা ভয়ানক। কেননা, এর লক্ষ দৃশ্যতই মনে হবে পাকিস্তানকে জ্ঞাত্যুত্থিত করা। হয়ত কার্যতও তাই দাঁড়াতে পারে। কিন্তু ইন্দ্রকুমারবাবু সতর্ক রাজনীতিক, একথা জানলেও স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে তিনি পাকিস্তানের কথা উত্থাপন করবেন না। শেষপর্যন্ত, আমিই উল্লেখ করলাম : নওয়াজ শরিফের কথায় কি মনে হচ্ছে না যে, এই উপমহাদেশে একটি বহু আকাঙ্খিত মুহূর্তের জন্য সম্ভব? "দেখা যাক," নিরুৎসাহ এবং নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর গুজরালের, "নির্বাচনী বক্তৃতায় কে কত কথা বলে।," এই বলে তিনি আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। অর্থাৎ, ভারতসরকারের বিদেশমন্ত্রণালয় এখন ঝানু বকের মতো পাক-রাজনীতির জলাশয়ের দিকে তাকিয়ে ধ্যানমগ্ন। মুখ দেখে অন্তরের প্রতিচ্ছবি কেউ বুঝতে পারবেনা।

"লক্ষ করে থাকবেন, ভারত সম্বন্ধে শরিফের উক্তগুলির উপর আমরা এখনও কোনও প্রকাশ্য মন্তব্য করিনি," খুব অভিজ্ঞ, সতর্ক লোকের মতো কথাটা ফাঁস করলেন ইন্দ্রকুমারবাবু। "ভারত সম্বন্ধে সদিচ্ছা কতটা গভীর, তা পরিষ্কার না হওয়া

পর্যন্ত এখনই মুখ খোলার দরকার কী?"

শত্রুর দিকে তাকিয়ে সন্দিগ্ধ, অভিজ্ঞ লোকেরা যেমন কথা বলে, ইন্দ্রকুমার গুজরাল ওই রকম কথা বলছিলেন। ঘরপোড়া গরুর দৃষ্টিও বলতে পারেন। অথচ নেপাল এবং বাংলাদেশে তাঁর "গুজরাল মতাদর্শ" কী রকম ভ্রাতৃপ্রেমের বন্যা এনে দিয়েছে, তা বলতে গিয়ে ইন্দ্রকুমার উচ্ছ্বসিত। যদিও আমি বর্ণনা দিচ্ছি, তবু জানি, এটা গুজরালের দোষ নয়। এটা ভারতবর্ষের আজন্মইতিহাসের দোষ।

আমাদের মধ্যে, যাঁরা প্রগতিশীল, কিংবা বামপন্থীরূপে পরিচিত, তাঁরাও পাকিস্তানপ্রেমিক বলে চিহ্নিত হতে চান না। আমি পাকিস্তানের প্রেমিক, যদি কেউ একথা একবারও কোনওক্রমে আভাসেও প্রমাণ করতে পারে, তাহলে আমার রাজনৈতিক ভবিষ্যতে বাক্টা বেজে যাবে। যদি ওই রকম কোনও সন্দেহ সাধারণ মানুষের মনে আসে, তাহলে প্রকাশক আমার বই কিনতে ভয় পাবেন। প্রতিউসার আমরা ছবির জন্য টাকা খরচ করতে রাজি হবেন না। আমি দেশের সর্বজনবিদিত একটি 'রিসক' হয়ে দাঁড়াব। বিজেপি আমাকে কুইসলিঙ আখ্যা দেবে। এই ভয়ের রাজনীতি আজকের নয়, অর্দ্ধশতাব্দীর পুরাতন।আমরা বেশির ভাগ ভারতীয়ই শক্তিত সংস্কৃতির শাবক। গুজরাল কোনও ব্যতিক্রম নন। জওহরলালও ব্যতিক্রম ছিলেন না।

পাকিস্তান সম্বন্ধে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কণ্ঠস্বরে কোনও দ্বিমত নেই। এটা কি সুস্থতার সাক্ষ্য? আমাদের রাজনীতির আকাশ এত বৃহৎ, মতভেদ এমন বহুমুখী, রাজনৈতিক দলের সংখ্যা এত অগুনতি তথাপি পাকিস্তান বিরোধিতায় আমরা ঐক্যবদ্ধ। কেউ মোটা, কেউ কর্কশ, কেউবা মিহি। তফাৎ ওইটুকু, কিন্তু এই পাকিস্তান নামক একটি দুস্করিত্র, শয়তান এবং হিংসাত্মক রাষ্ট্র সম্বন্ধে আমরা এক-জাতি-এক-প্রাণ-একতা। এটা কি সুস্থ দেশপ্রেমের লক্ষণ?

নুসরৎ আলি (বানানটি ঠিক হল কিনা জানিনা) গাইতে এলে তাঁর কাওয়ালির শব্দে দিল্লির চন্দ্রাতপ ধ্বসে যায়। যেসব উত্তরভারতবাসী আঁতেল বিশুদ্ধ উর্দুর চর্চা করেছেন, তাঁদের মুখে নতুন পাকিস্তানি কবিদের উদ্ধৃতি দিল্লির ককটেল পার্টিকে চমকিত করে। বৃদ্ধবয়সে প্রেম ভাটিয়া তাঁর সমকালীন তরুণী মুসলিম বান্ধবীর কথা স্মরণ ক'রে আপ্লুত নিবন্ধ রচনা করেন ইংরাজিতে। গোটা উত্তরভারতে উর্দু লখনউ সংস্কৃতির একটি রোমন্থন প্রায়শই উচ্চারিত হয়—সেটা অনেকটা লেকসপীয়র-শেলী আবৃত্তির মতো উচ্চশিক্ষিত কৃষ্টির স্বাক্ষর। কিন্তু পাকিস্তানের কথা উঠলে, কী মধ্যপন্থী, কী বামপন্থী, আমরা সকলে, সহজেই বিজেপি। জ্যোতিবাবুর মুখে কোনও দিন পাকিস্তান প্রীতির কথা শুনেছেন? পাকবিদ্বেষ আমাদের জাতীয় ঐক্যের সিমেন্ট। এই পাকবিদ্বেষের হেতু কি? এই সিমেন্টের উপকরণগুলিই বা কি?

পাকিস্তান সম্বন্ধে আমাদের শত্রুতাবোধ, বা আতঙ্কের তিনটি প্রধান কারণ জনমতসম্বর্দ্ধিত, অনেকাংশে সত্যও বটে। তার এক নম্বর কারণঃ পাকিস্তান গণতন্ত্রসিদ্ধ তো নয়ই, দৃশ্যত নির্বাচনের দ্বারা গঠিত পাকিস্তান সরকারের পশ্চাতে কার্যত সমস্ত মুখ্য ক্ষমতার অধিকারী—অবিসংবাদিতভাবেই—পাকিস্তানের সামরিক নেতৃবর্গ। (একদা এই নেতারা মোমমাখানো গোঁফের সঙ্গে স্যাণ্ডার্সের বড়াই করতেন এবং আর্মি মেসে জেনারেল কারিয়াপ্পা ইত্যাদির সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ হুইস্কির রাখীবন্ধনে তাঁরা আকৃষ্ট ছিলেন।) যদি ১৯৫৮-৫৯ সনের, কিংবা তারও দুই বৎসরের পুরাতন সংবাদ-পত্রগুলির পৃষ্ঠা ওলটানো যায়, তাহলে দেখবেন, তামাম ভারতবর্ষের গভীর সম্পাদকীয় স্তম্ভগুলি পরিপূর্ণ পাকিস্তানের সামরিক ডিক্টেটরশিপের বিরুদ্ধে উষ্মায়, আদর্শগত ঘৃণায়, এমনকী ভারতের জন্য নিরাপত্তার শঙ্কায়। ওই প্রকাণ্ড আইডোলজিকাল কোলাহলের মধ্যে আরও দেখা যাবে দুইজন ঊষ্মাঋষী ভারতীয়কে—প্রবর মহাগালেক। পাঠক সহজেই অনুমান করতে পারছেন, তার মধ্যে একজন আমাদের আদর্শনীয়, সুদর্শন দেশনায়ক শ্রীমান জওহরলাল নেহরু। আর একজন, ঊষ্মাঋষী বট্টু, কিন্তু উষ্মতোনাসা, ঘনকৃষ্ণবর্ণ কর্কশরসনা কৃষ্ণ মেনন। উভয়েই ওই সময় আমাদের মনে প্রবল আদর্শবাদী ঝড়ের আহবান এনেছিলেন এই সুবাদে যে, গা-লাগোয়া একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রে মিলিটারি ডিক্টেটরশিপ কায়েম হওয়ার মানেই ভারতের দেশরক্ষার শিরোদেশে একটি খড়্গ ঝুলিয়ে রাখা। কার্যত এই ত্রাসের অনেকটাই অনতিকালের মধ্যে প্রমাণ হয়েছে।

হিমালয়ের উত্তরে আর একটি দেশ, চিনও সমাজতন্ত্রী ডিক্টেটরশিপের সৃষ্টি করেছিল। তাতে আমরা ভ্যাঙ্ক হইনি—অন্তত ১৯৬২ সন পর্যন্ত। কিন্তু পাকিস্তান সম্বন্ধে ত্রাস যথার্থ হতে চলল, তার দ্বিতীয় কারণ এই যে, ১৯৫৪-৫৬ সনের মধ্যেই পাকিস্তানের সামরিক-রাজনৈতিক সংস্কৃতি—কেবলমাত্র ডিক্টেটরদের বাসনা নয়-পাকিস্তানকে নিয়ে গেল ইঙ্গমার্কিন নিরাপত্তা জোটের অন্তরঙ্গ আলিঙ্গনের মধ্যে। পাকিস্তানের এই ইঙ্গমার্কিন সামরিক সভ্যতার ইতিহাস অর্দ্ধশতাব্দীর পুরাতন। কিন্তু তৎকালে যে আশঙ্কার দৃষ্টিতে ওই ঘটনাটিকে দেখা হয়েছিল—আযুব খাঁর দ্বারা প্রকাশ্যভাবে মিলিটারি একনায়কত্ব স্থাপন, মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব জন ফসটার ডালেস কর্তৃক বিশ্বব্যাপী এ্যানটি-কমিউনিষ্ট ব্যূহ রচনা, মার্কিনের সঙ্গে পাকিস্তানের সামরিক দানপ্রতিদানের চুক্তি স্বাক্ষর হওয়া ইত্যাদির উৎসশক্তি—এখনও সংশোধন, অথবা পুনর্বিবেচনার অবকাশ তৈরি করেনি।

এই দ্বিবিধ সন্দেহ এবং ত্রাসের কারণ হিসাবে পাকিস্তান ভারতবর্ষে যে-রাজনৈতিক মনোভাব, কিংবা প্রায় অভঙ্গুর মানসিকতার সৃষ্টি করেছে, তার যেমন ঐতিহাসিক যৌক্তিকতা পাওয়া যায়, তেমনই পাকবিদ্বেষের আর একটি অবিনশ্বর কারণ

কাশ্মীর। এবং কোনও কোনও বিচারে বিদ্বেষের এই কারণটিই যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু অবিনশ্বর শত্রুতার কারণ হিসাবে কাশ্মীর যদি ভারত এবং পাকিস্তানের সমঝোতার পথে প্রধান বাধা হয়, তাহলে কতদিন আমরা সযত্নে, অপরিসীম অর্থব্যয় এবং রক্তপাতের দ্বারা এই বাধাটিকে রক্ষা করে যাব? কতদিন কাশ্মীরকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গণ্য করা হবে? অথবা, কাশ্মীর আমাদের অভিশাপ কি, এই প্রশ্নটি মনের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে দাঁড় করানোর—এবং এর পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি বিন্যাসের—ঐষিক সাহস আমাদের কবে হবে?

আবার এই দ্বিতীয় কিস্তির লেখাটি ছাপা হয়ে বেরোবার আগেই পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিনিধি দল ভারতসফর শেষ করে ফিরে যাবেন। তাঁদের কাছ থেকে যে-সখ্যতার প্রস্তাব এসেছে, সে একান্তই প্রাথমিক ব্যাপার। হয়ত সখ্যতার উদ্যোগ নাও হতে পারে। হয়ত শালীনতার আহবান, স্রাভাবিক কথপোকথনের ভদ্র পরিবেশ মাত্র তৈরি করাই নওয়াজ শরিফের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য তার বেশি নয়। কিংবা বিপরীত বিশ্লেষণের দ্বারা কেউ কেউ বলতে পারেন, এই উদ্যোগটি তার চেয়ে অনেক গভীর অর্থবহ।

কাশ্মীর সমস্যার জন্মলগ্ন থেকে পাকিস্তানের রাজনীতির উপর সেনাবাহিনী যে-কব্জা বসিয়ে রেখেছে—যে-কব্জাকে একদা ঠাণ্ডা লড়াইর যুগের মার্কিন রাজনীতির দ্বারা এবং ১৯৬৫ পরবর্তীযুগে চিনের সামরিক মৈত্রীর দ্বারা অর্থসাহায্যে, টেকনলজি সহযোগে, এমনকী জেনারেলদের ব্যক্তিগত সৌহার্দ্যের পরিবেশের মধ্যে এনে অতিশয় যত্নে এবং মার্কিন এবং চিনের জামাই আদরে পরিপুষ্ট করা হয়েছে—হয়ত, হয়ত নওয়াজ শরিফ সেই কব্জার চ্যালেঞ্জ নিতে চান। হয়ত দীর্ঘকালের উত্থানপতনশীল পাক-রাজনীতি-অবশেষে—একটি যুগসন্ধির সম্মুখীন হয়েছে। সেই কারণেই পাকিস্তানের ইতিহাসে বৃহত্তম সংখ্যাগরিষ্ঠতার রেকর্ড সৃষ্টি করে নওয়াজ শরিফ প্রধানমন্ত্রিত্ব এসেছেন। হয়ত পাকিস্তানের বর্তমান অর্থসঙ্কটও এই যুগসন্ধির কারণ। আরও অনেকগুলি "হয়ত" খুবই যুক্তিসিদ্ধভাবে সাজানো যায়। আপাতত সেই প্রচেষ্টায় আমি প্রবেশ করতে ইচ্ছুক নই।

কিন্তু এই কিস্তির আরম্ভে ইন্দ্রকুমারবাবুর সাক্ষাৎকারটি উল্লেখ শুধু নয়, একে বৃহৎ পরিসর দেওয়া হয়েছে এই জন্য যে, নওয়াজ শরিফের দ্বারা সৃষ্ট এই যাবতীয় "হয়তগুলির" বাজি খেলতে—এই ঝুঁকি-নেওয়ার সাহসিক কূটনীতিতে প্রবেশ করতে—ভারতসরকারের বিদেশ মন্ত্রণালয় যে প্রস্তুত নয়, বরং অতি সতর্কতার দ্বারা, এই সম্ভবনাপূর্ণ লগ্নটিকে বিপন্ন, কিংবা ব্যর্থ করতেও উদ্যোগী হতে পারে—এই প্রশ্নটির অবতরণা করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। বৃটেনীতে যুগপরিবর্তনের সময় যখন আসে, তখন প্রতি পদক্ষেপে সভয়ে পিছনে তাকিয়ে জনমত কী বলছে লক্ষ করতে গেলে লগ্ন অতিক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। গণতন্ত্রের অর্থ এই নয় যে, রাজনৈতিক নেতারা কিংবা মন্ত্রীরা সকল প্রকার জাতীয় সঙ্কটের ব্যাপারেই "পাছে লোকে কিছু বলে" এই ভয়ে সিঁটকে থাকবেন। নৈতিক ব্যক্তিরা, কিংবা ঘুষ খাওয়ার ব্যাপারে "পাছে লোকে কিছু বলে" এই ভয়, মনে হয়, আমাদের রাজনীতি থেকে দূর হয়েছে।) পাকিস্তান, চিন, তিব্বত, তাইওয়ান ইত্যাদি প্রশ্নে "পাছে লোকে কিছু বলে" এই পুঞ্জীভূত, প্রোথিত সংস্কার সহজে ঘাড় থেকে নামানো সম্ভব হচ্ছে না।

কাশ্মীর এবং পাকিস্তান এই ত্রাসজনিত সংস্কারের এপিঠ এবং ওপিঠ। কে কার জন্মদাতা—ডিম থেকে হাঁসের জন্ম, কিংবা হাঁস থেকে ডিমের—তা বলা প্রায় অসম্ভব।

কিন্তু এই ধরণের 'ক্রমিক' ব্যধির চিকিৎসায় একটি পদ্ধতি বহুবেদসম্মত—অর্থাৎ অনেকেই এই পদ্ধতি ব্যবহার করে ফল পেয়েছেন। পদ্ধতিটি আর কিছু নয়, কে কার জন্মদাতা সেই তর্ককে প্রাধান্য না দিয়ে, যে-ব্যাধিটি দ্রুত নিরাময় করা সম্ভব সেটিকে প্রবলভাবে আক্রমন করা এবং ওই সঙ্গে সতর্কভাবে অন্য রোগটিকেও নিয়ন্ত্রণাধীনে—পাহারায়-রাখা। এ ছাড়া কার্য-কারণের শক্তিশৃঙ্খল ভাঙবার আর কোনও পন্থা বহুজন স্বীকৃত নয়। পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের পারস্পরিক বৈরিতা এবং প্রবল সন্দেহের সম্পর্কটিকে আমরা চিকিৎসার প্রধান লক্ষ্য হিসাবে নির্দ্ধারিত করব, অথবা কাশ্মীর সঙ্কটের ত্রিকোণ সমস্যাটিকে প্রথম আক্রমণ করব, এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ থাকতে পারে। কিন্তু অবশ্যই এই মুহূর্তে এর মধ্যে একটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পুনর্বিবেচনার এবং বিশ্লেষণের আতসকাঁচের তলায় আনতে হবে।

কাশ্মীরে আপাতসার্থকভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ফারুখ আবদুল্লা মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন।এতে অন্যান্য ভারতীয়ের মতো আমিও আনন্দিত। কিন্তু উচ্ছ্বসিতই নই, নিরুদ্বিগ্ন তো নয়ই। চাকার মতো ইতিহাস ঘুরে ঘুরে আসে, এটা প্রবাদে যত সত্য এবং বহুকথিত, কার্যত তা একেবারেই নয়। অনেকক্ষেত্রেই ইতিহাস উচাবচ, সরলরেখায় চলেনা, চক্রবৎ আবর্তিতও হয় না। ফারুখ আবদুল্লা তিনবার ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করলেন, এটা আশ্চর্যের ব্যাপার মনে হতে পারে। কিন্তু ঘটনার পুনরাবৃত্তি ভারতবর্ষের, কিংবা কাশ্মীরের সৌভাগ্যের ব্যাপারে কিনা, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই। সম্ভবত আমার মতো মনোভাব-সম্পন্ন লোক অতিশয় সংখ্যালঘু।

এই ভদ্রলোক নিজগুণে কাশ্মীরের রাজনীতিতে দীর্ঘায়ু হয়েছেন, একথা যাঁরা বিশ্বাস করতে চান, তাঁরা স্বভাবতই একথাও বিশ্বাস করবেন যে, কাশ্মীর আবার ১৯৮৩ সনে ফিরে গেছে—যখন শেখ আবদুল্লার মৃত্যুর দুই বৎসর পর ফারুখ প্রথমবার নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। ওই সময় ভারতে এবং কাশ্মীরে অনেকেই ফারুখকে কাশ্মীরের পরিত্রাতা হিসাবে বন্দনা করেছিলেন। অথবা, প্রমাদবশত তাঁরা একথাও মনে করে থাকতে

পারেন যে, কাশ্মীরের রাজনীতি ১৯৭৭ সনের ৩০শে জুন তারিখের শুভলগ্নে আবার ফিরে গেল। (ওই তারিখে কাশ্মীরে প্রথম, স্বচ্ছ এবং আইনানুগ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং কাশ্মীর রাজ্যসভায় ৭৬টি আসনের মধ্যে শেখ আবদুল্লার ন্যাশনাল কনফারেন্স ৪৭টি আসন দখল করে, একথা পাঠকের মনে নাও থাকতে পারে।) অথবা, আরও আশাবাদী, দেশপ্রেমিকেরা এমনও ভাবতে পারেন যে, কাশ্মীর বুঝিবা ১৯৪৭ সনের অক্টোবর মাসেই ফিরে গেল। তখন পাকিস্তানী হানাদারদের সঙ্গে ভারত যুদ্ধরত এবং সর্বপ্রথম শেখ আব্দুল্লাকে 'জরুরী প্রশাসনের' মুখ্যকর্ণধরূপে--ন্যাশনাল কনফারেন্সের অবিসম্বাদিত, জনপ্রিয়, এবং আদর্শবাদী নেতা হিসাবে--ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তখন ভারতবর্ষে কী জয়জয়কার কেননা, রক্তাক্ত দেশবিভাগের পরপরই ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং শেখ আব্দুল্লা প্রমাণ করলেন যে, অসাম্প্রদায়িক ভারতের মৃত্যু ঘটেনি। ভারত বিখণ্ডিত হতে, কাশ্মীরের একতৃতীয়াংশ হানাদার সেনার কবলে তাও সত্য, কিন্তু তার চেয়েও উজ্জ্বল এবং--তখন মনে হয়েছিল--মহত্তর সত্য এই যে, কয়েদে আজম জিন্নার বলিষ্ঠ প্রতিবাদরূপে আমরা শেখ আবদুল্লাকে পেয়েছি। (ভারতীয় স্বাধীনতার পূজায় পীঠা হিসাবে সীমান্ত গান্ধিকে বলি দিয়ে আমাদের বিবেক যেটুকু কম্পিত হয়েছিল, শেখ আবদুল্লার চমকপ্রদ উত্থান বুঝিবা তারই প্রতিকার করল।) সিকিউলারিজমের এতদিনের পুরস্কারও বলতে পারেন, ভারতবর্ষে দেশরক্ষা নীতির একটি নতুন দুর্গও বলতে পারেন--এই রকম একটা আত্মপ্রসাদ কংগ্রেস নেতৃবর্গকে তো বটেই, বামপন্থীদেরও মনে আদর্শের ইনজেকশানের মতো ঢুকেছিল।

লক্ষ করবার বিষয় যে, শেখ আবদুল্লাও তিনবার ক্ষমতায় এসেছিলেন (যদি '৪৭ সনের অক্টোবর মাসে গঠিত 'জরুরী সরকারকে' স্বীকার করে নেওয়া হয়)। জঘন্য, অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসারে দিল্লির কংগ্রেস নেতৃত্ব তাকে দুইবার ক্ষমতা থেকে অপসারিত করে। পুত্র ফারুখ আবদুল্লার ক্ষেত্রেও ভাগ্য অনুরূপ সমাস্ফাল ভঙ্গিতে আবর্তিত হল--দুইবার বহিষ্কার, তিনবার ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন। এটা কি সেই বহুকথিত, 'চক্রবৎ আবর্ত্তন্তে ইতিহাস? নিশ্চয়ই তা হতে পারেনা, তথাপি কাশ্মীরের ঘটনা বিবর্তনের মধ্যে এমন কি শক্তি রয়েছে, যার ফলে পিতাপুত্রের ভাগ্য পরস্পরের মধ্যে এমন আশ্চর্যভাবে প্রতিবিম্বিত হতে থাকল? একবার নয়, দুইবার নয়, তিন তিনবার পিতার রাজনৈতিক ভাগ্যে যা ঘটেছিল, পুত্রের অদৃষ্টেও অনুরূপ রাজনৈতিক নির্বাসন-পুনর্বাসনের অধ্যায় রচিত হল কেন, কীভাবে?

আমার আগের কিস্তির লেখাতে, সংক্ষেপে হলেও, কাশ্মীরের রাজনৈতিক শক্তিগুলির মধ্যে প্রধান এবং উল্লেখযোগ্য যেগুলি, তাদের কথা বলা হয়েছে। পাকিস্তানে একদিকে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির দুর্বলতা এবং সামরিক 'এলিটদের' প্রাধান্য অন্যদিকে রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে মসজিদের স্থান, আধাসামরিক অর্থাৎ প্যারামিলিটারি শক্তির উপস্থিতি, উদ্বাস্তুদের মধ্যে সংখ্যালঘুদের ভীতি ইত্যাদি উপাদান ওই দেশের রাজনীতিকে গত অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ একটা অস্থায়িত্বের দুর্দশার মধ্যে রেখেছে। এরই মধ্যে আফগান গৃহযুদ্ধের ফলে পাকিস্তানে উপরোক্ত শক্তিগুলির মধ্যে তিনটি শক্তি বিশেষ প্ররোচনা এবং উস্কানি পেয়েছে, একথাও ভারতবর্ষের সমস্ত শিক্ষিত পাঠক অবগত আছেন। সামরিক 'এলিট' এবং প্যারামিলিটারি তার মধ্যে প্রধান, কিন্তু মসজিদ-রাজনীতির শক্তিও কম উস্কানি পায়নি।

কাশ্মীরের রাজনীতি মধ্যে চিরকালই এই তিনটি শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ১৯৮৪ সনের পর অনুপ্রবেশ বাড়বার যথেষ্ট কারণ ছিল, বেড়েছেও প্রবল আকারে। (সেকথা একটু পরেই বিশদভাবে আলোচিত হবে।)

অন্যদিকে ভারতবর্ষ কাশ্মীরকে দিতে চেয়েছিল এই শক্তি-গুলিরই বিপরীতধর্মী প্রভাব, মতাদর্শ এবং দৃষ্টান্ত। ভারতবর্ষের সেই প্রচেষ্টা বারবার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, একথাও পাঠকের অজ্ঞাত নয়। দিল্লির বাদশাহী মনোবৃত্তি কাশ্মীরের শিশু গণতন্ত্রের উপরে বার বার চড়াও হয়েছে। সন্দেহপ্রবণ হিন্দু রাজনীতি ন্যাশনাল কনফারেন্সের নিষ্ঠাবোধ, কিংবা স্বাজাত্যবোধকে কখনওই বিশ্বাস করতে চায়নি। তাছাড়া, নেহরু-ইন্দিরা-এবং-রাজীবের কংগ্রেস কাশ্মীরের নিজস্ব, দেশজ রাজনীতির অস্তিত্বকে একদিকে দুর্বল করা এবং অন্যদিকে তার উপর প্রত্যক্ষ আধিপত্য বিস্তারে কখনওই বিশেষ লজ্জাবোধ করেনি। ১৯৫৩ সনে শেখ আবদুল্লার গভর্ণমেন্টকে নেহরু এক হুকুমে বরখাস্ত করেন এবং সেইসঙ্গে আবদুল্লাকে পাঠান কারাগারে, যেমন ইংরেজ সাহেবরা বরখাস্ত করত স্বায়ত্তশাসিত, তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারগুলিকে এবং জেলে পাঠাত নেহরু, প্যাটেল ইত্যাদিকে। (গত কিস্তিতে আমি লিখেছি যে, এই ঘটনায় ভারতবর্ষের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা, কিংবা প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলি বিশেষ কিছিতে হননি।)

কাশ্মীর ভারতবর্ষের একটি প্রদেশ, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ কিংবা তামিলনাড়ুর সমতুল্য, অথবা ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্য এই প্রশ্টি আইনের দ্বারা যতই সংজ্ঞাবদ্ধ করা হোক না কেন কার্যত আমাদের মনে প্রশ্নটি অমীমাংসিতই রয়েছে। ১৯৫২ সনে ২৪ জুলাই ভারত সরকার এবং শেখ আবদুল্লা একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন, যাতে ভারতবর্ষের ভিতরে কাশ্মীরকে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার অঙ্গীকার লিপিবদ্ধ হয়। ওই অঙ্গীকার কিন্তু মহারাজা হরি সিং-এর 'ইনস্ট্রুমেন্ট অফ এক্সেসেশানে'-র বিপরীত। আবার ১৯৫৬ সনে কাশ্মীর কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলির প্রস্তাব অনুসারে, ১৯৫২ সনের চুক্তির বিপরীত সিদ্ধান্তে আসা গেল--পুনরায় অবিচ্ছেদ্য অঞ্চল হিসাবেই কাশ্মীরকে ভারতের অঙ্গীভূত করা হল। ১৯৯৭ সনে ভারতের কোয়ালিশান সরকার

আবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যে, "কালক্রমে" কাশ্মীরকে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের অধিকার দেওয়া হবে। অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে আমরা পুনরায় ১৯৫২ সনের চুক্তির নীতিতে ফিরে যেতে প্রস্তুত।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে পিতাপুত্রের অদৃষ্ট যেমন চক্রবৎ আবর্তিত হয়েছে, তেমনই ভারতবর্ষের সংবিধানের সঙ্গে কাশ্মীরের বন্ধনের সংজ্ঞা বারে বারে পালটানো হয়েছে।

নানাবিধ কারণের মধ্যে একটি কারণ এখানে মনোযোগ সহকারে বিচারের জন্য রাখছি। আমার বক্তব্য এই যে, না কাশ্মীর, না ভারত, না পাকিস্তান, কেউই অতীতের অভিশাপের বন্ধন থেকে অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে মুক্তি পেল না। পায়নি যে তার কারণ কেউই সাহসিক রাজনৈতিক চিন্তার দ্বারা এর মোকাবিলা, কিংবা চ্যালেঞ্জ নেওয়ার পথে যায়নি। যায়নি যে তার কারণ কেউই অতীতের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করার মতো স্বাভাবিক ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞা অর্জন করেনি। কিংবা এই তিনটি অঞ্চলের কোনওটিই গত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে বিপ্লব, সামগ্রিক গৃহযুদ্ধ, অথবা সর্বাঙ্গীন রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনের অভিযাতের মধ্যে পড়েনি। কাশ্মীর এবং পাকিস্তানের কাছে এই ক্ষমতা, বিজ্ঞাত, কিংবা পরিবর্তনশীলতা আশা করা যায়না। ভারতবর্ষের কাছে আশা করা উচিত ছিল, কিন্তু সে আশা এখনও পর্যন্ত ফলবতী হয়নি। কাজেই কাশ্মীরের রাজনীতির ঘানিতে ঠুলিবাঁধা গরুর মতো একই বৃত্তে পাক খাচ্ছে ভারতের অদৃষ্ট, পাকিস্তানের সমস্ত অমঙ্গলের শনি এবং শেখ পিতাপুত্রের পাপগ্রস্ত জীবন।

কথার কথা হিসাবে একটি সম্ভাবনা আলোচনা করা যাক। ১৯৮৩-৮৪ সনে একবিকে 'জম্মুকাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের' বিদ্রোহ থেকে আরম্ভ করে, অন্যদিকে ইন্দিরা প্রসূত গভর্ণর জগমোহনের রাজনীতির অন্তর্যাতী চক্রান্তের ফলে কাশ্মীরের দৃশ্যপটের যে-দ্রুত পরিবর্তন শুরু হয়েছিল, তাতে কি ১৯৯৬ সনে মনে হয়নি যে, কাশ্মীর ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে?' ১৯৮৪ সন থেকে ১৯৯৬, বারো বৎসর একাদিক্রমে কাশ্মীরের ভিতরে অন্তর্যাতমূলক শক্তিগুলির আধিপত্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। ওই সন্ত্রসবাদী, ঝঞ্ঝলনিকভপন্থি বিপ্লব কাশ্মীরের আইনসঙ্গত জীবনকে প্রায় সম্পূর্ণই পঙ্গু করে রেখেছিল। শ্রীনগর ছাড়িয়ে ভারত বিদ্রোহের আগুন ক্রমে ক্রমে প্রথমে জিলা শহর এবং শেষপর্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। চূড়ান্ত পর্যায়ে ভারতবর্ষের অন্যূন ৫০ হাজার সৈন্য এবং সিপিআরএফের আধা-সামরিক বাহিনীকে মোতায়েন করেও ভারতবর্ষ এই বিদ্রোহকে পরাস্ত করতে পারেনি। ভারতবর্ষের আইন এবং রাষ্ট্রীয় উপস্থিতি কোনও কোনও সময় সীমাবদ্ধ ছিল শুধু সামরিক বাহিনীর তাঁবুর আশ্রয়ে।

১৯৮৮ সনের বিষাক্ত গ্রীষ্মের বর্ণনা গভর্ণর জগমোহন তাঁর নিজের জবানবন্দিতেই লিপিবদ্ধ করেছেন এইভাবে : "৩১ জুলাই এবং ১ আগষ্টের অন্তর্বর্ত্তী রাত্রে দুইটি বোমা বিস্ফোরণ এবং একটি ডাকাতির (ঘটনা) অনুষ্ঠিত হল। ৪ আগষ্ট তারিখে লখিমপুর (অঞ্চলে) ইলেক্ট্রনিক ঘড়ি লাগানো একটি বোমা পাওয়া গেল। জম্মুর প্রধান বাজারে ১২ আগষ্ট একটি অটোরিকশায় বিস্ফোরণ ঘটল। পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস, ১৪ আগষ্ট তারিখে অনেক জায়গায় কৃষ্ণ পতাকা উড়ানো হয়েছিল। ১৬ আগষ্ট নাললামার রোডের উপরে পাকিস্তানপন্থী একটি শোভাযাত্রার সঙ্গে পুলিশের কয়েকবার সংঘর্ষ হল। পাকিস্তানপন্থী শোভাযাত্রা ভারতবিরোধী শ্লোগান তুলেছিল এবং কয়েকদিন পূর্বে মৌলভী ফারুখ রাওলপিণ্ডি রোডের অবরোধ তুলে নেওয়ার জন্য যে দাবি তুলেছিলেন, শোভাযাত্রীরা তারও সমর্থনে শ্লোগান দিচ্ছিল।

"এই সংঘর্ষের ফলে পুলিশের গুলিতে একজন শোভাযাত্রী মারা যায়, প্রায় ৫০ জন আহত হয়। একটি পুলিশের জীপ সম্পূর্ণ অগ্নিদগ্ধ হয়, কতকগুলি দোকানপাটের ক্ষতি ঘটে। ১৬ তারিখ রাত্রে শ্রীনগরের ঋষি পীর মন্দিরটিতে আগুন লাগানোর চেষ্টা হয়। ১৭ আগষ্ট প্রথম রাত্রে জেনারেল জিয়ার মৃত্যু সংবাদ যখন পাওয়া গেল, তখন শ্রীনগরের প্রধান এলাকায় একটা বিরাট জনতা জড় হয় এবং ভারত ও রাশিয়া বিরোধী শ্লোগান দিতে থাকে। সেদিন রাত্রে যদিও সান্ধ্য আইনজারি হল, তথাপি শ্রীনগরের বহু জায়গায়, বারামুলুলা, পুলওয়ামা এবং বান্দেওয়াতে অনেকগুলি রাস্তা হয়ে গেল। ক্রমাগত চরদিন হিংসাত্মক কার্যকলাপ চলল। ১৮ আগষ্ট পুলিশের গুলিতে চরজন নিহত হল..' ইত্যাদি। (গ্রন্থ 'মাই ফ্রোজেন টারবুলেন্স' লেখক জগমোহন।)

জম্মুকাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের কর্মী আজাজ দল ১৮ সেপ্টেম্বর যখন পুলিশের গুলিতে মারা গেলেন, তাঁকেই অবশ্য উগ্রপন্থি সন্ত্রসবাদীরা প্রথম কাশ্মীর যুদ্ধের শহীদ হিসাবে চিহ্নিত করল। কিন্তু গভর্ণর জগমোহন এবং ভারতীয় সাংবাদিকেরা অর পূর্বেই পুলিশের গুলিতে অন্তত আধ ডজন লোকের নিহত হওয়ার খবর তালিকাভুক্ত করেছেন। কাশ্মীরের রক্তাক্ত রণাঙ্গনেরসৃষ্টি ১৯৮৮ সনের ওই বিষাক্ত শহীদ দিবস, ১৮ সেপ্টেম্বর, কিংবা ১লা আগষ্ট তারিখ থেকে যোগ্য যায়। এক-বছর পারে, ১৯৮৯ সনের আগষ্ট মাসে একটি রিপোর্টে শ্রীমতী তভলীন সিং লিখছেন: "ওদের (সন্ত্রাসবাদী জঙ্গীদের) মুখ দেখে চেনা যায়না, ওরা গুপ্ত থাকে আন্ডাগ্রাউণ্ডে, কিন্তু কাশ্মীর এখন ওদেরই নিয়ন্ত্রাধীন। এই বিপদাপন্ন উপত্যকার রাজনৈতিক পরিস্থিতির এটাই হল সবচেয়ে ভয়ানক দিক। গত সপ্তাহে শ্রীনগরের দোকানগুলির পাট বন্ধ ছিল এক নাগাড়ে। কেউ নিশ্চয় করে বলতে পারে না কেন। তবে 'ওদের' কাছ থেকে নাকি (দোকান বন্ধ রাখার) হুকুম এসেছিল।"

তভলীন আরও জানালেন যে, এই ঘটনার এক সপ্তাহ পূর্বে মহোৎসাহে বাজি পুড়িয়ে, পতাকা উড়িয়ে পাকিস্তানের স্বাধীনতা

দিবস উদযাপন করা হয় শ্রীনগরে। কিন্তু "ওদের হুকুমে" পরের দিন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস পালিত হয় "কৃষ্ণ দিবস" হিসাবে এবং সন্ত্রাসবাদীদের ঘোষণা অনুযায়ী "কারফিউ" পালন করা। যারা সন্ত্রাসবাদের সমর্থক নয়, তারাও স্বীকার করছে, ইতিপূর্বে শ্রীনগরে এমন সর্বজনীন সন্ত্রাস আইন এবং ব্লাকআউট কখনও হয়নি। "যেন একটা যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে," একথা হললেন একজন স্থানীয় সাংবাদিক। "কোনও বাড়িতে কেউ এক একটাও আলো জ্বালানোর সাহস দেখায়নি। এমনকি বাইরে থেকে দেখা যায় এমন সমস্ত আলো হোটেল এবং রেস্তোরাগুলিতেও নিভিয়ে রাখা হয়েছিল।"

এই কর্ফ্যাগুলি কাশ্মীরের ভারত বিদ্রোহ এবং বিচ্ছেদ কামনার মধ্য পর্বের চিত্র তৈরি করছে। এই পর্ব থেকেই সন্ত্রাসবাদীদের আধিপত্য এবং হিংসার সড়ক শুরু হল। এই মধ্যপর্বের চিত্র এবং কাশ্মীরের রাজনীতির অধ্যায় পরিবর্তনের চিহ্নটি সংক্ষেপে উল্লেখ করলাম, কেননা আট-নয় বৎসরের পুরাতন সংবাদপত্রের বিশেষ শিক্ষিত মানুষের স্মৃতিতেও ঝাপসা হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু পরবর্তী অধ্যায়-১৯৯৬ সন পর্যন্ত প্রলতর সশস্ত্র বিদ্রোহের সময় প্রতিদিন অবরোধ, বোমা বিস্ফোরণ, গুপ্ত হত্যা এবং গেরিলা যুদ্ধের যেসব বিবরণ কাশ্মীর থেকে এসেছে, কিংবা বিশ্বব্যাপী উদ্বেগ সৃষ্টির জন্য 'হসটেজ' নেওয়ার যে-খবরগুলি মাসে মাসে সংবাদের শিরোনাম অধিকার করেছে, তার পুনর্বর্ণনার হয়ত কোনও দরকার নেই-সেই স্মৃতি জনসাধারণের মনের প্রথম পর্যায় সশব্দে জ্বলছে। এই অনুমান অন্যায় নয়। অসমর্থিত সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী অনুমান করা হয়ে থাকে যে, সন্ত্রাসবাদীদের নিয়ে পুলিশ, সৈন্যবাহিনী এবং নিরীহ জনসাধারণের সমস্ত মিলিয়ে মোট প্রায় দশ হাজার লোক ১৯৯৫-৯৬ এর মধ্যবর্তী এক বৎসরে মারা গেছে, অথবা গুরুতর আহত হয়েছে। জম্মু এবং কাশ্মীরের অধিকাংশ অঞ্চলের চেহারা ওই সময় পূর্বতন যুগোশ্লাভিয়ার রণাঙ্গনের রূপ নিতে চলেছিল।

এই ঘটনাগুলিই অব্যাহতভাবে আরও চার, কিংবা ছয় বৎসর যদি বিস্তর লাভ করত, তাহলে কি কাশ্মীরে আধাখেঁচড়া নির্বাচন অনুষ্ঠান ঘটানো, অথবা ফারুখ আবদুল্লাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পুনর্বার অভিষিক্ত করা সম্ভব হত? কাশ্মীর কি ভারতবর্ষের অসন্নিকৃত হয়ে যেত না? সন্ত্রসবাদের জন্য কালের উপর যবনিকা উন্মোচিত হয় কখন, তাও লক্ষ করবার বিষয়। তার মাত্র পাঁচ বৎসর পূর্বে ১৯৮৩ সনের জুন মাসে ফারুখ আবদুল্লা-ইন্দিরা গান্ধির প্রাণপণ বিরোধিতা এবং কংগ্রেসের চক্রান্ত উপেক্ষা করে-বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতার মারফৎ ন্যাশনাল কনফারেন্সকে নির্বাচনে জয়ী করে শাসন ক্ষমতায় ফিরিয়ে এনেছিলেন। সর্বজনীন ভোটের দ্বারা কাশ্মীরে ওই হল দ্বিতীয় নির্বাচিত আইনসভা। (১৯৭৭ সনে কাশ্মীর যে প্রথম গণনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতেও ন্যাশনাল কনফারেন্স বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ১৯৮৩ সনের সেই আইনসভা কি টিকতে পারল? দিল্লির হুকুমে, নানাবিধ অভিযোগের দায়ে এক বৎসর পরেই ফারুখকে ক্ষমতা থেকে বিদায় দিয়ে ইন্দিরার পোষা গভর্ণর জগমোহন মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসালেন বঙ্গী গোলাম মহম্মদকে, পাঠকের একথা স্মরণ থাকতে পারে। কাশ্মীরের ভারত বিদ্বেষ, কাশ্মীরে ঐসলামিক সংস্কৃতির দুরন্ত প্রসার এবং হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর বিনাশ চার বছরের মধ্যে ওই সময়ই শুরু হয়। এই বিদ্বেষের সূতিকা গৃহে কালাশনিকভপন্থী বিদ্রোহের জন্ম।

ফারুখ আবদুল্লার বর্তমান সরকারের স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও সহজে নিশ্চিত হওয়া কি সত্যই সম্ভব? যদিও দিল্লির বর্তমান কোয়ালিশান সরকার এবং ইন্দিরার বাসশাহি দিল্লির মধ্যে তফাত আকাশ পাতাল তবু ১৯৮৪ সনের পুনরাবৃত্তি অসম্ভব নয় একাধিক কারণে। আমার তৃতীয় কিস্তির লেখায় "কাশ্মীরের ভবিষ্যতে কী হতে পারে" এই প্রশ্নটিই মুখ্য অংশ নেবে। কাজেই কী কী কারণে বর্তমান কাশ্মীরের হাওয়া পালটাতে পারে, তার আলোচনা এই কিস্তিতে মুলতুবী থাকুক।

১৯৮৪-'৯৬ এর মধ্যবর্তী ঘটনাপর্ব এখানে উত্থাপন করা হয়েছে অন্য উপলক্ষে। পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে যে, কয়েক পৃষ্ঠাপূর্বে আমি বলেছি যে, কাশ্মীরের দুই জননেতা শেখ এবং তাঁর পুত্র ফারুখ আবদুল্লার রাজনৈতিক জীবনে বৃহত্তম ঘটনাগুলি প্রায় সমান্তরাল এবং দীর্ঘদিনের ব্যবধান সত্ত্বেও পরস্পরকে স্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত করছে। কেন করছে, তার একটা সহজ কারণ হিসাবে আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, না পাকিস্তান, না কাশ্মীর, না ভারত কেউই গত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে রাজনীতির কক্ষপথ পরিবর্তন করেনি। অতীতের দাসত্ব থেকেও বন্ধনমুক্ত হয়নি। এমনকি কাশ্মীর যে গৃহযুদ্ধের পটভূমিকা তৈরি করেছিল, তাও অর্দ্ধসমাপ্ত। কাজেই এই ত্রিকোণ সমস্যার কোনও মৌলিক পরিবর্তন সম্ভব হচ্ছে না। ঘসা রেকর্ডের মতো কাশ্মীরিঘটনাবলী প্রায় একই খাদের মধ্যে ঘুরছে। আর আর্তনাদ করছে।

মাত্র দুই মাস পূর্বে নওয়াজ শরিফ পাকিস্তানের রাজনীতিতে এক নতুন পটভূমি নির্মাণ করেছেন। কী কী কারণে এই পটভূমি সম্পূর্ণ নতুন তার বিশদ বিশ্লেষণ বর্তমান প্রবন্ধের কোনও খণ্ডেই আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ভারত এবং পাকিস্তান এই দুইটি দেশ সম্পূর্ণ গণতন্ত্রিক সরকারের দৃষ্টি দিয়ে পরস্পরের দিকে তাকাবার সুযোগ ৪৫ বৎসরের মধ্যে এই প্রথম, একবার মাত্র পেয়েছে। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহেও দিল্লির রাজনৈতিক নেতারা এই আশ্চর্যজনক সুযোগের সম্পূর্ণ পরিমাপ করতে সক্ষম হননি। ইন্দ্রকুমার গুজরালের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে একথা আমার মনে হয়েছিল। দিল্লি এই সুযোগ হস্তগত করার মাহেন্দ্রক্ষণ অনুভব করতে পারছে না। কেননা, তার মনোবৃত্তি ঘর-পোড়া-গরুর আতঙ্কে ভরা। তার

অভিজ্ঞতা অতীতের সংস্কার এবং ব্যর্থতায় আকীর্ণ। তার চেয়েও আরও বড় বাধা পাকিস্তান সম্বন্ধে ভারতীয় জনমত। সে অচল জলাশয়ের মতো পঙ্কিল এবং স্তব্ধ হয়ে আছে, আগেই একথা বলেছি। বৃহৎ সূর্যের সাক্ষাৎ সে পায়না। বর্তমানের প্রতিচ্ছবি সেখানে ক্ষীণ, অতীত তাকে পানায়-কচুরিতে সয়ুচিত করে রেখেছে। সেই জলাশয়ে বিজেপির কর্দম এবং ক্রিমি সহজেই অত্মবিস্তারের সুবিধা খোঁজে।

আরও একটি কারণ এর সঙ্গে জড়িত। বিগত অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ ভারতবর্ষের রাজনীতিতে শান্তিবাদী মানুষের কণ্ঠ ক্রমশ দুর্বল হয়ে এসেছে। অন্যদিকে যুদ্ধবাজ লবীগুলি অর্থ, শৌর্য এবং অহংকারের বৃহৎ শিরস্ত্রাণ পরে সর্বদা রাজনীতির মঞ্চে কুচকাওয়াজ বাড়িয়ে তুলছে। সংবাদপত্রেও তাদেরই স্থানাধিক্য। আণবিক বিজ্ঞানের চর্চার অজুহাত দিয়ে, অথবা প্রতিরক্ষার দোহাই তুলে কার্যত আমরা এদেশের ধ্বংসাত্মক মিলিটারি শক্তি যখনই বাড়াতে যাই, যখনই একটা সফল ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার সংবাদ প্রকাশ পায়, তখনই গর্বে আমাদের বুক আটখানা হয়। গান্ধির দেশের অহিংসাপন্থী সরকার ছাবিশো জান্‌য়ারি যে সেনাযাত্রার অনুষ্ঠান করে, তার সঙ্গে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী দেশগুলির স্বাধীনতা দিবস পালনের সাদৃশ্য বিন্দুমাত্র। কিন্তু ওই শৌর্যের পরাকাষ্ঠা এবং সেনা-বিমান-নৌবাহিনীর সমবেত শোভাযাত্রাগুলিতে আধুনিক অস্ত্রলজ্জার চলমান প্রদর্শনী যুদ্ধবাজ ডিস্টেরশিপগুলির আদোপান্ত অনুকরণ চলছে। তাতে আমরা লজ্জা পাইনা। এগুলি যে ভারতবর্ষের উন্নয়ন নয়, নৈতিক অধঃপতনের পরিচায়ক, একথা বামপন্থী দলগুলিও একবার উচ্চারণ করেননা। এই জঘন্য শৌর্যের বাহাদুরি কংগ্রেস আরম্ভ করেছে। (এমনকী গান্ধিজির শবদেহ যেভাবে সমাধিস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেই লজ্জাজনক সামরিক শোভাযাত্রার নির্মাতা তাঁরাই।) কাজেই কংগ্রেসের কাছ থেকে এর বিপরীত কিছু আশা করা বৃথা। বিজেপি তো শিবসেনার শ্রদ্ধাপ্লুত ছোড়দা। পার্লামেন্টে ক্ষুদ্র, বৃহৎ, দক্ষিণ, বাম, সমস্ত দলের লোকেরাই খদ্দর এবং গলাবন্ধ কোটের অনুবূল। কিন্তু অহিংসা, শান্তিবাদ-এগুলি ইতিহাসের আবর্জনায় পরিণত হয়েছে। মিলিটারি বাজেট আমাদের জিডিপির দুই থেকে তিন শতাংশের মধ্যে যদি রাখা যায়, তাহলেই আত্মতুষ্ট।

এই অবস্থায় আশা করা যায় না যে, কোনও বৃহৎ রাজনৈতিক দল, কোনও প্রগতিশীল জনমত (কিংবা কোনও জনপ্রিয় সংবাদপত্র) আজ সবলে ঘোষণা করবে : "পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তির হাত বাড়াও"। অথবা, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জনমতের মধ্যে শান্তিবাদী একটি শক্তিপুঞ্জ তৈরি হবে, এ-আশা সহজে পূর্ণ হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু সেজন্য [illegible]জীবীদের চেষ্টা এখনই পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ করতে হবে।

যদি নওয়াজ শরিফ সাময়িক এবং ক্ষণস্থায়ী একটি ঘটনামাত্র হন, যদি তাঁর হস্তে শান্তির বিল্বপত্র অচিরেই ভ্রান্ত প্রত্যাশারূপে পরিণতি লাভ করে-সোজা কথায় তার উপর বাজি রেখে যদি ভ্রান্ত রেসুড়ের মতো হতাশায় বাড়ি ফিরতে হয়-তবু আজ কি ভারতবর্ষের উচিত নয় সর্বপ্রকারে শান্তির বাতাবরণ তৈরি করা? যদি পাকিস্তানের বিগত নির্বাচন এবং শরিফকে গুরুত্ব দেওয়া ভুল বলে প্রমাণ হয়-হলেও আমি খুব আশ্চর্য হব না-তথাপি সেই ভুল কি খাঁটি ভুল নয়? সেই ভুল কি শান্তির সপক্ষে দাঁড়বে না?

কাশ্মীরের জন্য আমরা বহু আত্মত্যাগ করেছি। পঞ্চান্ন বৎসর বৃহৎ সৈন্যবাহিনীর পাহারায় কাশ্মীরকে রাখার জন্য কত সহস্র সহস্র কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে, তার হিসাব প্রতিরক্ষার খাতিরে গুপ্ত রাখা হয়। কিন্তু অন্তত কোনও বুদ্ধিমান গবেষক, কিংবা সাংবাদিকের পক্ষে অনুমান করা দুঃসাধ্য নয়। কিন্তু সেই অভাবিত, প্রকাণ্ড অর্থব্যয় এবং রক্তক্ষয়ের চেয়ে আরও বড় ক্ষতি : পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের ক্ষতিগ্রস্ত বিষাক্ত প্রতিবেশিত্ব। এই বিষাক্ত সীমান্তের জন্যই ভারত রণসজ্জায় লজ্জা পায়না। এই জন্য প্রতিরক্ষা শকুনিরা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশে ডানা ছড়ায়।

পাকিস্তান কাশ্মীরের সমস্যার জনক, কিংবা কাশ্মীরের সমস্যাই পাকিস্তানের সামরিক ডিক্টেরশিপের মূল, এই তর্ক বুদ্ধির দ্বারা মীমাংসার নয়, একথা তো গোড়াতেই বলেছি। তর্ক নয়, এই বিষচক্রের মীমাংসাই যদি সর্বান্তঃকরণে কাম্য হয়, তাহলে দু'টি সমস্যার জনক-জাতক সঙ্কাচীকে ভাসতে হবে। পাকিস্তানের সঙ্গে সৌহার্দের বাতাবরণ যদি সৃষ্টি করা যায়, তাহলে ওই বাতাবরণের মধ্যে বাণিজ্যের এবং অর্থনীতির একটা প্রকাণ্ড ফসল এখনই জন্মাতে পারে। সংস্কৃতির, সঙ্গীতের, সাহিত্যের তরঙ্গ এই উপমহাদেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে গিয়ে অবাধে পৌঁছুতে পারে এবং বহুদিনের নিশ্চল মনোভঙ্গি থেকে দুইদেশের জনমতেরই মুক্তি হয় স্বল্পকালের মধ্যে।

রেলপথ খুলে যাবে, ভিসা-পাসপোর্টের শৃঙ্খল থাকবে না এবং সীমান্ত অপ্রহর হবে-এই স্বপ্নগুলি মানুষকে জাগিয়ে তুলে, অতীতের সীমাবদ্ধ চিন্তাধারা থেকে মুক্তির আনন্দ স্রোতের মধ্যে আনতে পারে। আর, যদিই ভারতবর্ষ এইসব "অকারণ, অবাস্তব" স্বপ্নের দ্বারা একটা অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী কোলড ওয়ারের বন্ধন থেকে উপমহাদেশের মানুষকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টায় নামে, তাহলে সেই ভুলও কি মহৎ ভুল নয়? এবং এই প্রচেষ্টাই কি অবশেষে কাশ্মীরের অভিশাপকে ভারতবর্ষের চ্যালেঞ্জে পরিণত করবে না?

যে যুগে কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনাকে আমরা মাথায় তুলেছিলাম, সেই যুগ এবং তার নম্বর নেতৃত্ব গোটা পৃথিবী থেকেই প্রায় তিরোহিত হয়েছে। ওই যুগে বেশির ভাগ ভারতীয়ের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কাশ্মীরের অধিকাংশ মুসলমানই "অসাম্প্রদায়িক এবং সংস্কারমুক্ত" রাজনীতির পক্ষপাতী। কাশ্মীর উপত্যকায় যদিও মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য বহুকালের, তবু

সেইসঙ্গে এও লক্ষণীয় ছিল যে, ওই অঞ্চলটিতে দুই সম্প্রদায়ের সম্মিলিত কৃষি মানুষকে একটা ধর্মনিরপেক্ষ, নিবিড় সামাজিক সত্তার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে পেরেছিল। দেশ বিভাগের সময়ও এই সংহতি নষ্ট হয়নি কিন্তু পাকিস্তানের প্রভাব নতুন একটি প্রজন্মের আবির্ভাব এবং কাশ্মীর উপত্যকায় ব্যর্থক্রম গণতন্ত্র-এই তিনটি নতুন শক্তির যুগপৎ এবং ক্রমাগত আক্রমণে ১৯৮০র দশকের মধ্যভাগে কাশ্মীরের অখণ্ড সামাজিক সংস্কৃতি প্রথমে গৃহযুদ্ধ এবং পরবর্তীস্তরে, ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিণতি লাভ করে। তার সাদৃশ্য দেখা দেয় ভিয়েৎনাম এবং আফগানিস্তানের সঙ্গে। ১৯৮৮-৮৯ সনের পর কাশ্মীর উপত্যকায় অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক মতাদর্শ বেঁচে আছে, অথবা বেঁচে থাকবে, এই বিশ্বাস আঁকড়ে থাকার পক্ষে কোনও যুক্তি ছিল না।

এটা হল কাশ্মীরের আভ্যন্তর বিবর্তনের কথা। কাশ্মীরের বাইরে, সীমান্তবর্তী দেশগুলিতে এবং বৃহৎ বিশ্বের আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে আশির দশকের শেষ এবং নব্বুইর দশকের প্রারম্ভে যে-পরিবর্তনগুলি অভাবিত গতিবেগ সৃষ্টি করল তাদের দিকেও আমরা মনোযোগ দিলাম না। আশির দশকেই পাকিস্তান একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমরশক্তির সঙ্গে পূর্বতন মৈত্রীর বন্ধন অক্ষুণ্ণ রেখেই, অন্যদিকে সম্পূর্ণ বিপরীতমার্গী চিনের সামরিক-রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গেও প্রায় একই প্রকারের সৌহার্দ্য স্থাপন করতে পারল। পাকিস্তান এই দুই রাষ্ট্রশক্তিরই 'স্ট্রাটেজিক' স্বার্থ পূরণের দ্বারা আমাদের চারদিকে এমন একটি কূটনৈতিক বৃহ তৈরি করল, যার যথার্থ প্রতিকার আমাদের বিদেশনীতির মধ্যে ছিলনা। রাষ্ট্রসঙ্ঘে এবং পশ্চিম দুনিয়ার জনমতের দরবারে ভারতবর্ষের বক্তব্য এবং মতাদর্শ ক্রমশই ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর পরিণতির দিকে গেল। আমরা কোণঠাসা হলাম। কাশ্মীর উপত্যকায় নবজাগ্রত স্বাধীনতার দাবি প্রবলতর হওয়ার উৎসাহ লাভ করল। তথাপি আমরা পুরাতন, জরাগ্রস্ত সিকিউলারিজমের শ্লোগানই আউড়ে চললাম। নতুন শক্তিব্যূহ রচনা করার এবং উদ্ভাবনশীল কূটনীতির জন্য দেওয়া আমাদের নেতাদের পক্ষে সম্ভব হল না।

যুগান্তিক ভূমিকম্পে সসাগরা পৃথ্বী কাঁপতে থাকল, বার্লিনের প্রাচীর ধ্বংসসার হল, সোভিয়েত রাশিয়া বিদীর্ণ হল অন্তর্বিপ্লবে, চিন দেখা দিল নতুন বিশ্বশক্তিরূপে, ইজরায়েল এবং পি.এল.ও এক ঘাটে জল খেতে গেল, দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে চিনের দোস্তি শুরু হল, কিন্তু ভারতের কূটনীতির অনমনীয় কুনীতি, এবং তাত্ত্বিক ভিত্তির স্থবরত্বে কোনও বৃহৎ পরিবর্তন ঘটল না। এই মানসিক অচলাবস্থার মধ্যে আমরা—কংগ্রেস, বিজেপি এবং বামপন্থীদলগুলি—সম্ভবত কোনওই অস্বস্তি বোধ করি না। বরং নির্বোধ নিষ্ঠাকে আমরা প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য দিতে প্রস্তুত।

নির্বোধ এই কারণে যে, ভারত উপমহাদেশের উপরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চিনের সুদীর্ঘকালব্যাপী কূটনৈতিক আধিপত্যবাদ নব্বুইর দশকে স্পষ্টতই অস্তগামী হয়েছে। তার প্রমাণ বহুবিধ। দৃষ্টান্ত হিসাবে সাম্প্রতিক ঘটনাটিই উল্লেখ করা যেতে পারে। চিনের রাষ্ট্রপতি জিয়াং জেমিন গত ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানের সিনেটের অধিবেশনে যে ভাষণ দেন, তাতে এই যুগান্তিক কূটনৈতিক নির্দেশ ছিল বলেই যুদ্ধবাজ লবীগুলি সন্তুষ্ট হয়নি। তিনি তিনটি বিষয়ের উপর সর্বাধিক আলোকপাত করেন—এক, চিন এবং ভারত যেভাবে ধাপে ধাপে পারস্পরিক আস্থা সৃষ্টির কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, সেটাই প্রকৃত প্রতিবেশিত্বের পথ এবং সেইধরণের কার্যক্রমের দ্বারাই ভারত-পাকিস্তানের বিরোধ ধাপে ধাপে দূর করার পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। দুই, অর্থাৎ এই বিরোধের সমাধানের প্রথম ধাপ, অথবা মুখ্য বিষয় হিসাবে কাশ্মীরকে স্থান দেওয়া সমীচীন হবে না। তিন, জিয়াং স্পষ্টভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, চিনের বর্তমান পররাষ্ট্রনীতি দুইপক্ষের এই বিরোধের মধ্যে কোনও ভূমিকা নিতে অনিচ্ছুক। পাকিস্তানের যুদ্ধবাজ লবীগুলির (এবং আজাদ কাশ্মীরের উগ্রপন্থী সমর্থকেরা) এতে খুশি হওয়ার কথা নয়।

অন্যদিকে, ভারত উপমহাদেশের রাষ্ট্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং বিরোধের বিষয়গুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এতদিন যাবৎ যে কূটনৈতিক স্বার্থ খুঁজে পেত এবং যে-স্বার্থগুলি এতকাল মার্কিন কূটনীতির প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল, অদ্যকার দুনিয়ায় সেগুলি প্রায় মূল্যহীন। সোভিয়েত রাশিয়ার বিপর্যয়ের পর মস্কো এবং নয়াদিল্লির মধ্যে অতীত দেখলে বেজিংয়ের আর কোনও আতঙ্কের কারণ নেই। তেমনই দিল্লি এবং করাচির মধ্যে যদি আজ, সৌহার্দ্যর মৌসুমি বায়ু বইতে শুরু করে, তাতে ওয়াশিংটনের ভীতির বা অপ্রীতির কোনও কারণ থাকবে না। বেজিঙও এই সখ্যতারই পক্ষপাতী (এবং ক্ষেপণাস্ত্র বিক্রয়ের বাজার সঙ্কুচিত হচ্ছে বলে সে খুব শঙ্কিত বলে মনে হয়না)।

এমতাবস্থায় বৃহৎ বিশ্বশক্তিগুলির কূটনৈতিক মানচিত্রে আপাদমস্তক পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। সেই পরিবর্তন নব্বুইর দশকের গোড়াতেই আবছাস্বপ্ন দৃষ্টিগোচর হতে শুরু করে। এখন এই পরিবর্তিত মানচিত্রের প্রকৃতিগুলি সুস্পষ্ট।

এই পটভূমির মধ্যে যেসব নতুন সমীকরণ তৈরি হচ্ছে, তার একমাত্র ব্যতিক্রম এখন পর্যন্ত ভারত এবং পাকিস্তান। অথচ এই দুই দেশেই পুঞ্জীভূত দরিদ্রের সংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক, যথাক্রমে ৩২ এবং ৬ কোটি। কিন্তু দুর্ভাগ্য, বঙ্গনিয়া, কিংবা রুয়াণ্ডার কথা বাদ দিলে এখানেই যুদ্ধের দামামা প্রবলতম। একথা ভারতের লোকসভায়, কিংবা পাকিস্তানের সিনেটে কে শুনবে? ইতিহাসের অথর্বীন বন্ধন ছিন্ন করার জন্য কোন দেশটি প্রথম অগ্রসর হবে?

(ক্রমশ)

গ্রামবার্তার আদি কথক কাঙাল হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬)

চিত্তব্রত পালিত

গত বছর ছিল কাঙাল হরিনাথের মৃত্যুশতবার্ষিকী। চিরঞ্জীব বন্দোবস্তের জমিদারি শাসনে থেকেও হরিনাথ মজুমদার গ্রামবার্তার প্রথম এবং অদ্বিতীয় সাংবাদিক বলে পরিগণিত হতে পারেন। অষ্ঠ গ্রামবাংলার উন্নতিতে নিবেদিতপ্রাণ হয়েও এ যুগে হরিনাথকে আমরা ভুলে গেছি। তবু সান্ত্বনা এই যে জলধর সেনের লেখা তাঁর একটি জীবনী আছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যসাধকচরিতমালার তৃতীয় খণ্ডে ৩৫ সংখ্যায় হরিনাথকে স্মরণ করেছেন। সাত বছর আগে ১৩৯৬তে অমর দত্ত কাঙাল হরিনাথ সম্পাদিত গ্রামবার্তা প্রকাশিকা সংকলন ও সম্পাদনা করে প্রকাশ করে তাঁর স্মৃতিরক্ষা করেছেন এবং আজকের দিনে তার প্রাসঙ্গিকতা আমাদের দৃষ্টিগোচর করেছেন।

বৈশাখ ১২৭০ (১৮৬৩) সালে মাসিক গ্রামবার্তা প্রকাশিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে ১৮৬৯এ এর পাক্ষিক সংস্করণ এবং ১৮৭০ থেকে এর সাপ্তাহিক সংস্করণ বেরোতে থাকে। এর পূর্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় অক্ষয়কুমার দত্ত 'কাশীয় প্রজাগণের দুরবস্থা বা 'নীলকরদিগের অত্যাচার' নিয়ে লিখেছেন কিন্তু তা ছিল তৎক্ষণিক এবং হরিনাথ যে কুমারখালির জমিদারের অত্যাচারের কথা লিখেছেন, সে দেবেন্দ্রনাথেরই মুখপাত্র। সুতরাং কার্যকারণে প্রভেদ ছিল। যেমন শিশির ঘোষের অমৃতবাজার পত্রিকা বা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ছিল সে যুগে নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জমিদারশ্রেণীর হাতিয়ার। ঠিক হরিনাথ যা করেছেন তার থেকে ভিন্ন। হরিশ্চন্দ্রই আবার ১৮৫৯ এর প্রজাস্বত্ব আইনের বিরোধিতা করেন। হরিনাথ লিখেছেন, 'আমি ইতিপূর্বে নীলকুঠিতে ও মহাজনদিগের গদিতে ছিলাম, জমিদারের সেরেস্তা দেখিয়াছিলাম এবং দেশের অন্যান্য বিষয় অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইয়াছিলাম। যেখানে যত প্রকার অত্যাচার হয় তাহা আমার হৃদয়ে গাঁথা ছিল। দেশীয় সংবাদপত্রের অনুবাদক রবিনসন সাহেব যখন অনুবাদ কার্য্যালয় খুলিলেন, আমিও সেই সময় গ্রামবার্তা প্রকাশ করিলাম। আমি লেখক, আমিই সম্পাদক, আমিই পত্রিকা বিলিকারক এবং আমিই মূল্য আদায়কারী সর্ব্বসংগ্রাহক_____'।

গ্রামবার্তার আদর্শ সম্পর্কে হরিনাথ লিখেছেন 'কেবল সংবাদদাতা, পত্রপ্রেরক ও শ্রুতি কথার প্রতি নির্ভর করিয়া গ্রামবার্তার প্রকাশ হইত না। আমরা গ্রামবার্তার উপযুক্তবার্তা জানিবার নিমিত্ত কখনও গোপনে কখনও প্রকাশ্যে নানা স্থান পরিদর্শন ও দূরস্থ গ্রামপল্লী অবসর মত সময়ে ভ্রমণ করিয়াছি এবং এই প্রকার ভ্রমণ করিয়া শান্তিপুর, উলাদি উপনগর পরিদর্শনে তাহার নামোৎপত্তির কারণ ও প্রাচীন বৃত্তান্ত মেহেরপুর চাকদহ ও উলা প্রভৃতি স্থানের মহামারীর অবস্থা অনেক সংগ্রহ করিয়াছিলাম।____নানা প্রদেশের এমণবৃত্তান্ত গ্রামবার্তায় প্রকাশিত হইয়া গ্রাম ও পল্লীবাসীদিগের যতদূর উপকার সাধন করিয়াছিল। আমি ততদূর অত্যাচারী লোকের বিষনেত্রে পড়িয়া নানা প্রকারে উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত হইতে লাগিলাম।'

১৮৩৩ সালে (বাংলা ১২৪০ সন) নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুমারখালিতে (বর্তমানে বাংলাদেশে) হরিনাথ মজুমদারের জন্ম। অল্পবয়সে পিতৃমাতৃহীন। স্বল্পশিক্ষিত। স্কুলের লেখাপড়াও বেশিদিন চালাতে পারেননি। 'অন্নবস্ত্রের ক্লেশ ও পুত্তকাদির অসদ্ভাবে আমাকে অধিক দিন বিদ্যালয়ে তিষ্ঠিয়া থাকিতে দিল না।' তবু অন্নবস্ত্রের ক্লেশ হলেও একান্নবর্ত্তী পরিবারে গ্রাসাচ্ছাদন চলে যেত বলেই মনে হয়। হরিনাথ ১৮৫৫ সালের ১৩ই জানুয়ারী কুমারখালিতে একটা বাঙলা পাঠশালা স্থাপন করে নিজেই অবৈতনিক শিক্ষক হিসাবে কাজ চালাতে থাকেন। এই পাঠশালা জনপ্রিয় হয় এবং ১৮৫৭ সালে ৯৫ জন ছাত্র ছিল বলে জানা যায়। ১৮৫৯-এ ৫ জন ছাত্র ছাত্রবৃত্তিও পায়। স্থানীয় দাতাদের

দান এবং সরকারি সাহায্যে স্কুল চলতে থাকে। হরিনাথ এই সময়ে এগারো টাকা বেতন পেতেন। পরে বেতন কুড়ি টাকা করা হলে তিনি তা গ্রহণ করেননি। তিনি লিখেছেন,—'আমি বিশ টাকা গ্রহণ করিলে নিম্নশ্রেণীস্থ শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না। আমি পনের টাকা গ্রহণ করিয়া নিম্নশ্রেণীর শিক্ষকদিগের যথাযোগ্য বেতন বৃদ্ধি করিয়া সুখী হইলাম। এই পনের টাকা পর্যন্তই আমার জীবনের বৈতনিক উপার্জ্জন।' তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৩ খণ্ড পাঠ করে তিনি বাংলা ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। পরে কিছুদিন সংবাদ প্রভাকরের সাংবাদিক হন এবং লেখার সুযোগ পান। বাকি তাঁর সহজাত প্রতিভা।

গ্রামবার্তা প্রকাশিকা আত্মীয়রঞ্জন বন্ধু-বান্ধবদের অর্থ সাহায্যে প্রায় ষোল বছর মাসিক ও পাক্ষিক হিসাবে চলে। ঋণভারে ও জরায় আক্রান্ত হয়ে হরিনাথ কাগজ বন্ধ করে দেন। পরে ১৮৮২-তে তাঁর শিষ্য অক্ষয়কুমার মৈত্র, জলধর সেন প্রভৃতির চেষ্টায় আবার চালু হয় এবং ১৮৮৪ পর্যন্ত চলে। ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'পত্রিকার কণ্ঠে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি শোভা পাইত :—

গুণালোকপ্রভা দোষপ্রদোষধ্বান্ত-চন্দ্রিকা।
রাজতে পত্রিকা নাম গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা॥

"_____হরিনাথ যেরূপ নির্ভীকভাবে 'দোষপ্রদোষ' বিধ্বস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট এবং পরগণার জমিদার, উভয়েই খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। হরিনাথকে হস্তগত করিবার জন্য অর্থলোভন ও তর্জ্জন গর্জ্জন প্রদর্শনের কিছুমাত্র ত্রুটি হইল না।_____"

হরিনাথ নিজে গ্রামবার্তায় লিখলেন, "অত্যাচার করিয়া একদিন না হয় দুদিন পার পাইবে, তিন দিনের দিন অবশ্যই তাহা রাজার কর্ণগোচর হইবে। আমরা এতদিন সহ্য করিয়াছি, আর করিতে পারি না। সকল কথা প্রকাশ করিয়া কর্তব্য সম্পাদন করিতে ত্রুটি করিব না। ইহাতে মারিতে হয় মার, কাটিতে হয় কাটু, যাহা করিতে হয় কর, প্রস্তুত আছি। ধর্মমন্দিরে ধর্ম্মালোচনা আর বাহিরে আসিয়া মনুষ্যশরীরে নিরপরাধে পাদুকা-প্রহার একথা আর গোপন করিতে পারি না_____।"

ব্রজেন্দ্রনাথের মন্তব্য, "হরিনাথ স্বদেশ সেবার জন্য জীবন দান করিতে প্রস্তুত হইলেও জমিদার লজ্জিত হইলেন না। তাঁহাকে নির্যাতন করিবার জন্য পল্লীবী গুণ্ডা পর্যন্ত নিযুক্ত হইল, অবশেষে কাঙাল হরিনাথেরই জয় হইল। কুমারখালীতে ছাপাখানা সংস্থাপন করিয়া এক পয়সা মূল্যে হরিনাথ গ্রামবার্তা বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন, কাঙাল হইয়াও প্রজাসমাজে হরিনাথই রাজা হইয়া উঠিলেন।"

এবার গ্রামবার্তা থেকে কিছু উৎকৃষ্ট নমুনা তুলে ধরছি। সবই অমর দত্তর সংকলন থেকে।

১২৭৬ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৬৯ মে

অন্যায় ও পক্ষপাত গাছে ফলে না কার্যো উৎপত্তি হয়?

আমরা জানিতাম ইংরাজ, মুসলমান, হিন্দু প্রভৃতি যে কোন জাতি হউন, রেইলওয়ের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ যে শ্রেণীর ভাড়া দেন, সেই শ্রেণীতে নিরাপদে গমন করিতে পারেন। ইহাতে সাদা কাল কি দাদা ভাই, এ প্রভেদটি নাই। কিন্তু নিম্নলিখিত ঘটনাটি আমাদের এই সংস্কারে সংশয় জন্মাইয়া দিতেছে।

পূর্বদেশগামী রেইলওয়ের কৃষ্টিয়া স্টেশনে ঢাকা প্রদেশীয় জনৈক প্রধান মুসলমান প্রথম শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করেন। কিন্তু শকটে উঠিবার সময় শকটারোহী ইংরাজরা তাঁহাকে উঠিতে দেন না। এই কথা স্টেশন মাস্টারকে জানাইলে তিনি তাঁহা একটি শকটে উঠাইয়া দিতে উদ্যোগ করেন। তথায়ও এরূপ দশা উপস্থিত হয়। তিনবার ঈদৃশী ঘটনা হইলে মুসলমান ভদ্রলোকটি প্রথম শ্রেণীর গমন করিবার আশা পরিত্যাগ করিয়া স্টেশন মাস্টারকে বলেন, 'আমি প্রথম শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করিয়াছি। তাহাতে গমন করিবার অনেক প্রতিবন্ধক হইতেছে। অতএব আমার টিকিট পরিবর্তন করিয়া অতিরিক্ত মূল্যের সহিত তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট প্রদান করুন। সেই কথার প্রতি তিনি মনোযোগ না করায় ভদ্রলোকটি অগত্যা প্রথম শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করিয়া তৃতীয় শ্রেণীতে গমন করিলেন।

স্টেশনে যে সকল বাঙালী কর্ম্মচারী ছিলেন, শুনিলাম তাঁহারা পরস্পর ঐ কথার আন্দোলন করেন। তাহাতে কোন প্রধান ইংরাজ কর্ম্মচারী বিরক্ত হইয়া ইহাদিগের নামে কর্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট রিপোর্ট করায় ইহারা সকলেই মন্তব্যের চাপে পতিত হইয়াছেন। এমনকি তাঁহারা ঐ বিষয়ের বিশিষ্ট প্রমান প্রদর্শন করিতে না পারিলে কর্ম্মচ্যুত হইতে পারেন। আমরা তন্জ্ঞানে এই মাত্র জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই সকল ভদ্র সন্তানগুলির অপরাধ কি? একজন ভদ্রলোক প্রথম শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করিয়া যটাচক্রে তৃতীয় শ্রেণীতে গমন করিলেন, ইহা ন্যায়সঙ্গত হয় নাই। যাঁহার ন্যায়পরতা আছে তিনি তাহা অবশ্যই বলিবেন। তন্নিমিত্ত যিনি অসন্তুষ্ট হয়েন। তিনি কিরূপ মনুষ্য তাহা পাঠকগণই বিবেচনা করুন_____ তবে ভবিষ্যতে আর এরূপ কার্য্য না হয় তন্নিমিত্ত সকলকেই সতর্ক করিয়া বলিতেছি বিনাপরাধে ক্ষুদিরাম ভায়া গুলি মারা না যান। রেইলওয়ে কোম্পানী উপযুক্ত ভাড়ানুসারে গাড়ি প্রদান করিবেন, তাহাতে বর্ণভেদ করিবার কোন ব্যবস্থা নাই। যাঁহাদিগের দোষে ঐ সকল ঘটনা উপস্থিত হয়, তাঁহারা শাসিত না হইলে, কোম্পানীর ব্যবসায়ে ক্রমান্বয়ে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে। যে সকল ইংরাজেরা বাঙালিদিগের সহিত একাসনে বসিতে অপমান বোধ করেন, যদি কোম্পানী তাহাদিগের অনুরোধ পরিত্যাগ করিতে না পারেন, তবে ইংরাজ শকট নামাঙ্কিত করিয়া আর এক শ্রেণী শকট প্রস্তুত করুন। তাহা হইলে বাঙালীরা

তাহাতে কখন উঠিতে যাইবেন না।_____

আমাদের দেশীয় ধার্ম্মিকাভিমানী গোস্বামীগণ অন্যের সহিত একাসনে বসিতে হইবে, এই আশঙ্কায় এক এক খানি আসন হাতে করিয়া সর্ব্বত্র যাতায়াত করেন। না হয় তাঁহারাও তদ্রূপ আসন গ্রহণ করিয়া রেইলওয়ের শকটে উঠিলেও মান রক্ষা হইতে পারে। কারণ তাঁহারা যে গাড়িতে আসীন থাকিবেন, সেই গাড়িতে যদি কোন বাঙ্গালী উঠেন, তবে তৎক্ষণাৎ সেই আসনখানি পাতিয়া উচ্চ হইয়া বসিলেই মান রক্ষা হইবে।

এই প্রতিবেদনে তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতা, বর্ণবিদ্বেষের তীব্র সমালোচনা এবং বিদ্রূপ একই সঙ্গে প্রাণ পেয়েছে।

দ্বিতীয় উদাহরণ

১২৭৬ শ্রাবণ। ১৮৬৯ আগষ্ট

সভ্যতা ও স্বাধীনতা।

আমাদিগের নব্য দল সভ্যতা ও স্বাধীনতা ধরিয়া আজকাল কষ্টই টানাটানি করিতেছেন। কেহ ইংরাজদিগের ন্যায় বস্ত্র পরিধানই সভ্যতা ও স্বাধীনতার পরাকাষ্ঠা মনে করিতেছেন, কেহ ইংরাজ ভোজ্যে শরীর রক্ষা করাই সভ্যতা ও স্বাধীনতার মূল ভাবিতেছেন, কেহ মদ্যপানকে সভ্যতা ও স্বাধীনতা বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। বাস্তবিক ইহারা সকল বিষয়ে অত্যন্ত অনুকরণ-প্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। যে যাহা বলিতেছে, ইহারা তাহার উপকারিতা ও অপকারিতা এবং দেশকাল পাত্র বিবেচনা না করিয়া তাহাতেই নৃত্য করিয়া উঠিতেছেন।

অতএব এক্ষণে দেখা আবশ্যক, আমাদিগের কতদূর স্বাধীনতা আছে। যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই দেখিতে পাই, সামান্য প্রকারে কৃষিকার্য্য ব্যতীত কোন বিষয়েই আমাদিগের স্বাধীনতা নাই। অধিক কি একটি সূত্রের নিমিত্তও আমরা পরাধীন হইয়া আছি। বাস্তবিক স্বাধীন ব্যবসায়ই স্বাধীনতার লক্ষণ। তহা আমরা কিছুই জানি না। সূতরাং আমরা সম্পূর্ণরূপে পরাধীন।___আমরা ক্রমাগত যতই সেবা বৃত্তির অনুবর্ত্তী হইতেছি, ততই স্বাধীনতা হারাইতেছি। কেবল যাহা ইচ্ছা তাহাই আহার, যাহা ইচ্ছা তাহাই পান করা প্রভৃতি স্বেচ্ছাচারকে স্বাধীনতা বলিয়া আকর্ষণ করিতেছি। আমাদের মধ্যে কেহ ভাবিতেছেন, স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া পথে পথে ভ্রমণ করিতে পারিলেই আমরা স্বাধীনতার ভর্ত্তা হইলাম, কেহ কেহ প্রকাশ্যরূপে মদ্য পানকেই স্বাধীনতা মনে করিতেছেন। বাস্তবিক প্রকৃত স্বাধীনতা যাহাকে বলে, তাহার নিকট দিয়াও যাইতেছেন না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্বাধীন ব্যবসায়ই স্বাধীনতার নিদান। এক্ষণে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিতে পারি, সভ্যাভিমানী স্বাধীনতাপ্রিয়, আমাদিগের নব্য দলের মধ্যে কতজন স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন? কতজন স্বয়ং সূত্রর কল, বস্ত্রবয়নের কল ও জাহাজ চালাইতে পারেন? কেবল পরের দাসত্ব করিয়া আমরা সভ্য, আমরা স্বাধীন, আমরা বিদ্বান বলিয়া দেশীয় গৌরবের মস্তকে পদার্পন করিতেছেন। অতএব আমরা সবিনয় নব্য ভ্রাতাদিগকে বলিতেছি তাঁহারা ক্রমে ক্রমে স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া যথার্থ স্বাধীন হউন, জলপান করিয়া দুগ্ধ পান করিতেছি, একথা আর বলিবেন না।

এই সর্বসাধারণের পক্ষে প্রযোজ্য ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং স্বাধীনতার বিষয় থেকে এবারে প্রকৃত গ্রামবার্তার অকূলে যাওয়া যাক।

১২৭৬ সাল, বৈশাখ। ১৮৬৯ এপ্রিল

যশোহর : এই বিভাগে গত বৎসর ভালরূপ শস্যোৎপন্ন হয় নাই। বর্ষাকালেই এ প্রদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে, গত বৎসর তাহার নূন্যতায় বাণিজ্যেরও অবস্থা মন্দ গিয়াছে। জমিদারেরা পূর্বাপেক্ষা অনেক শান্ত প্রকৃতি হইয়াছেন, কর্ম্মচারীদিগের প্রতি ব্যবহারের অবস্থা পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে। নীলকুঠির,কার্য্য যাহা কিছু ছিল, তাহাও রহিত হইয়াছে। যশোহর হইতে চাকদহ পর্যন্ত ডাকের গাড়ি খুলিয়াছে। জয় এই জেলার চিপ সহর ও ওলাউঠা প্রিয়তমা কন্যা, কেন না নলডাঙ্গায় তাহার জন্ম হয়। সূতরাং বিগত পৌষ মাসে ভয়ানক ওলাউঠা উপস্থিত হইয়া অনেক লোক সংহার করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে বসন্ত রোগও উপস্থিত হয়। ভৈরব নদের নিকটে ওলাউঠার প্রাদুর্ভব হওয়াতে অনেকে অন্যমান করিয়াছেন, তাহার দলদমপূর্ণ গর্ত্তেই ওলাউঠা বাস করে। উক্ত নদ সংস্কারার্থ তিন বৎসর গত হইল, প্রায় দুই লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু খাল খননের কথাটিও নাই।

অথচ সতীশচন্দ্র মিত্রর যশোর-খুলনার ইতিহাস গ্রন্থে জানা যায় এই অঞ্চল আগে স্বাস্থ্যকর বলেই প্রসিদ্ধ ছিল।

ফরিদপুর।

ধান্য মন্দ জন্মিয়া ছিল না। কিন্তু রবিখন্দের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। এখানকার গভর্ণমেন্টের ইংরাজী বিদ্যালয় গত বৎসর অধম শ্রেণীতে পরিণতি হইয়াছে। বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ের অবস্থা মন্দ নহে। বিচার কার্য্য ভালরূপই নির্ব্বাহিত হয়। কিন্তু আমলাগণের সাধারণতঃ কিরাপতির চক্ষে ধূলি দেওয়া নিঃশেষিত হয় নাই। গভর্ণমেন্টের হাসপাতালে অনাথদিগের চিকিৎসার সুবিধা অল্প। দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের নিতান্ত প্রয়োজন। গত বৎসর বৈশাখ মাসে এখানে ভয়ানক ওলাউঠা উপস্থিত হয়াছিল কিন্তু তাহাতে অধিক লোকের মৃত্যু হয় নাই। গত বৎসর এ প্রদেশের লোকের অত্যন্ত জলকষ্ট গিয়াছে। নগরে যে কিছু জলাশয় আছে, তাহার অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতেছে। মিউনিসিপ্যাল ট্যাকস্ লোকদিগের অশ্রীতিকর। তদ্ব্যূরা শাসনও ভাল হইতেছে না।

গ্রামীণ সমাজ বিশ্লেষণে গ্রামবার্তার অবিস্মরণীয় নমুনা :

১২৭৫ মাঘ। ১৮৭০ জানুয়ারি।

মধ্যবৃত্তিলোক ও কৃষিকার্য :

আমরা মধ্যবৃত্তি লোকের অবস্থা আলোচনা করিয়া অদ্য এই প্রস্তবটি লিখিতে বাধ্য হইলাম। এই অবস্থাপন্ন অধিকাংশে লোকেই পূর্ব্বে জোতজমা রাখিয়া কৃষিকার্য্যাবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। অল্প সংখ্যক লোকমাত্র দাসত্বে নিযুক্ত ছিলেন। নীলকুঠির খাতার হাঙ্গামায় ও জমিদারদের শোষণের স্পৃহায় জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে অসমর্থ হইয়া অনেকে জোতজমা ছাড়িয়া দেন। এদেশে শিল্পকর্ম বিরল, চাকুরিও ক্রমে দুর্লভ পদার্থ হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং কতকগুলি লোক নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছেন। বংশ মর্যাদার অনুরোধে ইহারা কুলী ও মুটিয়ার কার্য করিতে পারেন না ব্যবসায়ীদিরও সুবিধা অল্প, এই নিমিত্ত কষ্ট পাইয়া থাকেন। পুত্রদিগকে ভালরূপ লেখাপড়া শিখাইয়া চাকুরিয়ার দলপুষ্টি করিতেও অনেকে সমর্থ নহেন। বালকদিগকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্যন্ত ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া অনেকের ভাগ্যে থাকিয়া উঠে না___অধিকাংশ লোকেই পুত্রদিগকে কেবল বাঙ্গালা অধ্যায়ন করান। শিক্ষকতা কার্য্যই পরিশেষে ইহাদিগের জীবনোপায় হইয়া থাকে। সুতরাং মধ্যমাবস্থ লোকের অবস্থা উন্নত হইয়াছে একথা আমরা কিরূপে স্বীকার করিতে পারি।

দ্বিতীয় নমুনা ঃ

১২৭৯ আষাঢ়। ১৮৭২ জুলাই ৪র্থ সপ্তাহ

গ্রামীয় জঙ্গাল ঃ

মাথায় টুপি, হাতে ছড়ি, পেন্টুলন পরা যেমন ইংলন্ডীয় কতকগুলি জঙ্গাল, এদেশের স্কন্ধে নির্ভর করিয়া এবং গভর্ণমেন্টের চোখে ধূলা দিয়া আপনাদিগের স্বার্থ সাধন করিতেছে সেইরূপ আবার কতকগুলি গ্রামীয় জঙ্গাল, মফঃস্বলের হাকিমদিগের চক্ষে টুপি দিয়া, মোকদ্দমার গাছে ঘুরাইতেছে এবং প্রজার অর্থে আপনাদিগের ভোগবাসনা চরিতার্থ করিতেছে। ইহারা জমিদার কি মহাজন কোন শ্রেণীর লোকই নহে অথচ সকল কর্ম্মেই হাত দিয়া থাকে। ইহাদিগের হাতে যে তেজারতি, ভূসম্পত্তি ও অন্য কর্ম্মকাজ আছে, সে কেবল আচরণ ও উপলক্ষ মাত্র। বস্তুতঃ পরস্পর বিবাদ ঘটাইয়া মধ্য হইতে লাভ করাই ইহাদিগের ব্যবসায়। ইহারা চোরকে চুরি করিতে ও গৃহস্থকে জাগ্রত থাকিতে বলে। মহাজনকে জাল খত করিতে উপদেশ দেয় এবং খাতকের সহায় হইয়া মোকদ্দমার জবাব দিয়া থাকে। মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা ইহাদিগের অর্থাগমের সুলভ পথ। বস্তুতঃ ইহারা করিতে না পারে, এরূপ কার্য্যই নাই। ইহারা, ত্রিফলা (আমলা, মোক্তার, উকীল) দিগের বড় প্রিয়পাত্র। কারণ ইহারা না থাকিলে ঐ সকল ব্যক্তির অর্থাগমের পথ প্রায় রুদ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং কোন ব্যক্তি ইহাদিগের গাত্র স্পর্শ করিলে, ত্রিফলা মহাশয়রা বিনা পয়সায় যথাসাধ্য ইহাদিগের উপকার করিয়া থাকেন। অধিক কি, জমিদাররাও ঐ সকল দুষ্ট লোককে অতিশয় ভয় করেন। কোনও কোনও জমিদার কিছু কিছু মাসিক বেতন দিয়া গ্রামীয় জঙ্গাল বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন। কি ফৌজদারী, কি দেওয়ানী, গ্রামীয় যতপ্রকার মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হয়, ঐ সকল দুষ্ট লোকেরাই তাহার অধিকাংশ পাঠাইয়া থাকে। অনেক জমিদারের জৈন্তলদার ও পাটওয়ারীও ঐ ব্যবসায় করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জন করে। গ্রামবাসী জোদ্দার প্রভৃতির পুত্র কিছু লেখাপড়া শিখিয়া চালাক হইলেই ঐ ব্যবসায়ে ব্রতী হয়। পল্লীগ্রামে ইহাদিগের এতদূর ক্ষমতা যে, ইহারা কখনও কখনও খুন পর্য্যন্ত গোপন করিয়া থাকে।

শুধু সমাজবিশ্লেষণ নয়, দ্বিতীয় প্রতিবেদনে শ্লেষবিদ্রূপও ভাষার মতই শানিত।

এই শ্লেষের পরিচয় অন্যত্রও ছড়িয়ে আছে যেমন,

১২৭৯ আষাঢ়। ১৮৭২ জুন প্রথম সপ্তাহ।

জলকর্জ্জ ঃ কোন গৃহস্থের বাটীতে হঠাৎ কূটুম্বাদি উপস্থিত হইলে ঘরে যদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি না থাকে তবে পরস্পর প্রতিবেশীরা কাচ্চ বাতীত অন্য দ্রব্য ধারে আদান প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু কেহ জল ধারে আদান প্রদান করিয়াছেন এরূপ কখনও শুনা যায় নাই। আমাদিগের একজন আত্মীয় বলিলেন--কৃষিয়ায় অন্তঃপাতী রিফাইডপুর অঞ্চলে কোন গৃহস্থের বাটিতে কুটুম্ব উপস্থিত হইলে গৃহস্বামীকে দুই ঘটি জল ধার করিতে হয়। ভালুকিয়া প্রদেশে দুই জন ভদ্রলোক, কোন পল্লীতে স্নান করিবার নিমিত্ত, দুই ঘটি জল গ্রহণ করাতে, গৃহস্বামী নিষেধ করিয়া বলিলেন--মহাশয়। ইহার অতিরিক্ত জল গ্রহণ করিলে কুলাইতে পারিব না।

১২৭৯ আষাঢ়। ১৮৭২ জুন। দ্বিতীয় সপ্তাহ ঃ পত্র

কন্যা বিক্রয় ঃ

মহকুমা ঝিনুইদহের অধীন, কোন পল্লীতে এক ব্রাহ্মণের একটি কন্যা ছিল। সাত আট বৎসর হইল, কন্যাটি লাটে উঠে। কেবল বেশি টাকা পাওয়ার জন্য এতাবৎ অবিবাহিত রাখা হয়। এক্ষণে তাহার বয়ঃক্রম ১৭ বৎসর। কোন ব্যক্তি উক্ত কন্যার মূল্য ৭০০ টাকা বলিয়াছিলেন। তাহাতে কন্যা কর্ত্তা রাগান্বিত হইয়া উত্তর দিয়াছিলেন। আমার মেয়ের একখানা ঠাঙের মূল্য ৭০০ টাকা। এই কথা শুনিবামাত্র সে ব্যক্তি অবাক হইয়া প্রস্থান করিল। সম্প্রতি উক্ত কন্যা ৯৫০ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে।

হরিনাথ আবার হাল্কা সুরেও ঠাট্টা করেছেন। যেমন,--

১২৭৯ মাঘ। ১৮৭৩ জানুয়ারী। প্রথম সপ্তাহ

"ঘরে ছুঁচোর কীর্ত্তন, বাইরে কোঁচার পত্তন"।

স্কুল ও পাঠশালার ছাত্রদিগকে জিজ্ঞাসা কর, ইংলন্ডের টেমস নদী দিয়া কোন্ কোন্ স্থানে গমন করা যায়। ঐ দেশে কয়টি পর্বত আছে। তোত্ত পাখীর ন্যায় উত্তর প্রদান করিবেন। আবার ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, কোন্ কোন্ নদী দিয়া বরিসালে যাইতে হয়। দিনাজপুর গমনের সুগম পথ কোনটি। চক্ষুস্থির হইবে,

কোন উত্তর দিতে পারিবেন না। সংবাদপত্রের পাঠক, আমেরিকার অবস্থা, ফ্রান্সের ঘটনা, চিনের বাণিজ্য বিশেষ রূপে অবগত আছেন, এবং ইংলন্ডে ১০০০ টাকায় একটি কুকুর বিক্রয় হইয়াছে, জাপানে শ্বেতহস্তী পাওয়া গিয়াছে ইত্যাদি সংবাদ পাঠ করিতে ভালবাসেন। গৃহের সন্নিকট গ্রাম পল্লীবাসী কৃষক প্রভৃতির কি অবস্থা, দেশীয় বাণিজ্যের কি কি অন্তরায়, অনেকেই ইহার কিছুই অবগত নহেন। সাধারণকে ঐ বিষয় অবগত করিতে গ্রামবার্তা প্রকাশিত হয়।

সর্বশেষে ভূসব মুখোপাধ্যায়ের এক সাক্ষাৎকারের সরস বর্ণনা ঃ

১২৭৬ চৈত্র। ১৮৭০ মার্চ, প্রথম পক্ষ।

কোন স্কুল ডেপুটি ইনেস্পেক্টর বাবুর প্রমুখাৎ শুনিলাম, স্কুল সমূহের ইনেস্পেক্টর ভূদেববাবু কার্য্য উপলক্ষে যশোহরে গমন করেন এবং পাড়াগাঁয়ের কোন প্রধান জমিদারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। তাহাতে জমিদারবাবু এইরূপ প্রশ্ন ও ইনেস্পেক্টরবাবু এইরূপ উত্তর করেন।

উপস্থিত জমিদারবাবুর প্রশ্ন--তোমার বাড়ী কোথায়? কি কর?

দণ্ডায়মান ইনেস্পেক্টরবাবুর উত্তর--হুগলী। স্কুল সমূহ পরিদর্শন করি।

--কোথাকার কোথাকার স্কুল?

--যশোহর। বর্দ্ধমান। পাবনা প্রভৃতি স্থানের।

--যাতায়াতের খরচ কে দেয়?

--গভর্ণমেন্ট।

--বারে বারে কত খরচ লাগে?

--সংখ্যাবধারিত নাই, তবে ৩০০, ৪০০, ৫০০ তবে যখন যাহা আবশ্যক হয়।

--তুমি স্কুলের গুরুমহাশয়?

--না, আমি গুরুমহাশয়দিগের কার্য্য পরিদর্শন করিয়া থাকি।

--তোমার বেতন কি?

--মাসিক ৭৫০ টাকা।

--এই কথায় বাবু উচ্চৈস্বরে বলেন, 'উল্লারে ভাল্লা' এক ঠেলায় এত মাহিনে। বস বস তামাক দেরে তামাক দে।

কাঙাল হরিনাথের অপর পরিচয়--ফিকির চাঁদ ফকির হিসাবে। বাউল গানের কাণ্ডারী। তাঁর 'ভাব মন দিবানিশি, অবিনাশি' 'আমি কোরব এ রাখালী কতকাল, দিন ত গেল, যদি ডাকার মত পরিতাম ডকতে' ইত্যাদি পথে প্রান্তরে প্রচলিত। কিন্তু বাউল গানেও গ্রামবার্তা প্রকাশিত হয়েছে--এমনই একটি গান ঃ

১। দেশে চলিলে মহামতি রিপণ।
রামরাজ্য সম প্রজা করিয়ে পালন।

৪। ভিক্টোরিয়া মাতা যখন, জিজ্ঞাসিবে বল তখন,
(কেবল নাম রয়েছে সোনার ভারত) (সকল হারায়েছে)
সোনার খনি নাই আর এখন, বায়ত-ভুবন।

৫। দুর্ভিক্ষ প্রতি বছরে। অন্ন বিনা প্রজা মরে।
(মায়ের কাছে বল এই ভিক্টোরিয়া)
ম্যালেরিয়া মহাজুরে, নাশে প্রজাগণ।

_____ইত্যাদি।

সাহিত্যকার হিসাবেও তিনি স্মরণীয়। বিজয়বসন্ত (উপন্যাস, ১৮৫৯), পদ্য পুণ্ডরীক (পদ্য, ১৮৬২)। চারু চরিত্র (পদ্য, ১৮৬৩)। কবিতা কৌমুদী (১৮৬৬), সাবিত্রী নাটিকা (১২৮১), চিত্তচপলা (উপন্যাস, ১৮৭৬), একলব্যের অধ্যবসায় (বালক পাঠ্য), ভাবোচ্ছ্বাস (নাটক) ইত্যাদি তাঁর বহু সাহিত্য কীর্তি বঙ্গ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু সে সব এ প্রবন্ধের বিবেচ্য নয়। গ্রামীণ সংবাদের পরিবেশক ও ভাষ্যকার হিসাবে তাঁর অদ্বিতীয় ভূমিকাই এখানে তাঁর মৃত্যুশতবর্ষে স্মরণ করা হল।

গত সংখ্যায় 'কাশ্মীর কি রাষ্ট্রীয় অভিশাপ____' নিবন্ধে ২৫৮ পৃষ্ঠায় ২য় কলমের দ্বিতীয় পারায় মুদ্রিত "৮৪ বর্গমাইল" ভুল, পড়তে হবে "কাশ্মীর উপত্যকার ৮৬৩৯ বর্গমাইল"। তাছাড়া ২৬২ পৃষ্ঠায় প্রথম কলমে ১১নং লাইনে "১৯৮২" নয়, হবে "১৯৮৮ সনের"।

অরুণ মিত্রের কবিতা ঃ কথকতা ও গদ্যরীতি

পরিমল চক্রবর্তী

তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ঘনিষ্ঠ তাপ'-এ অরুণ মিত্র তাঁর কাব্যাঙ্গিকে বিপ্লব ঘটিয়েছেন। হ্যাঁ, একে আমি বিপ্লবই বলব; কেননা মাত্র একটি গ্রন্থের ('উৎসের দিকে') ব্যবধানে 'প্রান্তরেখা' থেকে 'ঘনিষ্ঠ তাপ'-এ তাঁর কবিতার আঙ্গিকগত বিবর্তনের বিস্ময়করতাকে বিপ্লব ব্যতীত অন্য কোন অভিধায় অভিহিত করব? অথবা যদি করি, তাহলে তো তাঁর কবিতার অঙ্গপ্রকরণের আমূল রূপান্তরের বিবেচনায়, 'বিপ্লব' কথাটারই অর্থচ্যুতি ঘটে। 'ঘনিষ্ঠ তাপ'-এ তিনি 'প্রান্তরেখা'-র পুরনো, প্রথাবদ্ধ পদারীতিটি একেবারেই পরিত্যাগ করলেন, পরিহার করলেন কবিতার পংক্তিগত অন্ত্যমিল। অথচ তাঁর মতো ছন্দ-কুশলী কবি, পদ্যছন্দে একাগ্রচিত্তে নিবিষ্ট থাকলে, সে-পথেও যে অনেকদূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারতেন, সেই ছন্দের সম্ভবনাকে সম্পূর্ণতার পথে আরও অনেকখানি এগিয়ে দিতে পারতেন, তার বহু নিদর্শন তো 'প্রান্তরেখা'-র আদ্যোপান্তই এবং 'উৎসের দিকে'-র দু'-একটি ('জয়গান', 'বিষ' ইত্যাদি) কবিতাতেও উজ্জ্বলভাবে বিদ্যমান। কিন্তু সেই পুরনো পথে তিনি আর ফিরে গেলেন না, পা বাড়ালেন অভিনব এক ছন্দের জগতে। কবিতাকে তিনি মুক্তি দিলেন পদছন্দের সূত্র থেকে, সবেগে ধাবিত করালেন গদ্যছন্দের উন্মুক্ত প্রান্তরে। তাঁর কবিতার চেহারায় আমূল পরিবর্তন এল, রাত্তরাতি, অবিশ্বাস্যভাবে। কবিতায় ভাবের বাহন হিসাবে তিনি অবলম্বন করলেন কথ্য-গদ্য, স্তবকে বিন্যস্ত করলেন অবিকল গদ্যের ধরণে। ফলত, দৃশ্যত গদ্যের ও পদ্যের আকৃতিগত প্রচলিত ব্যবধান তাঁর কবিতা থেকে অবলুপ্ত হল, সীমারেখা মুছে গেল পদ্যের ও গদ্যের। কিন্তু মূলগতভাবে কবিত্ব থেকে ক্ষ্যিত হয়নি তাঁর কবিতা; বরং গদ্যের সেই সংযত অবয়বে, সংযমশাসিত বাক্যবন্ধে ভাবের স্ফুরণ অরও উজ্জ্বল ও শানিত হয়েছে। কথকতার (এবং কথোপকথনেরও) ঘরোয়া ভঙ্গিতে তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছে আরও গাঢ়, গভীর, অন্তরস্পর্শী। কথকতার এই অন্তরঙ্গ নব্য রীতিটির প্রবর্তনার পর থেকেই তাঁর কবিতায় কথকতায় আবিষ্ট এক নেপথ্য শ্রোতার অলক্ষ্য উপস্থিতি আমরা প্রায় সর্বদাই টের পাই, অনুভব করতে থাকি।

'ঘনিষ্ঠ তাপ'-এর প্রারম্ভিক আঠারোটি কবিতার প্রায় প্রতিটিরই পৃথক পর্যালোচনা থেকে এই মন্তব্যটিকে বিশদীকৃত করা সম্ভব। কিন্তু আমার মনে হয়, তা নিষ্প্রয়োজন; কেননা বিষয়ের বিভিন্নতা সত্ত্বেও একটি বিশেষ অনুভূতি অভিন্নতার সূত্রে সব কটি কবিতাই অন্তর্গ্রথিত। এই যে অনুভূতি, বিকল্পবিহীনতায় যার নিরুপায় নামকরণ 'সর্বানুভূতি', তারই আভায় এই কবিতাগুলি দ্যুতিময়। তাঁর এই অনুভূতির স্ফুরণ অবশ্য প্রথম লক্ষ্য করা গিয়েছিল 'উৎসের দিকে'-র কয়েকটি কবিতাতেই; কিন্তু তা যে আরও প্রসারিত হয়ে পড়ার জন্য তাঁর কবিচৈতন্যে সেদিন অপেক্ষমান ছিল, সেটা বোঝা গেল 'ঘনিষ্ঠ তাপ'-এর এই কবিতাগুলিতে উপনীত হয়ে। ব্যাপ্তির আধিক্যের দরুণ সেই অনুভূতির স্বরূপ ও স্নাতজ্ঞা এখানে আরও স্পষ্ট। তা যে মূলগতভাবেই বিশ্ব-নিখিলের সমস্ত কিছুর সঙ্গে অন্তরঙ্গতায় সম্পর্কিত, যেন তারই নিদর্শনস্বরূপ এই গ্রন্থের প্রথম কবিতাটির অনিবার্য নামকরণ 'অন্তরঙ্গ' এবং তার প্রথম বাক্যটিতেই কথকতার ভঙ্গিতে গভীর অন্তরঙ্গতার সুর ঃ—

'ঠাহর করে দেখে বুঝলাম এই ভিড়ের মধ্যে যারা আছে তারা প্রত্যেকেই আমার খুব অন্তরঙ্গ।'

কবিতাটির অবশিষ্ট অংশের সবটুকুই ব্যয়িত হয়েছে 'এই ভিড়ে' অন্তর্গত মানুষজনের সঙ্গে কবির সম্পর্কের স্বরূপ উন্মোচনে ও উপলব্ধিতে, যার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটেছে একটি একাগ্র ইচ্ছায় ঃ—

'আমার ভয়ানক ইচ্ছে হল তাদের সমস্ত হাতের উপর আমার হাত রাখি।' এই কবিতাটিতে ভিড়ের অসহায় ও অনাত্মীয় মানুষের জন্য নতুন এক রূপাভাস রচনাও কবির অন্বিষ্ট এবং সেই অন্বেষাতেই সকলের সঙ্গে তাঁকেও 'নেমে আসতে হয়েছিল—আকাঙ্ক্ষার পোড়ামাটিতে।' আর, সেই 'পোড়ামাটিতে' দাঁড়িয়েই, কবিতাটির উপসংহারে পৌঁছে, একটিমাত্র পংক্তি ও বাক্যের স্তবকে (হ্যাঁ, এক পংক্তির এই বাক্যটিই একটি স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ স্তবক) সমগ্র কবিতাটির অনুভূতির সারাংশসারের উন্মোচন—উত্তেজনার স্পর্শলেশহীন, বাহুল্যবর্জিত কিন্তু নিবিড় অন্তরঙ্গতার প্রত্যয়ী উচ্চারণ ঃ 'তারা সব আমার রক্তের দোসর।'

কবি তাঁর এই 'রক্তের দোসর'দের সঙ্গে নিয়েই এই কথ্য-রীতিতে এগোতে চেয়েছেন। তাদের ক্ষুদ্র ও সমমর্মিতার চোরাটানে এগোতে এগোতেই বিচ্ছেদের 'কাঁটাতারের সামনে এসে থেমে পড়তে' হয়েছে তাঁকে, সেই 'কাঁটাতারের উপর হাত বাড়িয়ে' ধ'রে তিনি অনুভব করেছেন 'কেবল শূন্যের চাপ' এবং ফলে, তাঁর মনে হৃদয়-বিদীর্ণ-করা প্রশ্ন জেগেছে, বিচ্ছেদের অবসানের 'ভূমিকম্পের আর দেরি কত?' ('কাঁটাতার'); 'ঘুমের দরজা ঠেলে' বেরিয়ে এসে গভীর অন্তরঙ্গতায় কারা যেন তাঁকে বলেছে 'কেবল জল আর নরম মাটির কথা।' ('ঘুমের দরজা ঠেলে'); নিজের ঘরে বসে থেকেও তিনি অনুভব করেছেন 'আপেপাশে গাছের পাতাগুলো এক সময় অসংখ্য প্রদীপ হ'য়ে যায়, তাদের রোশ-নাইয়ের একটা রেশ আমার চোখ দুটোকে ছুঁই-ছুঁই করে'—('বেশ

বুঝতে পারি মাটি হেসে উঠেছে প্রাণ খুলে' এবং একদিন 'আমি ওইসব আলো-হাওয়ার শরিক হ'য়ে যাব।' ('ঘরের মধ্যে')। এই আশ্চর্য অন্তরঙ্গতার আবেশেই সামান্য 'একটি দোকান', তুচ্ছ 'একটি গলি', চুন-বালি-খসা নগণ্য একটি 'বাড়ি'ও তাঁর চোখে বহুমূল্য হয়ে উঠেছে, তিনি সেগুলিকেও তাঁর কবিতার বিষয়ে পরিণত করেছেন। এবং এই আবেশের ঘোরেই তাঁর কবিতায় আবার ফিরে এসেছে তাঁর 'তুমি' আর 'আমি'; তাদের নিয়ে আবার আরম্ভ হয়েছে আচ্ছন্নের মতো তাঁর অন্তরঙ্গ উচ্চারণ—'আমার স্পর্শ নিয়ে তুমি পাথর মাটির সঙ্গে একাকার হয়ে যেতে চাও। যেখানে চিরকালের মতো আমি তোমায় চেকে থাকবো।' ('এই প্রান্তে')। এইসব অজ্ঞাত-অখ্যাত-আপন লোকজন ও নিসর্গ-প্রকৃতিকে সঙ্গী করেই এই পর্বে তাঁর অগ্রগামিতা। এই অগ্রগামিতায় দু'-একটি কবিতায় লেগেছে গল্পের আমেজ—বিশুদ্ধ গল্পের, যেমন 'যাত্রী' কবিতায়, যেটিতে আছে 'একগলা ঘোমটা-টানা বউ, জোয়ান মরদ, ছেলে বুড়ো সকলে', যেমন 'মেলা' কবিতাটিতে, যেটিতে 'এক দৌড়ে এক্কেবারে ছেলেবেলায় গিয়ে' থেমেছেন তিনি। আর আছে কোনও কোনও কবিতায় তাঁর এই অন্তরঙ্গদের অন্তরের নিঃসঙ্গতার বেদনাকে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে পরখ করার আকুতি। তিনি ব্যথিত বিস্ময়ে দেখেছেন, এদেরই দু'জন 'গাঁয়ের আবছা কোণে দু'খানা পোড়া রুটি সামনে নিয়ে বসে আছে।' ('দুজনকে দেখেছিলাম'); অনুভব করেছেন, যে-রিকশাওয়ালা গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত-নির্বিশেষে বারোমাস 'সঙ্গের পর ছেলে-বউকে অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দিয়ে—বেরিয়ে পড়ে', 'খুব সম্ভব কোনও একদিন—ভেতরের আগুনটা নিবে গিয়ে সে ঠাণ্ডায় জমে পাথর হ'য়ে কোথাও পড়ে থাকবে।' ('রিকশাওয়ালা')। 'শরতের ভোরের সীমানায়' তিনি 'অন্ধ' যে-ইতিহাস ব'য়ে এনেছেন, তা তো বস্তুত তাঁর এই অন্তরঙ্গদেরই অশ্রুসিক্ত ইতিহাস। 'একান্তে' কবিতায় তিনি দৃষ্টি ও অনুভূতির মধ্যবর্তী বাস্তবতা-অবাস্তবতায় মৃদু তরঙ্গদোলিত ঃ—"আমায় যে সর্তর্পণে এসে জাগায়/তাকে আমি দেখতে পাই না/কিন্তু তার মুখে ভোরবেলাকার মুগ্ধতার সৌরভ,/তাকে আমি দেখতে পাইনা/কিন্তু আমার করতলে/দিনের দূর উৎসের অনুভব।"

আবার 'কোলাহল' কবিতায় তিনি রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষমান ঃ—"কখন নিঃশ্বাস শুনতে পাবার মতো রাত্রি আসবে/তার জন্য অপেক্ষা করছি/সেই প্রশান্তির দিকে ফিরে আছি।"

কিন্তু পদ্যছন্দকে তিনি পরিত্যাগ করলেন কেন? কেন তিনি তার খোলশ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন অঙ্গাবরণে তাঁর কবিতাকে আবৃত করলেন, সজ্জিত করলেন নিপাট গদ্যের অঙ্গাভরণে? আর, স্ফুরিত বাক্যবন্ধের নিরেট গদ্যের এই যে অভিনব কাব্যাঙ্গিক, যা তিনি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন তাঁর ভাব-ভাবনার প্রকাশরূপে, তাঁর আবেগ-অনুভূতির উন্মোচক হিসাবে, যা তাঁর কবিতায় সত্যিই নতুন শক্তি ও গতি সঞ্চারিত—হয়ত একটা নতুন মাত্রাও সংযোজিত—করেছে এবং যা তাঁর গ্রন্থ-পরম্পরায় ক্রমেই হয়ে উঠেছে তাঁর কাব্যবৈশিষ্ট্যের অন্যত্ত উল্লেখযোগ্য একটি দিক, কবি হিসাবে তাঁর চারিত্রিক মৌলিনার (originality) অন্যতম প্রধান পরিচায়ক, তাতে আত্মস্থ হওয়াই বা তাঁর পক্ষে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল কেন? কার বা কোন্ প্রভাবে, কখন থেকে?

সৌভাগ্যত, উত্থাপিত প্রশ্নগুলির কোনওটিরই উত্তরসন্ধানে অনুমানের উপর আমাদের নির্ভর করতে হয়না; কেননা তাঁর নিজের জবানীতেই এগুলির প্রতিটির উত্তর আমরা খুঁজে পাই। উত্তরগুলি শুধু সূচিন্তিতই নয়, কবি হিসাবে তাঁর অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রত্যক্ষত জড়িত, সেই অভিজ্ঞতা থেকে সরাসরি উঠে-আসা। 'ছন্দের কবিতা লেখেন না কেন আপনি?'—এ-প্রশ্নের উত্তরে 'কবিতা, আমি এবং আমরা' (শরৎ-হেমন্ত ১৩৮৪ সংকলন 'পরমা') রচনায় স্পষ্টতই তিনি আমাদের জানিয়েছেন, "কবিতা লিখতে গিয়ে আমি বারে বারে তাদের (ছন্দ ও মিল) কাছ থেকে বাধা পেয়েছি বলেই অন্য পথ ধরেছি। এখন তো আমার ছন্দ-মিলকে একটা সংস্কার মনে হয়। ...মিল যতখানি সাহায্য ধ্বনি-বিন্যাসে করতে পারে, তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করতে পারে কবিতার। যে-শব্দ ব্যবহারের কোনও প্রয়োজন নেই, সেই শব্দ সে ঘাড় ধ'রে প্রায়ই ব্যবহার করায়। এবং মিলের জন্য কবিতার বক্তব্য বিপথে চ'লে যেতে পারে। আরও পরে, 'কলেজ স্ট্রীট' পত্রিকার শ্রাবণ, ১৩৯০ সংখ্যায় প্রকাশিত কবিত্ব-সম্পর্কিত তাঁর আত্মকথনেও, এ-সম্পর্কে প্রায় একই কথা বলেছেন, তাঁর পূর্বোক্ত মতকেই সমর্থন করেছেন তিনি—"আসলে ছন্দের বদলে গদ্যকে বাহন করতে বাধ্য হলুম তখনি, যখন আমি টের পেলুম আমার উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতে গিয়ে ছন্দ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে।' আর, বিশুদ্ধ গদ্য-স্তবকবন্ধের তাঁর যে-কাব্যাঙ্গিক, তাতে স্থিত হওয়ার হেতুব্যাখ্যায় তাঁর অভিমত, 'কবিত্বর রূপায়ণ সম্বন্ধে আমার কোনও নান্দনিক ধারণা নেই। শুধুমাত্র এই সিদ্ধান্ত আছে যে, আমার মনোভাব বা অনুভব যেভাবে সবচেয়ে ভাল প্রকাশ করতে পারব, সেটাই আমার কবিতার রূপ হবে। ...ফরাসি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় আমার এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন দিয়েছে।' ('আজকালপরশু', অরুণ মিত্র সংখ্যা, অক্টোবর, ১৯৮০)।

ফরাসি সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর যে-পরিচয়ের কথা তিনি বলেছেন, সেই পরিচয়টাই এ-প্রসঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বের; কেননা এই কাব্যরীতি অবলম্বনের মূল নিশ্চিতত্বলেই ছিল ফরাসি কবিতার সঙ্গে (কবিদের সঙ্গে নয়, কারণ ফ্রান্সে থাকা-কালে ফরাসি কবিসমাজে তেমন মেলামেশা তাঁর ঘটেনি) তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। এই পরিচয়ের ফলে সেই কবিতার ছাঁচ থেকে তাঁর গ্রহীষ্ণু মানস যেমন গ্রহণ করেছে অনেক তেমনই তাঁর কবিতাতেও মাত্র এই গদ্যাবয়বিক উপস্থাপনারীতিটিই নয়, অন্যবিধ পরিবর্তনও ঘটেছে

বিস্তর। ধীরে-ধীরে তাঁর কবিতার বাক্যবন্ধ, স্তবকবিন্যাস, উপমা-প্রতীক-রূপক-প্রয়োগ ইত্যাদি এবং সর্বোপরি ভাষ্যাবহারীতি ও শব্দ নির্বাচনরুচিতে বিপুল পালা-বদল ঘটেছে। এই পালা-বদল যদিও এক মন্থর প্রক্রিয়ার পরিণতি, তবু তা অলক্ষিতভাবে ঘটেনি; সন্ধানী পাঠকের অবশ্যই নজরে পড়ে, কীভাবে তাঁর প্রথম দিকের সংস্কৃতবশ, প্রাকৃতপিঙ্গল ভাষা ক্রমে-ক্রমে স্বধীনতা অর্জন করেছে, প্রাচীনপন্থী শব্দ-সমাবেশ আধুনিকতায় মন্ডিত হয়েছে, তৎসমগন্ধী শব্দের সংকীর্ণ কারাগার ভেঙে তাঁর কবিতা অজস্র দেশজ ও লৌকিক শব্দের উন্মুক্ত বিশাল প্রান্তরে এসে নিঃশব্দে উপস্থিত হয়েছে। তাঁর কবিতায় সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য অভ্যর্থনার আসন যেমন ধীরে-ধীরে বিছোনো হয়েছে, সর্ব-প্রকারের শব্দের জন্যও দুয়ার তেমনই ক্রমশ উন্মুক্ত হয়ে এসেছে। 'ঘুমের দরজা ঠেলে' তাঁর কবিতায় নিত্য নতুন শব্দ এসেছে, এসে ভিড় করেছে। কত রকমের যে সেই শব্দ—কথা, গ্রাম, মেয়েলি, হাটুরে, চলতি, আঞ্চাড়া, এমনকি উপভাষাও। এতসব বর্ধমান বৈচিত্র্যকে নিয়ে তাঁর শব্দের ভান্ডার যে সমৃদ্ধ, একজন জাত-কবির মতো, তিনি নিজেও সে-সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন। তাঁর একাধিক কবিতায় সেই সচেতনতার সাক্ষ্য রয়েছে—'শব্দগুলোকে আমি দারুণভাবে সাজিয়েছিলাম। —নতুন শব্দকে ছুঁয়ে আমি আবার পরাক্রান্ত হ'য়ে উঠেছি।— কথায় চড়ে অন্ধকার সুড়ঙে প্রবেশ করেছি' ('দিগ্বিজয়'), 'আমি শব্দের ভাঁড়ার খুলেছিলাম।' ('শব্দের ভাঁড়ার খুলেছিলাম'), 'আমি কথাগুলোকে সাপটে ধরতে যাই' ('কথাগুলোকে')। সেই সঙ্গে আরও রয়েছে এই বিবিধ শব্দের ব্যাপক ব্যবহারের লক্ষ্য সম্পর্কে তাঁর মনের উন্মোচন—'তোমার হাতটাকে লাঙল করো মাটি যেমন উলটে দেয় তেমনই করে উলটাও কথাগুলোকে, তবেই তাদের উপর থরে থরে চরা জন্মাবে চোখ-জুড়ানো ফসল।' ('কথাগুলোকে')। এইসব বিচিত্র শব্দের ব্যঞ্জনা তাঁর কবিতায় ভাবনার চরা সত্যিই থরে-থরে জন্মাচ্ছে, ভাবের চোখ-জুড়ানো ফসলও ফলেছে নিঃসন্দেহেই।

অথচ, বিস্ময়ের বিষয়, যে-ফরাসি কবিদের কবিতার সংস্পর্শে এসে তাঁর নিজের কবিতার 'ফর্ম'-এ এই নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটে গেল, সিনট্যাক্সিকাল রিজিডিটিকে বিপর্যস্ত করে, লেক্সিক্যাল রেগুলেশানসকে উল্লঙ্ঘন করে গদ্য ও পদ্যের প্রথাসিদ্ধ আব্বয়িক সকল পার্থক্যই অবলুপ্ত হল, সে-কবিরা কিন্তু তাঁর কাব্যগত চিন্তা-ভাবনার নিজস্বতাকে প্রতিহত করতে পারেননি। তাঁদের চিন্তার দ্বারা অরুণ মিত্রের কাব্যমানসিকতা আচ্ছন্ন হয়নি, আবৃত তো নয়ই। অবশ্য সেটাই ছিল স্বাভাবিক—হয়তো একজন আত্মসন্ধাণ কবি হিসাবে তাঁর নিজেরও অভিপ্রেত। কেননা ফরাসি কবিদের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি শূন্যতার বিরুদ্ধে (অর্থাৎ পূরণে) যোগ্য ফর্মের সন্ধানে, কাব্যের বিষয়গত ভাবনা-চিন্তার অনুসন্ধানে নয়। এবং ফর্ম বা কাব্যরূপ সন্ধানও তাঁর পক্ষে আদৌ পরাণুকরণের ব্যাপার' ছিল না, ছিল গভীর আত্মানুসন্ধানেরই অপরিহার্য অঙ্গ। বস্তুত, ফরাসি কবিতার সঙ্গে পরিচিত হবার আগে থেকেই তিনি ক্রমশ অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছিলেন তৎকালপ্রচলিত ও পাঠককুল-সমাদৃত কাব্যরূপের অসম্পূর্ণতায়, তাগিদ জেগে উঠেছিল তাঁর নিজেরই ভিতরে তৎকালীন ফর্মের শূন্যতার বিরুদ্ধে নিজের নিঃশব্দ প্রতিবাদ ধ্বনিত করে তোলার যোগ্যতম মাধ্যমটি খুঁজে নেবার জন্য। এই রকম সন্ধিৎসু মানসিক অবস্থায় ফরাসি সাহিত্যের আঙিনায় পা বাড়িয়ে জীবনরসিক ফরাসি কবিদের কাব্যরূপগত পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত হলেন তিনি এবং তাঁদের সেই অভিজ্ঞতাতেই তাঁকে পাইয়ে দিল তাঁর কবিতার ঈপ্সিত ও যোগ্যতম ফর্মটির সন্ধান। ফলে, ঘটল তাঁর কবিতার রূপ-বদল, ঘটল তার বন্ধনমুক্তি। কিন্তু তবু তাঁর কবিতার মুক্তিপথের অগ্রদূতের সম্মান যাঁদের প্রাপ্য—সেই উনিশ-শতকী অ্যারতুার র‍্যাঁবো এবং বিশ শতকের ঝুঁল স্যুপোয়ডিয়েল, স্যাঁ-ঝন্ পের্স্, পল এলুয়ার, ঝাঁক প্রেভের কিংবা রানে শার—ইত্যাদি শক্তিশালী কবিদের কারোরই 'মতো' তিনি হয়ে উঠলেন না পুরোপুরি, তাঁর কবিতাও সর্বাংশে হয়ে উঠল না এঁদের কারোরই কবিতার 'মতো'। ব্যাপারটা তাহলে কী দাঁড়াল? মাত্র দুটি তুলনার সাহায্যেই তা বোঝানো যেতে পারে—যেমন, উল্লিখিত কবিদের প্রথম জনের, অর্থাৎ র‍্যাঁবোর, কবিতার গদ্য সুতীব্র আবেগে আপ্লুত, কখনও রুদ্ধশ্বাসে আর্তনাদের মতো আবার কখনওবা সমুদ্রের সৃগম্ভীর কল্লোলের মতো। কিন্তু অরুণ মিত্রের অন্তর্চেতনা-ময় কবিতার লিরিক্যাল গদ্যে আবেগের সেই উচ্ছ্বাস, অবরুদ্ধ আর্তনাদের তীব্রতা অথবা সমুদ্রের নির্ঘোষ অনুপস্থিত। আবার, তালিকার শেষ করি, রানে শার-এর কবিতায় শব্দের সম্ভাব্য শক্তি-সম্পর্কিত চূড়ান্ত পরীক্ষার শেষ পরিণতি দাঁড়িয়েছে শব্দের বিস্ফোরণ। অরুণ মিত্রও শব্দের সম্ভাবনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বড় কম করেননি, কিন্তু তাঁর কবিতায় শব্দগত বিস্ফোরণ অবিদ্যমান। কবিস্বভাবে তিনি স্বতন্ত্র ঘরানার; তাঁর কবিতা, আগেও ছিল, পরেও আছে,—পৃথক প্রকৃতির। অনুচ্চকীর্য মনোবৃত্তির বশে নয়, আত্মস্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই তিনি ফরাসি কবিদের শরণাপন্ন হয়েছিলেন এবং তাঁদের গদ্যকবিতার ও গদ্যের কবিতার অভিজ্ঞতার শিক্ষাকে নিজের বলে গ্রহণ করেছিলেন। ফলে, ব্যাপারটার সবটাই মাত্র অনুকরণের নয়, বরং অনেকটাই সজ্ঞান আত্তীকরণের। অতএব এই দিকটিকে সমগ্রতা বিবেচনা না-করেই তাঁর কবিতার বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়ে আমরা যে তাঁর কবিতায় 'ফরাসি-প্রভাব' প্রসঙ্গের অবতারণা করে বসি, মনে হয়, এক হিসাবে এটা তাঁর ও তাঁর কবিতার প্রতি রীতিমতো অবিচার। আর, সেই অবিচারের প্রতিবিধানকল্পেই অরুণ-অনুরক্ত সমালোচকদের উদ্দেশে এই সুযোগে আমার নিবেদন ঃ আপনারা এখন থেকে একে 'ফরাসি-প্রভাব' না-ব'লে বলতে আরম্ভ করুন

'ফরাসি আত্তীকরণ'।

'ঘনিষ্ঠ তাপ'এর মোট একচল্লিশটি কবিতার প্রথম আঠারোটিই গদ্যের ঠাসবুনোটের। এবটোনা গদ্যের এই কবিতাগুলির গোত্রনির্ণয় বা সংজ্ঞা-নির্ধারণ—কোনওটাই খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। পদ্য ও গদ্যের স্বাভাবিক ও স্বীকৃত পার্থক্যবিলোপের এমন একাগ্র প্রয়াস এবং তাতে সাফল্য অর্জনের এ-রকম উজ্জ্বল নিদর্শন বাংলা সাহিত্য এর আগে আর দেখা যায় নি। তেল-জলের সংমিশ্রনের মতো কঠিন, দু'নৌকোয় পা দিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখার মতো দুরূহ এই সাহিত্যরীতি—একই সঙ্গে গদ্যধর্মও বজায় রাখতে হবে আবার কাব্যধর্মিতা থেকেও বিচ্যুত হওয়া চলবে না। এই দুরূহতার কারণেই, এই মিশ্র সাহিত্যশৈলী, আকর্ষণীয় অভিনবত্ব সত্ত্বেও, অরুণ পরবর্তী কবি-প্রজন্মকে আদৌ আকর্ষণ করতে পারেনি। এই কবিদের দু'-একজন, এই চেহারার কবিতা, হয়ত নেহাৎ শখ মিটাবার ছলেই, দু'একটি লিখেছেন; কিন্তু ওই পর্যন্তই, তার বেশি আর কিছু নয়।

'ঘনিষ্ঠ তাপ' গ্রন্থটির প্রথমদিকে বিন্যস্ত এই আঠারোটি রচনা এবং 'উৎসের দিকে'-র 'স্মরণকাল' অংশের অন্তর্গত 'সুকান্ত'—যেটি গদ্যআঙ্গিকে রচিত অরুণ মিত্রের প্রথম কবিতা এবং হতভাগ্য কিশোর কবির জীবনলীলার অকাল-অবসানে, মাত্র একটি আর্ত প্রশ্নে ও তার প্রচ্ছন্ন নেতিবাচক উত্তরের উপ-জীব্যতায়, আমাদের সকলের সম্মিলিত অশ্রুপাতের বিকল্প এবং যেটির সমকক্ষ উন্মাথিত, জীবন্ত ও রক্তমাংসের কবিতা সেদিন বাঙালি কবিদের অন্য কেউই লিখতে পারেননি—স্বরূপত কী? এগুলি কি গদ্যের কবিতা, না কবিতার গদ্য? সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সত্যিই কঠিন। তত্ত্বগুড়, গদ্য ও পদ্যের লাক্ষণিক এই তাত্ত্বিক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা কী অথবা কোনও রচনার রসাস্বাদনের পক্ষে তার স্বরূপগত বিশ্লেষণের সার্থকতাই বা কোথায়? তার চেয়ে আমরা বরং রচনাগুলির নিবিড় সান্নিধ্যে ফিরে যাবো।

ধ্রুবপদ-সংগীতজগতের দুই প্রবাদপুরুষের স্মরণে শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

'ধ্রুবপদ'* সংকলনটির 'আত্মপক্ষ' নামক ভূমিকায় সম্পাদক কয়েকটি কথা, তাঁর পরিকল্পনার কথা, স্পষ্টভাবে বলে নিয়েছেন। যে, বছরে একবার একটি নির্দিষ্ট প্রসঙ্গ নিয়ে এর বিষয়বস্তু ও রচনাবলী বিন্যস্ত হবে। যে, এই সংকলন কোনও সাহিত্যগোষ্ঠী বা সাংস্কৃতিক প্রয়াসের সামূহিক মুখপত্র নয়। এবং যে, সম্পাদক এককভাবে এর ভালোমন্দের দায়ভাগী। যেহেতু কোনও ব্যবসায়িক অভিপ্রায় নেই, কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতার সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ রাখাও দুরূহ, অথচ পরিকল্পনাটি ব্যয়সাধ্য। সুতরাং প্রস্তুতির জন্য একেবারে সময় খুবই প্রয়োজন। আর বইমেলা লক্ষ্য করে প্রকাশ করাটাও বুদ্ধিমানের কাজ। এখন আর কারুর অজানা নেই যে, বইমেলার মরশুমেই বাংলা বইয়ের শতকরা আশিভাগ বাজার। বছরের অবশিষ্ট সময়ে বইপত্র প্রায় বিক্রিই হয় না। আমি রক্ষণযোগ্য সাহিত্যগ্রন্থের কথা বলছি।

কেন এই দুই ব্যক্তিত্বকে নিয়ে এই সংকলন? এর উত্তরে সম্পাদক জানাচ্ছেন, এঁরা উভয়েই মূলত কৃষ্ণনাগরিক এবং সংগীতজগতের প্রবাদপুরুষ। অমিয়নাথ সান্যালের জন্মসাল ১৮৯৫, দিলীপকুমার রায়ের ১৮৯৭। জন্মশতবর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন-সূত্রে সংগীত ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই দুজনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এই সংকলনে প্রধান আলোচ্য বিষয়। যদিও অমিয়নাথের বেলা একটু বিলম্ব হয়ে গেছে।

সংকলনটি নানাপ্রকার বৈচিত্র্যপূর্ণ রচনায় সমৃদ্ধ। সাড়ে তিনশোর বেশি সুমুদ্রিত পৃষ্ঠার প্রায় ষাট শতাংশ জুড়ে আছেন দিলীপকুমার রায়—তাঁর সম্পর্কে মৌলিক আলোচনা, স্মৃতিচারণ, তাঁর এবং তাঁকে লেখা প্রায় তিরিশটি চিঠি, জীবনপঞ্জি ও বংশলতিকা। অমিয়নাথের ক্ষেত্রে মৌলিক নতুন রচনা কম। সেই স্থান পূরণ করেছে তাঁর কিছু নিজস্ব রচনার পুনর্মুদ্রণ। আর জীবনপঞ্জি, বংশলতিকা।

কৃতিত্বে কেউ কারুর চেয়ে কম নন। দুজনেই সমান দীর্ঘজীবী। তবু দিলীপকুমারের প্রতি পক্ষপাত হয়েই যায় কেন না তিনি ছিলেন একজন বর্ণময় চরিত্র। অসাধারণ জনপ্রিয় ও প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর একজন সাধক, সন্ন্যাসী। অমিয়নাথ ছিলেন শাস্ত্রিয়সংগীত-বিশেষজ্ঞ, সংগীত-তত্ত্বের নিষ্ঠি গবেষক, গ্রন্থকার। শিল্পী। দুজনেরই বাংলা লেখা অন্তত সুখপাঠ্য ও সরস। দিলীপ-চরিত্রে নাটকীয়তা অনেক বেশি। এভাবে অবশ্য তুলনা করা উচিত নয়। এবটো কথা অবশ্য লক্ষ্য করতে বলা যায় যে, উভয়ের বংশে, পূর্বপুরুষে গানের, সংগীতচর্চার একটি অব্যাহত ধারা ছিল। সেই শিশুকাল থেকেই জীবনে এমনটি দেখা যায় না।

কোনও অসাধারণ ব্যক্তির জন্মশতবর্ষ সংকলনে সাধারণত তাঁর ভজনাই করা হয়। এই সংকলনে অনেক অজানা তথ্য আছে। অনেক কৌতূহলউদ্দীপক ঘটনা বিবৃত হয়েছে নানা লেখকের রচনায়। বর্তমান প্রজন্মের পাঠক যারা এই দুই প্রতিভার সান্নিধ্য পায়নি, তারা বইটি পড়ে এঁদের সম্বন্ধে আরও খবর জানবার আগ্রহ বোধ করবে। তা থেকে গ্রন্থপ্রকাশের খরচ অনেকটাই উঠে আসবে বলে আশা করি।

* ধ্রুবপদ॥ বার্ষিক সংকলন ১৯৯৬॥ দিলীপকুমার রায় ও অমিয়নাথ সান্যাল জন্মশতবর্ষ॥ সম্পাদক-সুধীর চক্রবর্তী॥ মূল্য-১০০ টাকা

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাচিত্র ঃ তখন ও এখন

অশোকেন্দু সেনগুপ্ত

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি তথ্যপুস্তিকা সম্প্রতি হাতে এল। নাম—পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাচিত্র ঃ তখন ও এখন। প্রকাশকাল ঃ মার্চ, ১৯৯৬। প্রকাশক—তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ওই পুস্তিকায় প্রাক-বামফ্রন্ট পর্বের সঙ্গে পরবর্তী কালের শিক্ষাচিত্রের কিছু তুলনামূলক তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। ভূমিকায় বলা হয়েছে ঃ "খোলা মনে বিচার করলে এ কথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে যে কয়েকটি ক্ষেত্রে সাফল্য সব থেকে উল্লেখযোগ্য তার একটি হলো শিক্ষা। আবার এ-কথাও সত্য, বামফ্রন্ট সরকারকে আক্রমণ করার জন্য যে সব অস্ত্রে শান দেওয়া হয়েছে—তার মধ্যে একটা শিক্ষা।___শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা-সমালোচনা সব সময়ই কাম্য" (পৃঃ ১)।

শেষ বাক্যটির ওপর ভরসা করে আমরা আলোচনা-সমালোচনা করতে চাই সরকারের "সব থেকে উল্লেখযোগ্য" সাফল্যের একটি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেতে চাই। ওই পুস্তিকায় সংক্ষেপে বহু বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। যেমন—ব্যয়বরাদ্দ, প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা, গ্রন্থাগার পরিষেবা, কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদি। বর্তমান নিবন্ধে আমাদের আলোচনার সীমা প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাস্তর পর্যন্ত রাখা হয়েছে। অন্যান্য তথ্য-সারণি পাওয়া যায় ওই পুস্তিকায় যা আমাদের আলোচনার ভিত্তি হতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৯১ সালে রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দেবার জন্য মিত্র কমিশন গঠিত হয়। কমিশনের প্রতিবেদন জমা পড়ে ১৯৯২ সালে। ঐ কমিশনের বহু সুপারিশ সরকার গ্রহণ করেছে। কমিশনের প্রতিবেদনেও প্রচুর তথ্য-সারণি মেলে। যথাস্থানে তারও উল্লেখ করা হবে তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজনে। মিত্র কমিশনেরও আগে গঠিত হয়েছিল ভবতোষ দত্ত কমিশন। সেই কমিশনের প্রতিবেদন এখনও "ঠাণ্ডা ঘরে"। যদিও বর্তমান নিবন্ধকারের মতে দত্ত কমিশনের প্রতিবেদনে নিরপেক্ষ বাস্তব চিত্র আঁকা হয়েছিল কিন্তু সরকারই যখন সে প্রতিবেদনে আস্থা রাখেনি তখন আমরাও তা সরিয়ে রাখছি। সম্প্রতি I.S.I. (Indian Statistical Institute) ও S.C.E.R.T. (State Council of Educational Research and Training)-এর যৌথ উদ্যোগে প্রস্তুত প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন সরকারের কাছে জমা পড়েছে। ১৯৯০ সালে মাননীয় মন্ত্রী শ্রী কান্তি বিশ্বাসের পরামর্শে তাঁরা কাজে নামেন, প্রতিবেদনটি পেশ করা হয় ১৯৯৫ সালে। সরকারি প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। ওই প্রতিবেদন থেকেও সামান্য দু'চারটি তথ্য বর্তমান আলোচনায় উল্লেখ করব। এছাড়া, আমরা কোঠারি কমিশনের (১৯৬৪-৬৬) প্রতিবেদনের প্রতিও প্রয়োজনে দৃষ্টি দেব।

২। প্রাথমিক শিক্ষা

ভারতীয় সংবিধানে লেখা আছে—চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত সকলের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করবে সরকার ১৯৬০ সালের মধ্যে। কোঠারি কমিশন ১৯৬৬ সালে এই আশা ব্যক্ত করেছিল যে

..... all the areas in the country should be able to provide five years of good and effective education to all the children by 1975-76 and seven years of such education by 1985-86 (পৃঃ ২৬৮)।

কোঠারি কমিশনের আশা ছিল শিক্ষায় এগিয়ে থাকা রাজ্যগুলি আরও আগে লক্ষ্যে পৌঁছবে। তখন তো পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে থাকা রাজ্যের দলে। কিন্তু '৭৫-'৭৬ কেন, কুড়ি বছর পরেও আমরা লক্ষ্যে—Good and effective education—

পৌঁছতে পারিনি। অধিকাংশ রাজ্যেরই একই হাল। প্রশ্ন এই ঃ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব তো? সরকারি তথ্য পুস্তিকা থেকে বর্তমান অবস্থার ছবি ও প্রায় কুড়ি বছর আগের ছবি পাওয়া যায়, যা খুব স্পষ্ট না হলেও—বিখিব্যবস্থার কিছু ইঙ্গিত বহন করে। সেজন্য আমরা নীচের সারণির প্রতি মনোনিবেশ করি।

সারণি-১ ঃ বিদ্যালয় স্থাপন, শিক্ষক নিয়োগ, ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি

	১৯৭৬-'৭৬	১৯৯৪-'৯৫
প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা	৪১,৬৫৯	৫১,০২১
শিক্ষক সংখ্যা	১.৪৯,৩১৩	১,৭৫,১০৩
ছাত্রছাত্রী সংখ্যা	৫৭,৭৭,৫৯১	৮৪,১৫,২১৫

[উৎস : তথ্যপুস্তিকা (পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাচিত্রঃ তখন ও এখন) সারণি-২]

১৬ বছরে প্রাথমিক বিদ্যালয় বেড়েছে ৯৩৬২টি, ছাত্রছাত্রী বেড়েছে ২১,৩৭,৬২৪, শিক্ষকসংখ্যা বৃদ্ধি ২৫,৭৯০। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হিসেব নেই এর সঙ্গে। থাকলে বোঝা যেত, জনসংখ্যার অনুপাতে এই বৃদ্ধি কতটা উৎসাহজনক। প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে—'৭৮-'৭৯-তে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীর অনুপাত ছিল ১:৩৮.৬৯, '৯৪-'৯৫-তে তা দাঁড়িয়েছে ১:৪৮.০৫। ৩৮ জন ছাত্র-পিছু একজন শিক্ষক—এই পরিস্থিতি ছিল যথেষ্ট দুঃখদায়ক, বর্তমান চিত্র উদ্বেগজনক। আবার, 'তখন' বিদ্যালয়-পিছু শিক্ষক ছিল ৩.৫৮ যা কমে এখন হয়েছে ৩.৪৩। বিদ্যালয়-পিছু ছাত্রছাত্রী সংখ্যার গড় ১৩৮.৬৮ থেকে বেড়ে হয়েছে ১৬৪.৯৩। কোনও খবরই সুখের নয়। অবশ্য, অর্থবরাদ্দ বেড়েছে বিপুল। কিন্তু বরাদ্দের প্রায় ৯৫ শতাংশ ব্যয় হয় শিক্ষকদের বেতন খাতে। তাই উপরিকাঠামোর উন্নতিতে বরাদ্দে টান পড়েছে সাংঘাতিক। যে প্রাথমিক শিক্ষা 'তখন' খোঁড়াত, আশঙ্কা এই যে—ত 'এখন' অতিরিক্ত ছাত্রচাপে এবং আনুপাতিক হারে (বিদ্যালয়-পিছু) শিক্ষক কমে যাওয়ায় ধুঁকছে। "(আইনগত) বাধা না থাকলে আরও কয়েক হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় এই সময়ের মধ্যে স্থাপিত হত__"(তথ্যপুস্তিকা, পৃঃ ৪)।—দাবি নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। তাছাড়া, মনে রাখতে হবে যে শুধু সংখ্যাবৃদ্ধিতে উন্নতি চিহ্নিত হয় না, good and effective education-এর জন্য চাই কাঠামোর উন্নতি। আপাতত আরও কিছু তথ্য সামনে রাখি, তারপর গুণগত মানের একটা আভাষ খুঁজব।

সারণি-২ ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিক্ষক, ছাত্রসংখ্যা

	১৯৭৬-'৭৭	১৯৭৮	১৯৮৬	১৯৯১-'৯২
বিদ্যালয় সংখ্যা	৪০,৯৪১	৪২,৬৫৯	৪৮,৪৫৬	৫১,০২১
শিক্ষক সংখ্যা	-	১,৫৮,৩৪৩	১,৬৭,১৭২	-
ছাত্রছাত্রী সংখ্যা	৫০,৮৩,৩৯৯	৫৭,৭৭,৫৯১	৬৮,৮৩,৯১১	৯২,০৯,০০০

[উৎস : মিত্র কমিশনের প্রতিবেদন—সারণি-২.৮, ২.৯, ২.১৩]

মিত্র কমিশনকে তথ্য সরবরাহ করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এবার, সারণি ১ ও ২ এক সঙ্গে পড়া যাক (দুটোর সারণিরই উৎস পশ্চিমবঙ্গ সরকার)। দেখা যাচ্ছে, দুটো সারণির তথ্যই যদি নির্ভুল হয়, '৯১-'৯২ থেকে '৯৪-'৯৫—এই তিন বছরে রাজ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় বাড়েনি একটিও! আর, ১৯৭৯ সালে বিপুল সংখ্যক শিক্ষক (৯০৩০) হয় অবসর নিয়েছেন অথবা চাকরি ছেড়েছেন অথবা খুইয়েছেন। এবং তিন বছরে ('৯১-'৯২ থেকে '৯৪-'৯৫) প্রায় আট লক্ষ ছাত্রছাত্রী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে হারিয়ে গেছে!

মিত্র কমিশন রাজ্যে বিদ্যালয় সংখ্যা ও ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধিতে সরকারের ভূমিকার প্রভূত প্রশংসা করেছে। প্রশংসা করা হয়েছে ছাত্রীসংখ্যা ও অনুন্নত জন-গোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটায়। প্রকৃত চিত্রটি কী তা বোঝার জন্য আমরা আবার সারণির সাহায্য নেব।

সারণি-৩ ঃ বালিকা ও অনুন্নত জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক শিক্ষা

প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী	১৯৭৮	১৯৯৫
ছাত্রী সংখ্যা	২০,৪৪,২৬৬	৩২,৫৮,২৯৫
তফসিলি জাতি	৯,৬১,৯৩৪	১০,৪৪,০০০
আদিবাসি	২,০২,৪২৫	২,৭৬,০০০

[উৎস : তথ্যপুস্তিকা—সারণি-৩]

মিত্র কমিশনের প্রতিবেদনে এ-সম্পর্কে কোনও তথ্য-সারণি নেই বটে, কিন্তু সরকারি সূত্র উদ্ধৃত করে কমিশন জানাচ্ছে যে, '৭৬-'৮৬-এই দশ বছরে ছাত্রী সংখ্যা বেড়েছে প্রায় তিন গুণ, তফসিলি জাতির ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বেড়েছে প্রায় দু'গুণ, তফসিলি উপজাতির ছাত্রছাত্রী বৃদ্ধির হার সামান্য কম (পৃঃ ২৮৮)। তথ্যপুস্তিকা থেকে পাওয়া সারণি-৩ কিন্তু সে কথা সমর্থন করে না। সেখানে আমরা দেখছি ঃ প্রতি বছর ছাত্রী বেড়েছে গড়ে ৩.৪৯ শতাংশ। মেয়েদের শিক্ষা সামাজিক অগ্রসরতার সূচক। তাই ছাত্রী সংখ্যা বাড়ছে এই সরল সত্যও আনন্দদায়ক এবং বৃদ্ধির হার ছাত্রবৃদ্ধি হারের চেয়ে বেশি নিঃসন্দেহে। কিন্তু, শিক্ষার্থীকুলে তফসিলি জাতি ও উপজাতি শিক্ষার্থীর ভাগ কমেছে যথাক্রমে ৪.২৫ ও ০.২২ শতাংশ। এটা নিশ্চয় সুলক্ষণ নয়। এ সম্পর্কে পরে আরও কিছু আলোচনা আছে।

এবার আমরা প্রাথমিক শিক্ষার মান সম্পর্কে কিছু কথা বলব। কোঠারি কমিশনের মতে—It is generally agreed that the standard of education given in the Primary School is unsatisfactory and that it imparts little beyond literacy and some elementary knowledge in a few academic subjects. What is expected is that primary education should lay the foundation for a child to grow into a responsible and useful citizen of the country- (পৃঃ ২৬৮)।

এর পাশাপাশি I.S.I. ও S.C.E.R.T.-র প্রতিবেদনের দিকে তাকানো যাক। প্রতিবেদনের ভূমিকায় বলা হয়েছে—

The objective of this survey was to find out whether the quality of Primary Education has matched its quality (পৃঃ ১)।

তাদের সমীক্ষা থেকে পাওয়া কিছু তথ্য এ'রকম—

I. পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ সংখ্যা এক। [৫.১৫]

II. ৫৪ শতাংশ বিদ্যালয়ে বসার বেঞ্চি আছে, অধিকাংশ বিদ্যালয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ব্ল্যাকবোর্ডও নেই। [৫.১৬]

III. ৩৭.৫ শতাংশ বিদ্যালয়গৃহ পাকা, প্রায় ২৫ শতাংশ বিদ্যালয়ের কোনও বাড়ি ঘরই নেই। [৫.১৩]

IV. ছাত্রীসংখ্যা প্রায় ৪৫ শতাংশ অথচ ৮০ শতাংশ বিদ্যালয়ে শৌচাগার নেই, শিক্ষকদের জন্য পৃথক শৌচাগার সামান্য কয়েকটি বিদ্যালয়ে আছে। [৫.১৪]

[ ] বন্ধনীতে উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিবেদনের সারণি সংখ্যা]

ওই চারটি তথ্য আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার পরিকাঠামোর একটা ছবি তুলে ধরে যা শুধু কোনও সরকারের নয়—জাতির লজ্জা। এমন তথ্য আরও আছে। তা থাক। আমরা এবার শিক্ষার মান সম্পর্কিত কিছু তথ্য নিবেদন করি (তথ্যের উৎস I.S.I. ও S.C.E.R.T.-র প্রতিবেদন।

(ক) রাজ্যের ছাত্রছাত্রীর মাত্র ২৮ শতাংশ যথাযথ ভাবে পড়তে পারে, ১৬ শতাংশ আদৌ পড়তে শেখেনি, ৫৬ শতাংশ কোনক্রমে পড়তে পারে। [৫.৩৪]

(খ) পাঠ্যপুস্তকের বাইরে আর কিছু পড়ার অভ্যাস নেই শতকরা ৫১ জনের। ২২ শতাংশ ছাত্রছাত্রী কালেভদ্রে অতিরিক্ত কিছু পড়ে। [৫.২৫]

(গ) প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই যারা বিদ্যালয় থেকে বিদায় নেয় তাদের অধিকাংশ মেয়ে। [পৃঃ ৪০]

পরিকাঠামোর যে হাল সমীক্ষায় ধরা পড়েছে (I-IV) তা এমনই ভয়াবহ যে মান সম্পর্কিত ওপরের তিনটি (ক-গ) তথ্যকে আমরা তেমন চাঞ্চল্যকর হয়ত বলতে পারি না। বরং এই পরিস্থিতিতেও উল্লেখ করার মতো কিছু সুফল ওই সমীক্ষায় ধরা দিয়েছে। যেমন—এই রাজ্যের প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের ৬৬ শতাংশের বাস দারিদ্রসীমার (বায় ক্ষমতার বিচারে) নীচে। দারিদ্র তাদের জ্ঞান-পিপাসা রুদ্ধ করেনি, হয়ত বা তীব্রতর করেছে।

৩. মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা

কোঠারি কমিশনের দেওয়া সংজ্ঞায় পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী-উচ্চপ্রাথমিক স্তর, নবম-দশম শ্রেণী-মাধ্যমিক স্তর এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী-উচ্চমাধ্যমিক স্তর। পশ্চিমবঙ্গে উচ্চপ্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর মিলেই, পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী, মাধ্যমিক স্তর বলে গণ্য করা হয়।

তথ্য পুস্তিকা ও মিত্র কমিশনের প্রতিবেদন থেকে আমরা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার হাল কেমন তার ধারণা একটা পেতে পারি হয়ত।

সারণি-৪ : বিদ্যালয়, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক সংখ্যা

	১৯৭৮-'৭৯	১৯৯৪-'৯৫
(ক) মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংখ্যা	৬৮৪৪	৮৭৪৩(৭৭৫২)*
(খ) উচ্চমাধ্যমিক " "	৯৬৭	১৪৩৬(১৪১২)*
মোট	৭৮১১	১০,১৭৯
ছাত্রছাত্রী সংখ্যা :		
(ক) মাধ্যমিক (ষষ্ঠ-দশম)	১৭,৯৮,২৮৯	৩৩,৩৬,৭২৬
(খ) উচ্চমাধ্যমিক	১,২৬,১৪০	৪,৭০,৫৬০
মোট	১৯,২৪,৪২৯	৩৮,০৭,২৮৬
শিক্ষক সংখ্যা :		
[নিম্ন মাধ্যমিক (জুনিয়ার হাই), মাধ্যমিক (হাই) এবং উচ্চমাধ্যমিক (এইচএস)]	৭৪,৯৬৪	১,৩১,২১৫

[উৎস : তথ্যপুস্তিকা—সারণি-৫. ৬, ৭]

* পুস্তিকায় দু'টি সংখ্যাই দেখানো হয়েছে। আমরা বৃহত্তর সংখ্যাগুলি আলোচনার জন্য গ্রহণ করেছি।

এবার দেখি মিত্র কমিশনের দেওয়া তথ্য।

সারণি-৫ : বিদ্যালয় ও ছাত্রছাত্রী সংখ্যা

	১৯৭৬-'৭৭	১৯৯১-'৯২
(ক) মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংখ্যা(VI-X)	৭৮৭৪	৮৪৪৩
(খ) উচ্চমাধ্যমিক " "(XI-XII)	৬৯৫	১৫৭৪
মোট	৮৫৬৯	১০,০১৭
ছাত্রছাত্রী সংখ্যা :		
(ক) মাধ্যমিক	২৪,৮৭,৬৩২	৬৯,০০,৭৫৪
(খ) উচ্চমাধ্যমিক	৬০,৪২৯	২,৮৫,৮১১
মোট	২৫,৪৮,০৬১	৭১,৮৯,৫৬৫

[উৎস : মিত্র কমিশন—সারণি-২.৮, ২.৯]

সারণি ৪ ও সারণি ৫ তুলনা করে পাই যে—(১) '৭৬-'৭৭ থেকে '৭৮-'৭৯ তে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাই কমেছে প্রায় এক হাজার এবং ছাত্রছাত্রী সংখ্যা কমেছে প্রায় সাত লক্ষ। (২) '৯১-'৯২-এ ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ছিল (মাধ্যমিকে) ৬৯,০৩,৭৫৪ কিন্তু '৯৪-'৯৫-এ সংখ্যাটি— ৩৩, ৩৬, ৭২৬। অবশ্য বলার কথা এই যে তথ্যপুস্তিকায় দেওয়া হিসাব ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর

কিন্তু মিত্র কমিশনের হিসাবে শ্রেণীর উল্লেখ নেই, হতে পারে সে হিসাব পঞ্চম শ্রেণী থেকে। তবে মানতে হয় শুধু পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী সংখ্যাই এই বিপুল পার্থক্য (প্রায় ৩৬ লক্ষ) গড়ে তুলেছে!

আমরা আবার ফিরে দেখি সারণি-৪। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীর অনুপাত, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তর মিলিয়ে, ১৬ বছরে, ১২৫.৬৭ থেকে বেড়ে হয়েছে ১২৯.০১। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে, একই সময়ে ওই অনুপাত ১১৩০.৪৪ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪৩২৭.৬৮-এ। মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রছাত্রী ও বিদ্যালয়ের অনুপাত ২৬২.৭৫ থেকে বেড়ে হয়েছে ৩৮১.৬৪। এখানেও অতিরিক্ত চাপ চোখে পড়ার মতো। এই বৃদ্ধি কী সুপ্রশস্তের লক্ষণ? কোঠারি কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছিলঃ Our main recommendation is that, by 1986, some 20% of all enrolments at the lower secondary level and some 50% beyond class X should be in part-time or full-time vocational and professional courses-(পৃঃ৬৮২)। পশ্চিমবঙ্গে বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার এখনও আশাব্যঞ্জক নয়। সাধারণ শিক্ষার জন্যই ওই ঝাঁকে ঝাঁকে ছাত্রদল আসছে, দুর্বল কাঠামোকে আরও নড়বড়ে করে তুলছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কোঠারি কমিশন বিভিন্ন স্তরে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতের একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করেছিল। তা হল শিক্ষক পিছু—উচ্চমাধ্যমিক স্তর : ২০; নিম্ন মাধ্যমিক(IX-X) : ২৫; উচ্চপ্রাথমিক (VI-VIII) : ২৫।

আমরা এখনও সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারিনি। সন্দেহ হয় যে, সে লক্ষ্য পূরণে কোনও আন্তরিক উদ্যোগও নেই।

এরপর, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের ও অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের 'তখন' ও 'এখন'—এর তুলনামূলক একটি চিত্র আমরা নীচের সারণি থেকে পেতে পারি।

সারণি-৬ : ছাত্রীসংখ্যা, তফসিলি জাতি ও উপজাতি ছাত্রছাত্রী সংখ্যা

	সাল	ছাত্রী সংখ্যা	তফঃ জাতি ছাত্রছাত্রী	তফঃ উপজাতি ছাত্রছাত্রী
৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণী	১৯৭৮	৮,২৮,৭৫৫	২,৭৫,০৩৩	৬৩,৯১২
	১৯৯৩	২৪,৩৫,০০০	৯,৭৫,০২১	২,৭২,৯২৪
১১শ-১২শ শ্রেণী	১৯৭৮	৩৮,৪১৫	১৪,০৯৫	৩,৩২৪
	১৯৯৩	১,৭২,০০০	৮৭,৭১৮	২৬,৯৫০

[উৎস : তথ্যপুস্তিকা—সারণিঃ ৮.৯, ১০]

এই সারণি থেকে স্পষ্ট যে, প্রাথমিক স্তরের মতোই, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরেও মেয়েদের উপস্থিতি বেড়ে চলেছে। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বৃদ্ধি প্রায় সাড়ে চার গুণ; মাধ্যমিক স্তরে-ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীতে বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় সাড়ে তিন গুণ, নবম-দশম শ্রেণীতে বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ১.৪ গুণ। তুলনায় নবম-দশম শ্রেণীতে বৃদ্ধির হার কম, কিন্তু কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা প্রয়োজন। কিন্তু তারও আগে ভেবে দেখতে হবে সরকারি পরিসংখ্যান কতটা বিশ্বস্ত। সারণি-৪ থেকে জানা যায় যে, '৯৪-'৯৫ সালে ষষ্ঠ-দশম শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৩৩, ৩৬, ৭২৬। সারণি-৬-এ '৯৩ সালে ষষ্ঠ-দশম শ্রেণীতে ছাত্রীসংখ্যা দেখানো হয়েছে ২৪, ৩৫, ০০। যদি হয় ছাপার ভুল তো সে আলোচনা বৃথা। নতুবা, বিশ্বাস করুন এবং বিশ্বাস করুন —মাধ্যমিক স্তরে মোট ছাত্রছাত্রীর ৭০ শতাংশেরও বেশি ছাত্রী! গল্পের গরু গাছে চেপেছে বললেও কম বলা হয়। প্রচার বাস্তবতা ছাড়ালেও অপপ্রচার হয় এবং তা গৌরববৃদ্ধি করে না, অর্জিত কৃতিত্বের ন্যায্য দাবিকেও দুর্বল করে। তথ্যপুস্তিকার প্রণেতা সম্ভবত এই সরল সত্য কথাটি ভুলে গেছিলেন।

মিত্র কমিশনের প্রতিবেদনে বিভিন্ন বয়সগুচ্ছের ছাত্রীসংখ্যার একটা হিসেব পাওয়া যায় যা নিম্নরূপ :

সারণি-৭ : প্রতি হাজারে বিদ্যালয়গামী মেয়ের সংখ্যা

	বয়সগুচ্ছ		
	৫-৯ বৎ	১০-১৪ বৎ	১৫-১৯ বৎ
শহরাঞ্চল :			
পশ্চিমবঙ্গ	১৯৮৩	৬৩৭	৭৫৭	৪৪৯
	১৯৮৭-'৮৮	৬১৩	৭৫৫	৪৩০
সর্বভারতীয়	১৯৮৩	৬৫১	৬৭০	৩৫২
গড়	১৯৮৭-'৮৮	৬৭৯	৭১৯	৩৯৫
গ্রামাঞ্চল :				
পশ্চিমবঙ্গ	১৯৮৩	৩৫৭	৪৬৯	১৬৭
	১৯৮৭	৪১২	৫৩৩	১৫৪
সর্বভারতীয়	১৯৮৩	৩৫৫	৩৩৯	১০৬
গড়	১৯৮৭	৪০৪	৪১৯	১৩২

[উৎস : মিত্র কমিশনের—সারণিঃ ২১৯, ২২০, ২২১, ২২৫, ২২৬, ২২৭। মূল উৎসঃ ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অর্গানাইজেশন, ভারত সরকার।]

এই সারণি থেকে বোঝা যাচ্ছে শহর ও গ্রামাঞ্চলের সর্বত্র বিদ্যালয়গামী মেয়েদের সর্বভারতীয় গড় বেড়ে চলেছে। কিন্তু, একই সময়ে (১৯৮৩-৮৭) পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলে সব বয়সের মেয়েদেরই বিদ্যালয় যাবার ঝোঁক কমেছে। গ্রামাঞ্চলের ঝোঁকটা উল্টো—সর্বভারতীয় গড়ের মতোই ঝোঁকটা সেখানে উর্ধ্বমুখী। ব্যতিক্রম—১৫-১৯ বয়সের মেয়েরা, তাদের ঝোঁক নিম্নমুখী।

এবার হিসাব নেওয়া যাক মাধ্যমিক স্তরে তফসিলি জাতি ও উপজাতি ছাত্রছাত্রীর। তার জন্য আর একবার তাকাতে হবে সারণি-৪ ও সারণি-৬ এর দিকে। দেখা যাচ্ছে, '৭৮-'৭৯-তে মোট ছাত্রছাত্রীর ১৫ শতাংশ তফসিলি জাতি। ১৫ বছরে তা বেড়ে ২৯ শতাংশ ছাড়িয়েছে। আর তফসিলি উপজাতি ছাত্রছাত্রী ১৫ বছরে ৩৫ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৮.৯ শতাংশ ['৯৪-'৯৫ সালের সংখ্যা জানা থাকলেও (সারণি-৪), জানা নেই '৯৩ সালের সংখ্যা। আশা করা যায় '৯৪-'৯৫-এ সংখ্যাটা সামান্য

হলেও বেশি।]। অর্থাৎ, পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ('৯৪-'৯৫) মোট ছাত্রছাত্রীর ৩৮ শতাংশ তফসিলি জাতি ও উপজাতি শ্রেণীভুক্ত। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী দুর্দম বেগে এগিয়ে চলেছে সন্দেহ কী? পশ্চিমবঙ্গে তফসিলি জাতি ও উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য যথাক্রমে ২২ শতাংশ ও ৬ শতাংশ আসন সংরক্ষিত করার সরকারি নির্দেশ আছে। তথ্যের জন্য সরকারি তৎপরতারও ঘাটতি নেই। শিক্ষায়তনগুলি থেকে নিয়মিত নানা তথ্য চাওয়া হয়। সাধারণত, অধিকাংশ শিক্ষায়তন কতৃপক্ষ এসব তথ্য পাঠানোয় উদাসীন। সংরক্ষিত আসনে প্রার্থীর অভাবে সাধারণ শ্রেণীভুক্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তির রেওয়াজ এ-রাজ্যের সর্বত্র, প্রায় সর্বত্রে এবং এ রেওয়াজ অতি প্রাচীন। সরকার মাঝে মাঝে সরকারি নিয়ম স্মরণ করিয়ে নির্দেশাবলী পাঠায়। সরকারি আদেশনামাতেই ফাঁকির সুযোগ আছে এবং সে সুযোগ গ্রহণ করার বুদ্ধিও আছে অনেকের। কিন্তু আমরা যে ২২ শতাংশ ও ৬ শতাংশ-এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণেও সফল হয়েছি তা জোর দিয়ে বলতে ভরসা পাচ্ছি না।

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ১৫ বছরে তফসিলি জাতি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১১ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ১৮.৬ শতাংশ, আর তফসিলি উপজাতি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২.৬ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৫.৭ শতাংশ। গ্রামাঞ্চলে এই বৃদ্ধি সম্ভব হলেও শহরাঞ্চলে, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে, তফসিলি জাতি ও উপজাতি ছাত্রছাত্রী ১৮.৬ শতাংশ ও ৫.৭ শতাংশ যথাক্রমে, আজও সহজলভ্য নয়। সে যাই হোক এই স্তরে আমরা লক্ষ্যে পৌঁছতে পারিনি। এবং ভাবার বিষয়—মাধ্যমিক স্তর থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পৌঁছতে অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা অন্যদের তুলনায় বেশি হোঁচট খাচ্ছে কেন?

৪. উপসংহার

সরকারি তথ্য পুস্তিকার তথ্য ও মিত্র কমিশনের তথ্যে যে প্রচুর ফাঁক আর অসঙ্গতি আছে তার কিছু উদাহরণ আমরা পেয়েছি। মজার কথা এই যে মিত্র কমিশনের তথ্যেরও প্রধান উৎস রাজ্য সরকার। এই পরিস্থিতিতে পাঠক কোন পথে যায়, আস্থা রাখে কার ওপর? কমিশনের প্রতিবেদন রাজ্য বিধানসভায় পেশ করা হয়েছে, তার বিশ্বাসযোগ্যতায় সাংবিধানিক ছাপ পড়েছে। অথচ, কমিশনের তথ্যই অভ্রান্ত এ কথা বলা সম্ভব নয়। এর জন্য দায়ি কে? কমিশনকে ভুল তথ্য সরবরাহ করার বা তথ্য গোপনের দায় কার তা খুঁজে বার করাও দায়িত্বশীল সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। বিধানসভায় সঠিক তথ্য যদি পরিবেশিত না হয় তাহলে তা গণতন্ত্রের বিপদ সূচিত করে। সরকারি তথ্য পুস্তিকাই বা এমন ভুলে ভরা কেন? সে কী অসতর্কতা, না অবহেলা, না আর কিছু?

তথ্য সংগ্রহের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য নিশ্চয় দুর্বল ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা এবং দুর্বলতা কাটানোর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ। সে কাজে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা দফতর কতটা তৎপর তা বর্তমান নিবন্ধকারের অজানা। তথ্যের গরমিল, ভুল তথ্য, আপাত কৃতিত্বের ঢাক পেটানো—এ সবের জন্য সরকারি তথ্য বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। অথচ এ কথা অবশ্য মানতে হবে যে শিক্ষা প্রসারে, সীমিত সামর্থ সত্ত্বেও বর্তমান রাজ্য সরকার আন্তরিক। সাক্ষরতার হার ১৯৮১ সালে ছিল ৪৮.৬৪ শতাংশ, ১৯৯১ সালে তা হয়েছে ৫৭.৭২ শতাংশ, যা সর্বভারতীয় গড়ের (৫২.১১ শতাংশ) চেয়ে ভাল। কিছু রাজ্য আমাদের চেয়ে দ্রুত এগোচ্ছে ঠিকই, কিন্তু আমরাও থেমে নেই। আমরা পিছিয়ে পড়তে চাই না—এই যদি মনোভাব হয় তাহলে আমরা ফের ভারতসভায় শ্রেষ্ঠ আসনের দাবিদার হয়ে উঠব। এর জন্য চাই উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিকল্পনা, চাই সাহসের সঙ্গে সত্যের মুখোমুখি হওয়া। এর জন্য আমাদের কৃতিত্বের পাশাপাশি আমাদের দুর্বলতাগুলিও চিহ্নিত করা প্রয়োজন। সত্যকে আড়াল করলে হবে না। I.S.I. ও S.C.E.R.T. কৃত প্রতিবেদন থেকে যে তথ্য উদ্ধৃত করেছি তার প্রায় সবই আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা জগতের দুরবস্থার কথাই ঘোষণা করে। যে-রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশের শ্রেণীকক্ষের অভাব, শৌচাগারের অভাব, ব্ল্যাকবোর্ডের অভাব সে রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষার হাল যে খারাপ তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু, ওই প্রতিবেদন থেকেই জানা যায় যে মোট শিক্ষার্থীর ৬৬ শতাংশের বাস দারিদ্রসীমার নীচে আর তাদের অধিকাংশের বাবা-মা নিরক্ষর। তারাও শিক্ষার আলো পেতে চায়, তারা এগিয়ে আসছে। এ সব কথা তো অবশ্য ঢাক পিটিয়ে বলার মতো।

সরকারের প্রতি বর্তমান নিবন্ধকারের নিবেদন এই যে, ভুল বা অসত্য তথ্য পরিবেশনের অর্থই হল শান দেওয়া অস্ত্র সমালোচক বা বিরোধীপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া। সরকারি তথ্যভাণ্ডার মিথ্যায় পূর্ণ করে তোলা ঘোর অন্যায়।

❒ চলচ্চিত্র

লাল দরজা ঃ সভ্যতার ব্যাধি

সত্যজিৎ চৌধুরী

কুয়াশায় মেঘে মেদুর চেরাপুঞ্জির আকাশের নীচে ঘাসে ঘাসে ভেলভেটপোকা খুঁজে বেড়ুত বালক নবীন (সুদীপ মজুমদার)। নরম লাল পোকা পেলেই যত্নে দুই হাতের মধ্যে মুঠো করে ছড়া বলত—"ছোটি মোটি পিপড়া বোটি লাল দরজা খোল দে"।

বালকের পরম বিস্ময়, ছড়াটা বারবার বলায় সত্যিই একটা বন্ধ লাল গেট আস্তে আস্তে খুলে যেত। অবাক হয়ে সে বাবাকে প্রশ্ন করত—"দরজাটা কি তার কথা শোনে, দরজার কি প্রাণ আছে?" গভীর থেকে বাবা উচ্চারণ করতেন—"ঠিক মতো বলতে পারলে সবাই ভালবাসে, সবাই কথা শোনে।"। বালক নবীনের সংবেদন পুষ্টি পেত এমন মরমি পরামর্শে। আহত হত এই ভেবে-চেরাপুঞ্জির সব-সব গাছের প্রাণ আছে, তবুও মানুষ গাছ কেটে গাছেদের কত কষ্ট দেয়। "গাছ কেন আপত্তি করে না মা"—জীবনের ব্যথিত জিজ্ঞাসায় মা বলতেন, "গাছেরা বলে, আমাদের মতো সহ্য করতে শেখো"। বালক নবীনের জগৎ এইসব পবিত্র সংবেদন, পবিত্র জ্ঞানে ভরপুর। সে ছিল এক অপরাহত বিশ্বাসের ভুবন, স্বপ্নের ভুবন।

'লাল দরজা' এই নবীনেরই গল্প। কিন্তু সে অন্য নবীন। বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের নিজেরই রচনা এই গল্পের কেন্দ্রের মানুষ নবীন (শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়) এখন ভাল পসারওয়ালা দাঁতের ডাক্তার। জীবিকায়, বিষয়-আশয়ে প্রতিষ্ঠাপন্ন মানুষদের জীবনের এক-একটা বাঁধা ছক থাকে। ডাক্তার নবীনেরও আছে। সেই ছকের মধ্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারলে স্বাচ্ছন্দ্যের উপায়গুলো একেবারে অভ্যাসের ভেতরে চলে আসে। বাইরে থেকে ডাক্তার নবীনের জীবনযাপন তেমনই অভ্রান্ত স্বাচ্ছন্দ্যের মনে হতে পারত। কিন্তু তার জীবনের খুঁনাট যেন তেমন খাপি নয়, ক্রমাগত ফেসে ফেসে যাচ্ছে। তার দৈনন্দিন কাজের ছক যে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে—ফিল্মের অব্যর্থ ভাষায় এই সংকট ক্রমে তীক্ষ্ণ অভিব্যক্তি পায়। গভীর অসুখ নবীনের, অসুখ খুব গভীরে, কিন্তু তার কারণ স্পষ্ট গোচরে নেই। ফিল্মটি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে ব্যক্তি নবীনকে ছাড়িয়ে অনেক বড় সংকটের চেতনায়। নবীনের অসুখ সত্যি সত্যি তার শারীরিক কোনও অসুখ নয়, এ ব্যাধি মনে হয় সভ্যতার ব্যাধি। আধুনিক সভ্যতার ব্যাধি। মানুষকে যা সংবেদন-রিক্ততার, শুকিয়ে যাওয়া সব অনুভূতির ভারে অসাড় এক রোবোটে পরিণত করে। 'লাল দরজা' ফিল্মটি পাঠ হয়ত এই দৃষ্টিবিন্দু থেকে একভাবে সুসংবদ্ধ করে তোলা যাবে।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের ফিল্মের অভ্যস্ত দর্শক লাল দরজায় শৈলীগত ভিন্নত অনুভব করবেন। আগের ফিল্মের তুলনায় লাল দরজা অনেক বেশি গতিময়। লয় দ্রুত। রেশ না রেখে কেটে কেটে দৃশ্যান্তরে যাওয়ায় সম্পাদনা-শৈলী স্নায়ুর উপরে চাপ শিথিল হতে দেয় না। ফিল্মের মূল প্রেক্ষিতটি ধাতব ধ্বনির সংঘর্ষময়, নাগরিক। ধাবমান মানুষজন, ট্রাফিক, নাগরিক ভিড়, জটপাকানো চলন্ত চিত্রকল্পের দ্রুত চাল—বিষয়ের দাবিতেই ফিল্মের দ্বন্দ্ব এমন চেহারা নেয়। নিরুদ্দিষ্ট গতির ব্যঞ্জনায় মানবিক সংবেদন-রিক্ত, নির্বিকার বয়ে-চলা জীবনযাত্রা প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এর বিপরীতে আসে চেরাপুঞ্জির সবুজের সমারোহ, আসে মেঘের কোমল ছায়া। ক্যামেরার দৃষ্টি পাহাড়ের দূর বিস্তরকে ধরে রাখে একটা স্বপ্নের ভুবনের মতো। হারিয়ে যাওয়া কোনও স্বপ্নের ভুবন—যেখানে ডাক্তার নবীনের শৈশব-বাল্য গচ্ছিত রয়ে গেছে। সে-শৈশবকে উদ্ধার করে আজকের জীবনে মেলানো বা আজকের জীবন থেকে সেই ভুবনে ফেরা আর সম্ভব নয়।

ফিল্মটির টুকরো টুকরো বহু কাজ দর্শকের স্মরণে রয়ে যাবে। নবীন লাল পোকাটা পাহাড়ি মানুষটির হাতে দিয়ে দরজা খোলার মন্ত্র শিখিয়ে দেয়। পাহাড়ি মানুষটি উদ্ভূত আওয়াজ তুলে হাসতে

হাসতে চলে যায়। মনে থেকে যায় ডাক্তার নবীনের মায়ের (সাধনা রায়চৌধুরী) নিঃসঙ্গ দিন যাপন। উলবোনা, কখনও-বা নিশ্ভি গানে নিজেকে নিবেদন করে দেওয়া। স্বপ্নে দেখা কোনও দৃশ্যের মতো মনে থেকে যায় উলের বলটি সিঁড়ির ধাপ দিয়ে পড়ে যাচ্ছে। সেই ধাপ থেকেই দৃশ্য বদলে যায় চেরাপুঞ্জিতে। লাল চাদর গায়ে নবীন, টানা সবুজের বিস্তারের মধ্যে খুঁজছে মন্ত্র পড়ার সেই ভেলভেটপোকা। এ সব দৃশ্য কোনও গল্প বলে না। গভীর কবিতার মতো, অবার্থ চিত্রকলার মতো বোধের মধ্যে আবেশ আনে, মগ্ন করে আনে। ভারতীয় সিনেমায় এমন করে ভেতর দিকে টেনে নেবার মতো কাজ বিরল। বুদ্ধদেব প্রতিপন্ন করেন, ফিল্মের শুদ্ধভাষায় শুদ্ধ কবিতা বা শুদ্ধ চিত্রকলা অবিরোধে মিলে যেতে পারে। উষর, অফলা কোনও জমির চারপাশে প্রাণময় একটা বলয়ের মতো এই ভাবাবহ অপ্রেমে-সংবেদনহীনতায় হননের আতঙ্কে গুপ্ত জীবনের ভয়ংকররূপকেই চরম মনে করতে দেয় না শেষ অবধি। 'অন্য' বাস্তবের অনুকাঙ্খা জাগিয়ে রাখে। সমস্ত সম্পর্কের টান মরে যাচ্ছে আমাদের জীবনের একটা স্তরে, এও অবশ্যই সত্য। ডাক্তার নবীনের দৈনন্দিন সঙ্গী ড্রাইভার দিনু (আসাদ) ডাক্তার মানুষটির ব্যক্তিগত জীবনের কোনও তথ্যে কোনও আগ্রহ বোধ করেনা আদৌ। কখনও তার জানার দরকার হয়নি মানুষটি এ শহরে এলেন কোথা থেকে, কে তাঁর মা-বাবা, কোথায় থাকেন তাঁরা। ডাক্তার দিনুকে জিজ্ঞাসা করায় সে নিরাবেগ স্বরে জানিয়ে দিতে পারে—মালিক আর ড্রাইভারের সম্পর্কের ছকের মধ্যে এসব ঔৎসুক্য সম্পূর্ণই অপ্রাসঙ্গিক। এমন নিঃসম্পর্কিত সম্পর্কে ভর করেও তো কাজ চলে যায়। কাজ চলে যাওয়াটাই দরকার। এবং এই দরকারের বাইরে এখানে কোনও মূল্যবোধ নেই। তাই নবীন দিনুর সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরি করতে চাইলেও তেমন কোনও সেতু মেলে না।

এমনই কাজের টানে ছুটন্ত মানুষজনের মধ্যে দিনদুপুরে রাস্তায় এক মহিলা খুন হন। সবাই ছুটে পালায়। চোখের উপরে ঘটা বীভৎস ঘটনায় এমনকী ডাক্তার নবীনেরও তেমন কোনও টালমাটাল প্রতিক্রিয়া হয়না। সাংবাদিকরা চোখেদেখা সাক্ষী পায় শুধু এক অথর্ব ভিখারিনীকে—যে-খুন সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে নিজের জ্বর নিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করে, তাদের তো দেখার কেউ নেই, কারণ, তাদের ভোট নেই। সে শুধু মনে করতে পারে নিহত মেয়েটির শরীর থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোনোর কথা। এমন অসাড়তার নজির আমরা নিত্যই দেখি এবং সত্যিই খুব কিলিত হই-ও না। অন্য মাত্রায় সংবেদনহীন অসাড়তায় আক্রান্ত ডাক্তার নবীন। গভীর অসুখ তার। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ (হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়) কাছে তার স্বীকৃতি মানুষটির একান্ত অসহায়তা প্রকট করে। সে নিজে চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্র হয়েও নিজের গভীর অসুখের কারণ বুঝতে পারে না। কী হয় তার? অপ্রতিরোধ্য অনুভবে ধরতে পারে স্নায়ুর উপরে নিয়ন্ত্রণ থাকছে না। হাত পা লোহার মতো শক্ত হয়ে আসে। এমনকী ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে স্ত্রী বেলাও (চম্পা) নবীনের শরীর সহ্য করতে পারে না। ভয় পায়। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অবশ্য কোনওই শারীরিক বিকলতা খুঁজে পান না। এমন রোগি তাঁর কাছে আরও আসে প্রায়শঃ। তাঁর ব্যাখ্যায়, যারা নিজেদের অ্যাকসেপ্ট করতে পারে না তাদেরই এরকম সংকট হয়। বোঝা যায়, অসুখের কারণটা বাইরে নেই, বিকলন মানসিক। পারিপার্শ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, ক্রমাগত উদ্দেশ্যহীনভাবে নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে আনা, সব সম্পর্ক ভেঙে যেতে দেওয়া, অনিবার্যভাবে এক অসহায় সংকটের দিকে ঠেলে দেয়। রোগটা বিচ্ছিন্নতার। সংবেদন হারিয়ে ফেলার। মনুষ্যত্বের আশ্রয়পুট শুকিয়ে বিনষ্ট হয়ে যাবার।

যান্ত্রিক অভ্যাসে কাজ করে যাওয়া যায় তবুও। ডাক্তারি করে নবীন। প্রেমহীন দাম্পত্য, তবুও ঘরে ফেরে। অনেক দৃশ্য এবং অদৃশ্য দেওয়াল নবীন এবং বেলার মধ্যে। দূরে দার্জিলিঙে থেকে স্কুলে পড়ানো করে একমাত্র ছেলে কুশল। বাবাকে সেও সহ্য করতে পারে না। ফোনে সাড়া দেয় না। ফোন কেটে দেয়।

ঘর এবং বাহির, কোথাও কোনও আশ্রয় নেই মানুষটির। অস্তিত্বের এমন প্রতিকারহীন সংকট শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় প্রায় শারীরিকভাবে ধরা ছোঁয়ার মধ্যে এনে দেন। আশঙ্কাজুর অভিব্যক্তি, হাঁটা-চলার অস্বাভাবিক টেনশন, অকারণ ক্রোধ এবং কখনও বা অপ্রস্তুত পরাভবের গ্লানি নিয়ে নবীন বিস্মিত হয়ে দেখে তার ড্রাইভার দিনুর জীবনযাত্রা। ফাঁক পেলেই গাড়ির জানলায় পা তুলে দিয়ে দিনু গভীর ঘুম ঘুমিয়ে নেয়। ধমক খায় ডাক্তারের, কিন্তু অপরূপ তার হাসিটি কখনও মলিন হয় না। তার বউ সুখী (নন্দিনী মালিয়া) কলকাতায় বস্তি-বাসায় থাকে একমাত্র মেয়েকে নিয়ে। কিন্তু ডাক্তার জানে, দিনু আর একটা বিয়ে করেছে, ওকে রেখেছে ডায়মণ্ডহারবারে। সাপ্তাহিক এক বেপরোয়া ফূর্তির দাম্পত্য সেই দুই নম্বর বউ মালতীর (ইন্দ্রানী হালদার) সঙ্গে। দৈনন্দিন জীবনে বিচ্ছিন্নতার দেওয়ালের মধ্যে বেলার সঙ্গে দিনরাত কাটানোর ক্লান্তিতে বিবশ নবীন দিনুকে বুঝতে চায়। এমনভাবে দুটি মেয়ের সঙ্গে জীবন জড়িয়ে দিনু তো বেশ ফূর্তিতেই আছে। সামলায় কী করে? সমস্যা হয় না কোনও? টাকার সমস্যা দিনু মেঠোয় ডাক্তারের গাড়ির তেল চুরি করে। তা ছাড়াও তো সমস্যা হতে পারে এ দোটানায়। জানতে চাইলে চরিতার্থ হাসি হেসে দিনু একই ভাষায় জবাব দেয়—'সে আছে স্যার! আর-একদিন বলব'। তার ভরপুর জীবনযাত্রার গোপন রহস্যের কথা কখনওই ভেঙে বলে না। কিন্তু তার উল্লাসময় প্রাণলীলার কাণ্ডকারখানা আমরা সাক্ষাৎ দেখি। মেয়েটিকে অসম্ভব ভালবাসে। বড় বউ সুখীর সঙ্গে সম্পর্কে কী নিবিড়! আবার প্রতি শনিবার দ্বিতীয় বউ মালতীর উদ্দামতায় তার প্রমত্ত দিনরাত। সুখী প্রতি শনিবারে পুজো লাগায়। মালতী খ্রিস্টান, প্রতি রবিবার গির্জায় যায়। দিনুর দিক থেকে কাউকেই ধারা দেবার কোনও প্রশ্ন নেই। করুক না যার যেমন রুচি। দিনুর অবস্থান নবীন ডাক্তারের বিপরীত মেরুতে। একটি দৃশ্যপুঞ্জে (সিকোয়েন্স) এই মেরু-ব্যবধান চমৎকার ধরা দেয়। মাসতুতো বোনের স্বামীর সঙ্গে মালতীর গোপন সম্পর্ক আবিষ্কার করে দিনু। ভয়ে লোকটা অব্যবস্থিত মালতীকে ফেলে পালায় নেড়ি কুকুরের মতো। ত্রাসে দিশেহারা মালতীও পালাতে চায়। আশ্চর্য মানুষ দিনু, সে আদর করে ডাকে মালতীকে। মালতী স্বীকার করে। মাসতুতো বোনটা মারা যাবার পর থেকে দুঃখি মানুষটা মালতীর সঙ্গ চায়। মাঝে মাঝে আসে। অদ্ভুতভাবে বলে, "তছাড়া তর হাতের আঙ্গুলগুলো ঠিক তোমার মতো।"

আশ্চর্য সংলাপ একটি। এমন স্বীকারোক্তিতেও দিনু রেগে ওঠে না। বরং খুব ভেতর থেকে এক নীতিপরায়ণ স্বরে বলে, "আমি আমারে যদি মেনে নিতে পারি তা'লে তোকে পারব না কেন?" এ সংলাপে বিপরীত টেকাল মেলে পড়িয়ে দেবে, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বলেছিল, "যারা নিজেরা নিজেদের অ্যাকসেপ্ট করতে পারে না তাদেরই নবীনের মতো সংকট হয়। দিনুর স্তরের মানুষের তেমন সংকট নেই। অনন্বয় নেই। দিনু তো বেপরোয়া সম্পর্ক বুনেই চলেছে। ঝুঁকি নিয়েই চলেছে। সে খোলা গলায় ডাক্তারকে বলতেই পারে, "আমার কোনও ভাবনা নাই স্যার।"

দিনুর জীবনযাত্রার উচ্ছল প্রবাহের ঢেউ ফিল্মে বার বার ঝাপট দিয়ে যায় নবীনের বিপন্ন মুহূর্তের ঠিক গায়ে গায়ে। সম্পাদনার (উজ্জ্বল নন্দী) এই সৌকর্য ফিল্মটির অন্তর্গত বয়নকে বিষয়ের দিক থেকে যুক্তির সূতোয় অব্যর্থ করে তোলে। দিনুর মতো সহজে নিজেকে মেনে নিতে পারে না নবীন। ফলে স্ত্রী বেলাকেও মেনে নিতে পারে না। ছেলেটির সঙ্গেও কোনও সম্পর্কের সেতু তৈরি করতে পারে না। মা থাকেন একাকী। তার সঙ্গে চিঠিপত্রের যোগাযোগও ছিন্ন। চূড়ান্ত অনন্বয়ে বিপর্যস্ত নবীন অবলম্বন হাতড়াতে গিয়ে পায় একমাত্র ঈর্ষাকে। বেলা নিয়মিত চিঠি পায় কোনও অর্ণব রায়ের (বরুণ চন্দ)। গোপনে সেসব চিঠি পড়ে নবীন। বিকৃত ঈর্ষায় ভাবতে বসে তাহলে বেলার নিজেকে গুটিয়ে নেবার মূলে আছে গোপন এই প্রেম। প্রেমহীন দাম্পত্যে বিধ্বস্ত বেলা একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসে। অন্তত কিছু দিনের জন্যও তার একলা থাকা দরকার। বন্ধু নীলিমার মধ্যস্থতায় চাকরি একটা পায়, একার মতো একটা বাসা পায়। চম্পার অভিনয়ে বেলা চরিত্রে একটা শিরদাঁড়া-ওয়ালা মেয়ে দাঁড়ায় ফিল্মে—যার সঙ্গে দূরতম মিল পাওয়া যায় বৃদ্ধদেবের প্রথম ফিচার ফিল্ম দূরত্বের অঞ্জলির। এই একটা প্রতিবাদী নারীত্বের দিক ওঁর ফিল্মে নানাভাবে আসে। বেলার খুব সংলাপ

নেই। কিন্তু চম্পা অনায়াসে অভ্যাসের ছক ভাঙার মতো চরিত্র্য সৃষ্টি করতে পারেন তাঁর অন্তস্থ সংযত, উচ্ছলতা বর্জিত, অথচ আপসহীন ভঙ্গির অভিনয়ে। একবারই তাকে খুব স্পষ্ট কথা বলতে শুনি। নবীনের দাবির উত্তরে, কী আমি তোমাকে দি-ই নি-এই অহমিকার উত্তরে বেলা বলে, "আর দেবার কথা বলছ? দিয়েছ যেমন নিয়েও নিয়েছ সব। সময়, শরীর, আমার ভাললাগা মন্দলাগা সব। কিন্তু এসবের বাইরেও একটা জিনিষ থাকে সেটা কখনও দিতে পারোনি তুমি, আর সেটা কী তুমি বোধ হয় বোঝোও না।" বেলার বিস্ময়, নবীন কি কখনও কাউকে ভালবেসেছে। "বাসলে তার ছায়া কখনও-না-কখনও তোমার চোখে দেখতে পেতাম"। তেমনই শুকনো তক্ত নবীন-যে মঞ্জরির স্বাদ পেল না জীবনে! এমন প্রশ্ন মনোরোগ বিশেষজ্ঞও নবীনকে করে, "কাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন মনে হয়? নিজেকে?" "বোধ হয় নিজেকেও না"-এ নবীনের চূড়ান্ত স্বীকৃতি।

বেলাই এ ফিল্মের শাঁস বক্তৃত্বকু সরাসরি উচ্চরণে প্রকাশ করে দেয়। প্রয়োজন, সম্পর্ক, ভালবাসা-সেসব মহার্ঘ অবশ্যই, "কিন্তু এ-সবের বাইরেও একটা জিনিস থাকে-" একেই বোধহয় বলা যায় মানবিক সংবেদন—যা মনুষ্যত্বের সারাৎসার। সমস্ত মূল্যবোধ ধ্বস্ত করে দেওয়া সফলতার দৌড়ে মানুষ কতদূর যাবে? বাঁচার, স্বপ্ন দেখার সব সুস্থ বোধ সে দৌড়ের ঝোঁকে কেবলই দলিত, দলিত হতে থাকে। প্রতিপত্তির চরমে উঠে যদি হঠাৎ উপলব্ধি হয়, পাশে কেউ নেই, সজীব স্বর্গের শুশ্রূষা দেবার মতো কেউ নেই পাশে-সেই ভয়াবহ উপলব্ধিতেই নিজেকে স্নায়ুহীন ধমনিহীন এক রোবোট মনে হতে পারে। ডাক্তার নবীনের সংকট এইখানে। নবীনের প্রতিটি উচ্চারণে ত্রাস আর ভয়। "সব কিছু কেমন অদ্ভুত! চার পাশের মানুষ, দেশ, সময়-অদ্ভুত!" মনোরোগ বিশেষজ্ঞের বাঁকা মেশানো হাসি ভয়াটাকে আরও ভয়াবহ করে তোলে নবীনের পক্ষে। হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যঙ্গভরা হাসি হাসতে হাসতে বলেন, "একদিন দেখবেন নেমে আসবে ফ্লাইং সসার। আপনাকে রোবোটের দেশে নিয়ে যাবে।" কীসের মধ্যে যে ঢুকে গেছে নবীন, বুঝতে পারে না। মনে হয় চারদিকে কেবল, "হাজার হাজার দাঁত। তার মধ্যে বড় বড় হাঁ। শোঁ শোঁ করে শব্দ হচ্ছে। তার ভেতর থেকে উঠে আসছে অন্ধকার।" এই ত্রাস থেকে কোথায় পালাবে নবীন! কী-বা এর চিকিৎসা।

ঈর্ষায় অর্ণব রায়কে খুন করাবার কথা ভাবে ডাক্তার নবীন। বেখাঁয়া থাকে এক খুনে-কাল্লু। তার খোঁজে ছোটে এক অসামাজিক মাস্তানের (বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়) সঙ্গে। স্টেনও একটা ঘোরলাগা দৃশ্যবন্ধ। পথে খুন হয়ে যাওয়া মেয়েটির সম্পর্কে খবর শুনতে শুনতে এই খুনের ঘোরটা পেয়ে বসে নবীনকে। অস্বাভাবিক ঘোর কেটেও যায়। ও পথে কতদূরই বা যেতে পারত নবীন! এমন একটা কাজ করা কি তার মতো বিবশ লোকের পক্ষে সম্ভব!

টিভি-র সামনে ঝিম মেরে বসে থাকা ভিন্ন সময় কাটাবার আর কোনও উপায় জানে না নবীন। কে একজন অস্বাভাবিক লম্বা দাড়ি রাখে—তার সাক্ষাৎকারও শোনে বসে বসে। আবার দেখব, টিভি-র খবর শুনছে নবীন। গায়ে জানালার শিকের ছায়া পড়ে মানুষটাকে মনে হচ্ছে আটকে গেছে কোনও বদ্ধতায়। খবর খুব তাৎপর্যের, ফিল্মটির উন্মোচক অবলোকনের দিক থেকে। খবর চলে—ওয়াসিংটনের সূত্রে জানা যাচ্ছে, ভারতবর্ষ থেকে আমেরিকায় পড়তে ইচ্ছুক আবেদনকারীদের সংখ্যা ৪ লক্ষেরও বেশি। শোনা যায়, বিশিষ্ট চিকিৎসকের একটি দল সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, "দিল্লি, বোম্বে, কলকাতা, মাদ্রাজ ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রধান শহরগুলিতে একটি রোগ মহামারীর আকার ধারণ করতে চলেছে অদূর ভবিষ্যতে। রোগটি ইউরোপ এবং আমেরিকা থেকে মূলত এদেশে এবং তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলিতে সংক্রামিত হয়েছে বলে জানা গেছে। এ রোগে আক্রান্তদের শরীরের বিভিন্ন অংশ আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে ধাতব আকার ধারণ করছে——। দেশের অনগ্রসর অঞ্চলগুলিতে এ রোগ এখনও দেখা যায়নি।" তার পরেই শুনতে পাওয়া যায়, প্রধানমন্ত্রী হেলিকপ্টার যোগে দেশের বন্যা কবলিত অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করে সুইডেন রওনা হয়ে গেছেন। লাল দরজায় বার বারই টিভি-র ব্যবহার আছে। এই শেষ ব্যবহারটিতে সমকালীন ভারতীয় বাক্স প্রকট ছাপ রেখে যায়। সভ্যতার ব্যাধি সংক্রমণের প্রক্রিয়াটার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এবং ঝিমিয়ে পড়া নবীন হঠাৎ যেন টি.ভি-র পর্দায় দেখতে পায় নিজের বালককাল। বালক নবীন বলছে, "নবীন ওঠো, উঠে পড়ো। নবীন পালাও।" ঝিমুনি ভেঙে যায়।

এইখানে এসে দর্শকের মন দোল খাবে। অসাড় হয়ে আসা এই মানুষটি তবে এক সমকালীন পরিস্থিতির শিকার। তার কি ত্রাণ নেই কোনও! নবীনের রোবোট হয়ে যাওয়ার দুর্দশা কেন্দ্রে থাকে ঠিকই, কিন্তু তাকে ঘিরে থাকে বহমান প্রাণময়তার বলয়। সে বলয়ে থাকে চেরাপুঞ্জির স্মৃতি, থাকে মায়ের গান, থাকে স্ত্রী বেলার সুস্থ প্রতিবাদ এবং দিনুর বেপরোয়া সমস্যাহীন জীবনযাপনের দৃশ্যপুঞ্জ। ডায়মণ্ডহারবারে দিনুর দ্বিতীয় বৌ মালতীকে দেখতে গিয়ে নবীন জলকল্লোলের ধ্বনিপটে, হাওয়ার মাতনে প্রসন্ন এক স্বাভাবিক মানুষের মতো কথা বলেছিল। স্বাভাবিক মানুষের মতোই বিস্ময়ে আপ্লুত হয়েছিল দিনুর প্রথম বৌ সুখী সরল জীবনদর্শনের বয়ানে। খুবই মজা পেয়েছিল দিনুর 'লাভার' উছল প্রতিমাকে (সোমা চক্রবর্তী) দেখে। চরম অনন্ময়ের রোগে আক্রান্ত নবীন একেবারেই রোবোট হয়ে যায়নি। বৃদ্ধদেবের 'রোবোটের গান' কবিতাগুচ্ছের বিপ্রতীপ আখ্যানের মতো পরাক্রান্ত প্রাণের, মানবিকতার টান এ ফিল্মেও ফল্গু-বহুতায় বয়ে গেছে। সৃজনের দুই ধারায়, কবিতা এবং ফিল্মে বৃদ্ধদেবের অবিরাম আসা যাওয়া চলেইছে ইদানীং। লাল দরজা-র বিষয় ভাবনায়, সংলাপের ভাষায় একটা সময়ে লেখা তাঁর কবিতা জড়িয়ে আছে।

তবুই দর্শককে বৃদ্ধদেব ছবির শেষ ছয় মিনিট সময় একেবারেই সংলাপ বর্জিত শুদ্ধ চলচ্চিত্রের চিত্রকল্প-ধ্বনিকল্পের মধ্যে যখন টেনে নেন, ভেতর থেকে নবীনের ত্রাণের স্বপ্ন জাগিয়ে তোলেন, দৃশ্যমান এক শুদ্ধ কবিতার চূড়ায় তুলে নিয়ে যান ফিল্মটিকে, তখন মনে হতে থাকে, আমাদের আধুনিক সিনেমায় শিল্পগত চরিত্রার্থতার একটি বিরল দৃষ্টান্ত নির্মাণ করলেন। হাসপাতালের নির্জন বারান্দায় কুয়াশা ছেয়ে আসে। গুড়েদু চট্টোপাধ্যায়ের নীরব অভিনয়ে বাস্তব আর স্বপ্নের ভুবনে একটি মানুষের বিপরীত টান ভাষা পায়। দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে যান গুড়েদু। নিজের বাসার সিঁড়ি বেয়ে ওঠেন। দরজায় তালা, কিন্তু চাবি হারিয়ে গেছে। কয়েক ধাপ নেমে আবার উঠে এসে বন্ধ দরজার সামনে হাত হাতে রেখে 'ছোট মোটি ছন্নটি বড় আবেগে উচ্চারণ করেন। খোলে না দরজা। ফিল্মের মূলসানটি-ধীম মিউজিক খুব তৎপর্যে রণিত হয়ে ওঠে, আমাদের চৈতন্যে চেরাপুঞ্জির টান লাগে। এবং অবার্থভাবেই আসে চেরাপুঞ্জির সবুজ পাহাড়ের অসীম বিস্তার। নবীন তাহলে স্বপ্নে হোক সত্যে হোক চেরাপুঞ্জিতে ফিরে এল। বালক দু'হাত বাড়িয়ে ডাকে ইউরোপ-আমেরিকা থেকে সংক্রমিত রোক্ট-ব্যাধিগ্রস্ত নবীনকে। মেঘে কুয়াশায় নবীন এগিয়ে যায় তার নিহিত আত্মরূপম, অল্টার-এগো বালকটির দিকে। একটি অমোঘ শুদ্ধতার মুহূর্ত যেন নিবিড় হয়ে ওঠে। মেঘের আস্তরণের ভেতর দিয়ে দেখা যায় সেই লাল দরজাটা আরও-একবার সত্যি সত্যি খুলে গেল। মূলতানের সুতোয় গাঁথা এই শেষ ছয় মিনিটের দৃশ্য প্রবাহের চিত্রকল্পগুলিতে কবিতার মুহূর্ত, চিত্রকলার বিন্যাস-সব পরস্পর মিলে মিশে যায়। চলচ্চিত্রের নন্দনের দিক থেকে হয়ে ওঠে একটি স্মরণীয় দৃষ্টান্ত।

সংবেদন-রিক্ত সভ্যতার ব্যাধিকে পরাস্ত করে প্রতিষ্ঠা পায় মানবিক স্বপ্ন। আধুনিক জীবনে নিরর্থ হয়ে যাওয়া স্বপ্নকে চাক্ষুষ বাস্তবে আবার প্রতিষ্ঠিত করে লাল দরজার অন্তিম দৃশ্যপুঞ্জ। স্বপ্নই যাবতীয় বিকল্পের প্রতিবাদ—এই নিহিত শাঁস-এর একত্ত্বাত্রয়, লাল দরজা কোনও বিচ্ছন্ন কাজ নয়, 'তাহাদের কথা', 'চরাচরে'র সঙ্গে, ধারাবাহিক কাজ। ফিল্মে বৃদ্ধদেব দাশগুপ্তর ব্যক্তিগত বিকাশের আর একটি গুরুত্বময় পর্ব। হয়ত ফিল্মটির ভিন্ন পাঠও সম্ভব। কিন্তু যে কোনও দৃষ্টিবিন্দু থেকে পাঠ একই সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যাবে মনে হয়। বিচ্ছিন্নভাবে ভাল-মন্দের বিচার নয় স্থিতধী এই পরিচালকের বিশ্বদৃষ্টি ও শিল্পদৃষ্টি বিকাশের গুরুত্ব বুঝে নেবার দায় থাকবে সব সমালোচনায়, সকল পাঠে। নবীনের মায়ের চরিত্র-উন্মোচক একটিই গান রয়েছে, নেপথ্যে গেয়েছেন সুপ্রীতি ঘোষ। অনবদ্য গাওয়া। এখানে উদ্ধৃত থাক গানটি। "ওগো কে তুমি গো/পরপারে তরণীখানি ওই বাহিয়া যাও/বহদিন হল এদেশে এসেছি/যাহা কিছু মোর সব হারায়েছি/শূন্য পরাণে বসে আছি ঔরে,/মিনতি করি মোরে পারে তুলে নাও।"

খোয়াবনামা ঃ কমিউনিটির স্বপ্নপরিক্রমা

বিষ্ণু বসু

'খাকি রঙের কাগজে বইয়ের মলাট সেলাই করা, সেখানে কার কাঁচা হাতের লেখা, 'খাবনামা, ফালনামা ও তবির'। এসব খাবনামা তো কিনতেই পাওয়া যায়—'

এসব কথা আখতারুজ্জামান ইলিয়াস্ পাঠকদের জানিয়ে দেন তাঁর 'খোয়াবনামা' উপন্যাসের একটি পর্যায়ে এসে। কেরামত আলি হোসেন দেখেছিল কুলসমের দাদার এ বইটির 'ভেতরে ছাপা কোনও পাতা নাই। অর্ধেকের বেশি পাতা জুড়ে চৌকোনা দাগ, সেইসব বর্গক্ষেত্র আবার ভাগ করা হয়েছে ছোটো ছোটো ঘরে। একেকটি ঘরে একেকটি আরবি অক্ষর।' এ অক্ষরগুলোর সুবাদে আরবি না-জানা পাঠকদের মনে একটি সম্ভ্রমপূর্ণ দূরত্ব সহজেই তৈরি হয়ে যায়, যেমন হয়েছিল কেরামত আলির। তার ফলে খোয়াব ও খোয়াবের ব্যাখ্যায় খুব সহজে এসে যেতে পারে একটি রহস্যের বলয়। ইলিয়াস কি এমনই একটি পরিবেশ রচনা করতে গিয়েছেন তাঁর 'খোয়াবনামা' উপন্যাসে? সেকারণেই কি বেছে নিয়েছেন সমাজের মধ্যে ব্যাপকপরিচিত এ নামটিকে? কিন্তু এ উপন্যাসে স্বপ্নের যেসব ব্যাখ্যা আছে সেগুলো তো মেলে না খাবনামায় পরিবেশিত বিবিধ অর্থের সঙ্গে। নিজেকে মৃত দেখলে নাকি—প্রচলিত খাবনামার অর্থ অনুযায়ী—'রোগমুক্তি ও আয়ুবৃদ্ধির চিহ্ন' বলে ধরে নেওয়া যায়। অথচ 'খোয়াবনামা' উপন্যাসে একটি চরিত্র স্বপ্নে নিজেকে মৃত দেখে শেষপর্যন্ত বিপর্যয়েরই মুখোমুখি হয়েছিল। ইলিয়াস কি তাহলে জেনেতনেই খাবনামার প্রচলিত অর্থ বিপর্যস্ত করতে করতে অথবা করবার জন্যই গড়ে তুলেছেন নিজস্ব এই 'খোয়াবনামা'?

'খোয়াবনামা' উপন্যাসের সঙ্গে পাঠকদের প্রথম পরিচয় ঘটেছিল পাঁচ বছর আগে যখন চট্টগ্রামের 'লিরিক' পত্রিকায় 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যায়' বেরিয়েছিল তার খুবই সামান্য প্রথম অংশটুকু। ছাপা মাত্র উনত্রিশ পৃষ্ঠার পরিসরে পরিবেশিত উপন্যাসের এ অংশ পড়ে তেমন বোঝা যায়নি ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে কোন্ একটি মহৎ কর্মের জন্য। প্রকাশিত অংশটুকুতে নেই কোনও অধ্যায় বিভাগ, উপন্যাসের নিজস্ব জটিলতা তৈরি হয়নি তখনও। শুধু বোঝা যাচ্ছিল ভাষানির্মাণ বাক্যের গঠন প্রতিমার ব্যবহার কোন্ স্রষ্টাতন্ত্রের পথ খুঁজে নিতে চাইছে। ইলিয়াস বহুপ্রজ লেখক নন। 'খোয়াবনামার' আগে আমরা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি চারটি গল্প-গ্রন্থে আঠারোটি গল্প এবং একটি উপন্যাস 'চিলেকোঠার সেপাই'। তাঁর এ প্রথম উপন্যাসের সঙ্গে দ্বিতীয় উপন্যাস প্রকাশের ব্যবধান পুরো দশবছর। মহাকাব্য রচনার জন্য একটি যুগপ্রই প্রস্তুতির প্রয়োজন। ধীরে ধীরে প্রায় অনিবর্যভবে ইলিয়াস গেঁথে তুলেছেন একটি যুগকে। উপন্যাস শেষ হয়েছে, ইলিয়াসও প্রস্থান করেছেন পৃথিবী থেকে। তাঁর প্রয়াণের পর অবশ্য আরেকটি গল্প সংকলন পাঠকদের কাছে পৌঁছেছে।

॥ ২ ॥

প্রচলিত 'খাবনামা' আসলে কিছু ইচ্ছাপূরণের ফিরিস্তি। নানা ধরণের নিদেনের মধ্য দিয়ে এসব খাবনামার সংকলকরা প্রশ্রয় দেন কিছু সংস্কারকে। ইলিয়াস কিন্তু প্রচলিতকে আশ্রয় করে ভাঙতে চান সংস্কারকেই। তাই প্রচলিত 'খাবনামা' ও ইলিয়াসের 'খোয়াবনামা' অবস্থান করে বিপরীত প্রান্তে। ইলিয়াসের উপন্যাসটি এ বিপরীতেরই দ্বন্দ্ব।

'খোয়াবনামা'-য় দুটি বিদ্রোহ, দুটি আন্দোলন। এবং দুটি খোয়াব। এ দুটি আন্দোলনের ব্যবধান প্রায় দুশো বছরের। প্রথমটি হল পলাশীর যুদ্ধের পর সংঘটিত বিবিধ প্রজাবিদ্রোহের মধ্যে অগ্রগণ্য সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ। প্রথমটি ঘটেছে ইংরেজ রাজত্বের সূচনার সময়ে। দ্বিতীয়টিতে ঘটেছে ইংরেজদের হাত থেকে জাতীয় নেতাদের হাতে ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস যার পরিণতি স্বাধীনতা ও দেশভাগ। ইলিয়াস যেন বলতে চান দুই শতবর্ষব্যাপী একটি জাতির খোয়াব আসলে ব্যর্থতারই বিস্তর। অজস্র প্রজাবিদ্রোহে যা সম্পন্ন হয়নি। দেশভাগসমন্বিত স্বাধীনতাও তাকে সার্থক করে তুলতে পারেনি। জনগণের খোয়াব তবে বাস্তবতায় পৌঁছতে পারে না।

অথচ সম্ভাবনা ছিল। নইলে গলায় গুলিবেঁধা ফাঁক নিয়ে মুনশি কখনও চড়ে বসত না কাৎলাহার বিলের কোণে পাকুড়গাছের মাথায়। আর চিরাগ আলিও তুলে নিত না নিজের গলায় এ বিদ্রোহের গান—"মুনসির হুকুম দরিয়াতে গজরিলে।/কোম্পানী সিপাহি চোখে দেখে আজরাইলে—।"

কিন্তু 'ফকির নাই, মুনসির হুকুম আসবে কার মুখ দিয়ে?' আসে বৈকুণ্ঠের গলায় ভর করে। আসে কেরামত আলির ব্যগ্র সাধনার মধ্য দিয়ে। কিন্তু দুশো বছরের ব্যবধানে এ গানের মধ্যেও ক্রমে গড়ে উঠতে থাকে ব্যবধান। যে বিদ্রোহে মজনু শাহ ও ভবানী পাঠক লড়েছিলেন একসঙ্গে, যাঁদের নিয়ে গান বাঁধা হয়েছিল যৌথভাবে, স্বাধীনতার প্রাক্কালে আন্দোলনের বিশেষ পর্যায়ে এসে, প্রশ্ন ওঠে বিগত বিদ্রোহে নেতা ছিলেন কে? মজনু শাহ না ভবানী পাঠক? এ প্রশ্ন থেকেই যেন জন্ম নিতে থাকে আরেকটি খোয়াব।

উপন্যাসের সময়সীমা মোটামুটি ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে। বছর দুয়েক আগে ঘটে গেছে পঞ্চাশের মন্বন্তর, যার সুযোগে বৃহৎ জোতদার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে শরাফত মন্ডল। তার হাত শুধু যে নিঃস্ব চাষিদের জমি দখল করেছে তা নয়। অধিকার করে নিয়েছে নদী ও কাৎলাহার বিলের পানিকেও। তাই গ্রামীণ অর্থনীতিরও ঘটছে নতুনতর বিন্যাস।

বিভাগপূর্ব পূববাংলার অর্থনীতির সাধারণ চেহারা কেমন ছিল তা নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে। মুসলমান চাষির সংখ্যা অনেক বেশি হলেও সেখানকার জমিদাররা মূলত ছিলেন হিন্দু। তাই পূর্ববঙ্গের মুসলিম বুর্জোয়ারা দেশের স্বাধীনতার চাইতেও অর্থনৈতিক অধিকার বিস্তারের দাবিকে করেছিলেন অগ্রগণ্য। ত্রিশের দশকে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির অভূতপূর্ব সাফল্যের মূলে ছিল এ ধরণের আবেগকে নিজেদের অনুকূলে আনার সামর্থ্য। তখনও মুসলিম লীগ বাংলার রাজনীতিতে সবল প্রতিপক্ষ ছিল না। কিন্তু কংগ্রেসের সংকীর্ণ মনোভাব ও ভুল পদক্ষেপ পরিবেশকে দ্রুত পাল্টে দিয়েছিল। তাই যে-মুসলিম লীগের বিরোধিতা করেও ফজলুল হকের প্রতিষ্ঠা, তাঁকে মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানেই মুসলিম লীগের তরফ থেকেই লাহোর অধিবেশনে পেশ করতে হয়েছিল পাকিস্তান প্রস্তাব। ফলে নির্মিত হয়েছিল এ দেশের সর্বকৃষ্ট ঐতিহাসিক ট্রাজেডির পটভূমি। সারা চল্লিশের দশক ধরে ঘটেছিল তারই অভিব্যক্তি। এ উপন্যাসে ইলিয়াস রূপ দিয়েছেন ইতিহাসেরই এ ট্র্যাজিক উল্লাসকে।

॥ ৩ ॥

ইলিয়াস অবশ্য এ ট্র্যাজেডিকে মেনে নিতে পারেননি কখনওই। তাঁর মতে দেশভাগ ছিল মিনিংলেস। তবু এ 'মিনিংলেস' ব্যাপারটি কেন ঘটল? এ জিজ্ঞাসারই জবাব যেন তিনি বিশ্লেষণ করেছেন সারা উপন্যাস জুড়ে। তিনি দেখেছেন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কী প্রবল অনিবার্যতা নিয়ে ঢুকে গেছে সাম্প্রদায়িকতায়। নানাধরণের রাজনৈতিক টানাপোড়েন তখন বঙ্গদেশকে ব্যস্ত রেখেছিল। কংগ্রেস তো ছিলই। ছিল মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজাপার্টি। এর চতুর্মুখী চাপে আন্দোলিত হচ্ছিল বাংলার জনজীবন। যুদ্ধ ও মন্বন্তরের আভিঘাত মিলেমিশে তখনও। গ্রামবাংলার ভেঙেপড়া অর্থনীতি তখন তৈরি করে তুলছিল নতুনতর বিন্যাস। অথচ তার নিহিত সংকট বুঝতে অক্ষম হচ্ছিল প্রধান পার্টিসমূহ। অথবা বুঝতে চাইছিল না নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের দরুন। কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে অবশ্য প্রদেশের বিভিন্ন প্রান্তে সংঘটিত হচ্ছিল তেভাগা আন্দোলন কিন্তু তারও ফসল এসে সঠিকভাবে পৌঁছতে পারছিল না প্রান্তিক কৃষকদের কাছে। তার অন্যতম কারণ ছিল গ্রামবাংলার গরিষ্ঠ মুসলমান প্রজাদের মধ্যে চেতনার ব্যাপক অভাব। তাদের বোঝানো হয়েছিল তার মূলশত্রু হল হিন্দুরা। হিন্দুদের কবল থেকে অর্থনীতির হাল নিজেদের হাতে তুলে নিতে পারলেই সব সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে। কিন্তু হিন্দু জমিদার ও ব্যবসাদারদের অপসারণের ফলে যে তৈরি হয়ে চলেছে নতুন মুসলমান জোতদারদের দল, ক্ষমতা চলে আসছে শরাফত মন্ডলদের হাতে এ বিষয়ে আর সতর্কতা থাকছিল না। ইতিহাসের অবিমৃশ্য-কারিতায় ক্ষুব্ধ ছিলেন ইলিয়াস। পরিস্থিতির এ তীর্যকতা তাঁর মধ্যে নির্মাণ করেছিল প্রচন্ড ক্রোধ। পূর্ববর্তী প্রজন্মের আত্মকলহের ফলে জাতি হিসাবে বাঙালিদের অবনমন প্রক্রিয়ার শুরু যে সেই সময় থেকেই। এ কথা যেন ইলিয়াস কিছুতেই বিস্মৃত হতে পারেন না। শুধু ক্রোধই নয়, তার সঙ্গে মিশে রয়েছে গভীর বেদনা। কিন্তু ক্রোধ ও বেদনাকে রোমান্টিক অথবা সেন্টিমেন্টাল করে তোলেননি তিনি। সমানুপাতিক ব্যঙ্গ মিশিয়ে তাকে করে তুলেছেন মহাকাব্য।

ক্রোধ বেদনা ব্যঙ্গের সমানুপাতিক মিশ্রণের প্রকাশ ইলিয়াস ঘটিয়েছেন ফ্যান্টাসিতে। যে-বাস্তবকে তিনি চান, অথচ যে-বাস্তব নির্মিত হতে পারেনি ইতিহাসেরই আক্রমণে, তাকে তিনি খুঁজে নিতে চান ফ্যান্টাসিতে। একটা বিষয়ে এখানে একটু লক্ষ্য করা দরকার। ইলিয়াস অবিভক্ত ও বিভক্ত বাংলার বিবিধ আন্দোলনকে রূপ দিয়েছেন তাঁর বিভিন্ন সময়ের কথাসাহিত্যে তাঁর কিছু গল্পে ও দুটি উপন্যাসে। 'খোয়াবনামা'-য় যেমন এসেছে চল্লিশের দশকের আন্দোলন এবং তার সূত্র ধরে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ, তেমনি 'চিলেকোঠার সেপাই'-তে এসেছে পূব-বাংলার উনসত্তরের অভ্যুত্থানের কথা। আবার একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ যার ফলে আবির্ভব ঘটেছিল স্বাধীন বাংলাদেশের। তাকে নিয়ে কোনও উপন্যাস লিখে উঠতে না পারলেও অন্তত গুটি তিন-চার গল্পের মধ্যে তার প্রতিসরণ ঘটেছিল। কৌতূহলী পাঠক অবশ্যই লক্ষ্য করবেন এ ধরণের সবগুলো সাহিত্যকর্মের মধ্যে বারে বারে ফিরে এসেছে স্বপ্নের কথা যাকে বলা যায় ফ্যান্টাসি। 'চিলে কোঠার সেপাই'-তে ওসমান ক্রমাগত স্বপ্ন দেখেছে। মৃত খিজিরের সত্তা আন্দোলন বিধ্বস্ত ঢাকা শহরের উপর দিয়ে উড়ে গেছে ফ্যান্টাসির শর্ত মেনেই। এমনকী 'মিলির হাতে স্টেনগান' ও 'জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল' গল্পে এমন ধরণের ফ্যান্টাসির প্রতি ইলিয়াসের পক্ষপাত অলক্ষ্য থাকেনি। ইলিয়াসের নাকি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে উপন্যাস লেখার ইচ্ছে ছিল। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণ সে অভিপ্রায়কে পূর্ণ হতে দেয়নি। কিন্তু যদি সত্যই লেখা হত মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে উপন্যাস, তাহলে সম্ভবত তার মধ্যেও প্রকাশ পেত ইলিয়াসের এ ধরণের মানসিকতা। কেননা মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে উল্লিখিত গল্পগুলিতেও দেখা যায় প্রধান চরিত্রের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে স্কিৎসোফেনিয়া। আব্বাস মাস্টার (মিলির হাতে স্টেনগান) ও লালমিয়া (জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল) নিজেদের স্বপ্নবিকলনের মধ্য দিয়েই ব্যক্ত করে মুক্তিযুদ্ধের ব্যর্থতা। এমনকী

আব্বাস মাস্টার যখন চিকিৎসার ফলে সুস্থ হয়ে ওঠে, ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয় স্বাভাবিক জীবনে, তার স্বপ্নময় শূন্য জায়গাতে অবস্থান নেয় মিলি। ইলিয়াস যেন বলতে চান সময় যখন সন্ধিবিহীন, তখন স্কিৎসোফেনিয়া থেকে প্রস্থান কখনওই সম্ভব নয়। কোনও একজনকে, যেন ইতিহাসের দায় মেনেই, সেই শূন্যস্থানকে পূর্ণ করতে হয়। প্রসঙ্গত কারুর কারুর মনে পড়তে পারে, জাঁ পল সার্ত্রের 'দ্য কনডেমড অব আলটোনা' নাটকের লেনির কথা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সংঘটিত যে পাপের বোঝা বহন করে চলছিল তার ভাই ফ্রানৎস, তার অবস্থান বদলের সঙ্গে সঙ্গে লেনিকেই তুলে নিতে হয়েছিল প্রায়শ্চিত্তের ভার। সার্ত্রের মতো ইলিয়াসও যেন বিশ্বাস করেন পৃথিবীর 'অদ্ভুত আঁধার'-কে এড়াতে পারে না সময়। কোনও এক বা একাধিককে প্রায়শ্চিত্তের সঙ্গে যুক্ত থাকতেই হয়, তাদের হতে হয় স্কিৎসোফেনিক। তখন আশ্চর্য এক স্বপ্নের জাল আচ্ছন্ন করে ব্যক্তি বা সমষ্টিকে।

॥ ৪ ॥

এখানেই প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। ইলিয়াস কেন বার বার সবগুলো আন্দোলনের মধ্যে দুলে গেছেন এমন স্বপ্নের জাল? তিনি কি এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই বোঝাতে চান এসব আন্দোলনের ব্যর্থতাকে? ওসমানের স্বপ্ন যেন সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছতেই সাহায্য করে। হাড্ডি খিজিরকে খুঁজতে গিয়ে ওসমান তাই দেখে, 'মাথার ওপর ইলেকটিকের তারের ঝাঁক ছুটে চলে ল্যাম্পোস্ট ছুঁয়ে ছুঁয়ে। তারের ভেতরকার বিদ্যুতের চলাচল খিজির নিশ্চয়ই স্পর্শ করতে পাচ্ছে। স্পর্শ করা কি বলছো? লোহার রডের মতো আঙুলগুলো দিয়ে ইলেকটিক তার মুচড়ে বিদ্যুৎ সে নিঙড়ে নিচ্ছে নিজের হাড্ডিসার শরীরে। না হলে ব্যাটা এরকম স্পিড পায় কোত্থেকে? ওসমান এবার খুব জোরে দৌড়তে শুরু করে। তার আশা: ইলেকটিক তারের ঝাঁক একবার না একবার তাকে তুলে নেবে ঐ উঁচুতে, খিজিরের পাশে চলতে তখন আর তাকে কোনও বেগ পেতে হবে না' (চিলেকোঠার সেপাই)। ওসমানের এ স্বপ্নযাত্রা যেন বোঝাতে চায় উনসত্তরের অভ্যুত্থানকে নিয়ে যতই কেন না উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা যাক, তার পরিণতি মূলত ব্যর্থতাই বরণ করেছিল। এমনকী একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধও যেন পূর্বজদের অনুগামী। কেননা ইলিয়াস বিশ্বাস করেন, 'যখনই কোনও আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছে—একজন না একজন তাকে হাইজ্যাক করেছে।' এ হাইজ্যাকের নেতা হতে পারেন জাতির তথাকথিত পিতারাও। ইলিয়াস তাই বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধ করেছে চাষীরা। মধ্যবিত্তরা পালালেও চাষীরা কখনও ভাবেনি পালানোর কথা কখনও ভাবেনি আমরা কিছু করলাম যার জন্য পুরস্কার পাওয়া যেতে পারে। তারা, এখনও আদিম লাঙল এবং কুয়োর মধ্য দিয়েই বেঁচে আছে।' ইলিয়াস কিছু বিশ্বাস করেন এর বিপরীতটা হওয়াই ছিল বাঞ্ছনীয়। অথচ তা কখনওই হয় না। তাই বাস্তবের সঙ্গে প্রত্যাশার সংঘর্ষে উৎপন্ন হয় ফ্যান্টাসি। এ কারণেই ইলিয়াসের দুটি উপন্যাস ও কিছু গল্পে বার বার ফিরে আসে ফ্যান্টাসি। ফ্যান্টাসি 'চিলেকোঠার সেপাই'-তে আছে, আছে 'খোয়াবনামা'-তেও। অবশ্য তাদের মধ্যে তফাত আছে। 'চিলেকোঠার সেপাই'-তে তিনি বাস্তবকে নিয়ে গেছেন ফ্যান্টাসিতে, আবার 'খোয়াবনামা'-য় যেন ফ্যান্টাসিকেই করে তুলতে চেয়েছেন বাস্তব।

এ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনায় ইলিয়াস বলেছিলেন : খোয়াবনামা-য় ফ্যান্টাসিটা অনেক বেশি। একটা গোটা কমিউনিটি স্বপ্ন দেখছে। শুধুমাত্র তমিজের বাপ একা নয়। তমিজ খেতমজুর না হয়ে সে বর্গাচাষী হবে এই অবধি তার উচ্চাকাঙ্খা।...আমি চেয়েছি কমিউনিটিকে সামনে আনতে। যে মানুষটি কখনও সামনে আসেনি—চেরাগ আলি—তারও স্বপ্ন আছে। কেরামত আলি একজন আছে সেও স্বপ্ন দেখে।...গোটা কমিউনিটির খোয়াব দেখাতে গিয়ে আমি ফ্যান্টাসিতে চলে এসেছি' (অন্তরঙ্গ ইলিয়াস)। এ ফ্যান্টাসি সে কারণেই বাস্তব হয়ে উঠেছে। ইলিয়াস তাই বলেন, 'যদি এটা বেশি বাস্তব হয়ে থাকে, এটা জীবনেরই একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমাদের জীবনও তো তাই। আমাদের জীবনও তো স্বপ্নের মধ্য দিয়েই কাটছে' (অন্তরঙ্গ ইলিয়াস)। অবশ্য 'অনেক স্বপ্ন অনেক আশা আকাঙ্খা আর দুঃস্বপ্ন এখানেই দেখা যাচ্ছে। দেশের মানুষের স্বপ্ন হাইজ্যাক করে নেয় ওপরতলার লোকেরা' (অন্তরঙ্গ ইলিয়াস)। 'খোয়াবনামা' তাই কমিউনিটির স্বপ্ন। প্রত্যাশা ছিল দেশভাগের ফলে পাকিস্তান সম্ভব হলে এ স্বপ্ন সফল হবে। কিন্তু এ স্বপ্নও 'হাইজ্যাক' করে নেয় শরাফত মন্ডল, আবদুল কাদের, এমনকী বোধহয় ইসমাইলও। মুসলিম লীগের নতুন নেতা কাদের অবশ্য বলেছিল, পাকিস্তান জমিদারি সিস্টেম উচ্ছেদ করা হবে। বিনা খেসারতে জমিদারি উচ্ছেদ করা হবে। পাকিস্তানি নিয়ম হবে জমি তার লাঙল যার। পাকিস্তানে আমিরে গরিবে ফারাক থাকবে না। কাদের হয়ত আন্তরিক বিশ্বাস থেকেই এ কথা বলেছে, কিন্তু 'জমিদারি ব্যবস্থার অভাবে সম্পত্তির মালিকানায় অরাজকতা দেখা দেবে ভেবে শরাফত মন্ডল সায় দিতে পারে না।' তার মনোভাব প্রতিফলিত হয় ছোটোমিয়ার সংলাপে, 'তোমরা জমিদারদের শরফত কেড়ে নেবে, বড়লোকদের মারবে! কম্যুনিস্টদের সঙ্গে তাহলে তোমাদের ফারাক কি?' এসব কথা নাকি নাস্তিকতার প্রকাশ। বরং তাঁরা বোঝাতে চান, সম্ভবত বিশ্বাসের গভীরতা থেকেই, যে 'ধনীগরিব বড়ো কথা নয়, বীরহেজগার মানুষ আমির হলেও ভালো, গরিব হলেও ভালো।' তাই ধনী গরিবের সহাবস্থানই মুসলমান সমাজকে উন্নত করে তুলবে। তাঁদের ভেতরকার অর্থনৈতিক বিভেদ ঘোচাবে জাকাত। অতএব নতুন নেতা আবদুর কাদের এ সিদ্ধান্তে পৌঁছয়,

'পাকিস্তান ছাড়া মোসলমানের টেকার পথ নাই।' আবদুর কাদের এক পুরুষের জোতদার শরাফত মণ্ডলের ছোট ছেলে।

এ উপন্যাসের অভিযোগে পাকিস্তান আন্দোলন অব্যাহত থাকে। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে প্রজাপুঞ্জ লক্ষ্য করে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থান পাল্টায়নি। মুকুন্দ সাহা অবশ্য পূব বাংলা ছেড়ে চলে গেছেন, চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন অন্যান্য হিন্দু জমিদার ও ধনীর দল। যে-বৈকুণ্ঠ এক সময়ে কীর্তনের সুরে দলমত নির্বিশেষে চাষীদের শোনাত 'গিরির গান', গাইত "পাষাণে হৃদয় বাচ্চা/কাঁদো গিরিগণে কান্দো/ভবানী পাঠক আর নাই—" সেই গানও ক্রমে উজ্জীবন হারিয়ে হয়ে উঠতে থাকে সাম্প্রদায়িকতার হাতিয়ার। সুনিপুণ প্রচার চলে আঠারো শতকের বিদ্রোহের গুরুত্বের বিরুদ্ধেও, প্রশ্ন তোলা হয় সে বিদ্রোহের নেতা ছিলেন কে—ভবানী পাঠক না মজনু শাহ? এ সমস্যা সমাধানে পৌঁছবার আগেই খুন হয়ে যায় বৈকুণ্ঠ। তারই পরিণতিতে কি পাকুড়গাছসহ উধাও হয়ে যায় মুনসি? এ কথা স্পষ্ট না হলেও স্বপ্নসমেত চোরাবালিতে ডুবে যায় তমিজের বাপ উপন্যাসে যার কোনও নিজস্ব নাম নেই। এবং তমিজ এমনকী ভাগচাষী হতেও ব্যর্থ হয়, মিথ্যা খুনের মামলায় তাকে ফেরারী হতে হয়। কাংলাহার বিল জমা নিয়ে মাঝিদেরও উৎখাত করে শরাফত। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে অর্থনৈতিক প্রভু শুধু পাল্টায়, প্রজাদের প্রাথমিক অবস্থারও কোনও পরিবর্তন ঘটে না।

পরিবর্তন হয় না বলেই খোয়াবও খতম হয় না, তার আশ্রয়ের বদল ঘটে শুধু। চেরাগ আলি যে স্বপ্ন দেখে গেছেন দীর্ঘকাল, তমিজের বাপ যে-স্বপ্নকে চারিয়ে দিয়ে গেছে সমাজের মধ্যে, তদের বিলোপের সঙ্গে সে-খোয়াব সমাপ্ত হয় না। খোয়াব আবার নতুন আশ্রয় খুঁজে পায় সখিনার মধ্যে। সখিনা তো তমিজেরই সন্তান। চেরাগ আলির স্বপ্ন তাই তমিজের বাপকে ছুঁয়ে প্রবাহিত হতে থাকে সখিনার মারফত। তার মা ফুলজান সখিনাকে ছিনিয়ে আনতে চায় এ খোয়াবের দুনিয়া থেকে। কিন্তু ফুলজান 'মেয়েকে নড়াতে পারে না। মোষের দিঘির উঁচু পাড়ে লম্বা তালগাছের তলায় পুরোনো উইঢিবির সামনে খটখটে শক্ত মাটিতে পাজোড়া জোরে চেপে রেখে ঘাড়ের রগ টানটান করে মাথা যতোটা পারে উঁচু করে চোখের নজর শানাতে শানাতে সখিনা তাকিয়ে থাকে কাংলাহার বিলের উত্তর সিথানে জখম চাঁদের নিচে জ্বলতে-থাকা জোনাকির হেঁসেলের দিকে? (খোয়াবনামা)। এ খোয়াবেরই কি ভিন্নতর প্রকাশ ঘটেছিল 'মিলির হাতে স্টেনগানে'?

॥ ৫ ॥

বাস্তবের স্বপ্নভঙ্গের পরিণতিতে ফ্যান্টাসির স্বপ্নজগতে প্রস্থানের পরে ইলিয়াস পেরিয়ে আসেন বাস্তবতারই কতগুলো পর্যায়। ক্রোধ ও বেদনার সঙ্গে ব্যঙ্গের আনুপাতিক মিশ্রণ তাই কখনও কখনও তাঁর কথাকাহিনীতে প্রশ্রয় দেন কিছু যৌনতার, এমনকী খানিক অশ্লীলতারও। 'চিলেকোঠার সেপাই' তে ওসমান হস্তমৈথুন করে। এ প্রক্রিয়ার কিছু অনুপুঙ্খ বর্ণনাও দেন ইলিয়াস। এ হস্তমৈথুন, ইলিয়াসের মতে ইতিহাসেরই ব্যর্থতার প্রতিফলন। 'গরবাচব-ও হস্তমৈথুন করে'; এ কথা ইলিয়াসের। সমাজতন্ত্রকে বিপর্যয়ের পথে ঠেলে দিয়েছে যে ব্যক্তি, তার পক্ষে এমন কাজই অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে মনে করেন ইলিয়াস। সময়কে বন্ধ্য করে তুললে হস্তমৈথুন ছাড়া পথ কোথায়? উনসত্তরের অভ্যুত্থান এমনই এক বন্ধ্য আন্দোলন ছিল। তার প্রমাণ এ আন্দোলনের পরিণাম হিসাবে দু'বছর পরে যে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল এবং আবির্ভাব ঘটেছিল সার্বভৌম ও স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের তা সাধারণ মানুষের জীবনে কোনও ধরণের মুক্তির সন্ধানই দিতে পারেনি। তথাকথিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা হয়ত এসেছে, কিন্তু দেশের অর্থনীতি ও সামাজিক পরিস্থিতি আরও ধ্বস্ত হয়েছে। পূব্বালোর এ দ্বিতীয় স্বীকৃতও সামান্যতম আশাপ্রদ হয়ে উঠতে পারেনি। তাই হতাশা থেকে হস্তমৈথুনের মনোভাব আয়ত্ত করাই স্বাভাবিক বলে ইলিয়াস মনে করেন।

'খোয়াবনামা'-য় যৌনপ্রক্রিয়াটি দেখানো নেই। তার কারণ এমন হতে পারে 'খোয়াবনামা'র প্রধান কুশীলবেরা মধ্যবিত্ত নয়, শহুরেও নয়। 'চিলেকোঠার সেপাই' যে আন্দোলনের কথা বলেছে, তাতে গ্রামের প্রসঙ্গ থাকলেও ঘটনার কেন্দ্রস্থল ঢাকা মহানগরী। ঢাকার মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তরাই এ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল আনুপাতিকভাবে অনেক বেশি। তাদের দেহ ও মনের অসংশ্লেষ থেকে উদ্ভূত বিকল্পন নানাধরণের বিকারকে প্রশ্রয় দিয়েছে। অন্তত ওসমানের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে।

'খোয়াবনামা'-র মানুষরা মূলত নিম্নবিত্ত, একেবারেই সর্বহারা শ্রেণীর। শরাফত মণ্ডল অবশ্য এ শ্রেণী থেকে উচ্চশ্রেণীতে ক্রমশ উঠে গেছে, কিন্তু তমিজের বাপ তমিজ কুলসম থেকে শুরু করে হুরমৎউল্লা কেরামত আলি ফুলজান পর্যন্ত প্রায় যাবতীয় নরনারী নিতান্তই শ্রমজীবী। প্রচণ্ড ক্ষুধা এ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে কোনও ধরণের বিকল্পন নির্মাণের সুযোগ দেয় না। তারা হয়ত কথায় কথায় মুখ-খিস্তি করে, ভাবনার মধ্যেও কখনও কখনও প্রশ্রয় পায় যৌনপ্রতিমা, কিন্তু তা কখনও জীবনচর্যায় তেমন আবিলতা সৃষ্টিতে সক্ষম হয় না। এমনকী কুলসমের সঙ্গে তমিজ যখন দেহসম্মিলনে লিপ্ত হয়, তখনও সম্পর্কের নিষিদ্ধতা সত্ত্বেও তেমন যৌনপরিবেশ রচিত হয় না। বরং তা হয়ে ওঠে যেন স্বপ্নেরই এক রকমফের, খোয়াবেরই বিস্তার—।

'পেটুক বাপের আধপেটা খাওয়া গতরের তপ নিতে তমিজ হাত রাখে কুলসমের পিঠে, তমিজের বাপের তপ পোয়াতে তাকে নিবিড় করে টেনে নেয় নিজের শরীরে। পায়ের দুটো ঘা থেকে তার আধপেটা গতরের গন্ধ নিতে কুলসম হাত বোলায় তমিজের

হাটুতে আর উরুতে। আর তমিজের বাপ অনেক দূর কাংলাহার বিলের চোরাবালির ভেতর থেকে তার লম্বাহাত বাড়িয়ে কিংবা হাতটাই লম্বা করে আলগোছে টেনে নেয় তমিজের তবন আর কুলসমের শাড়ি। গরহাজির মানুষটার গায়ের ওম পেতে আর গন্ধ শুঁকতে দুজনে ঢুকে পড়ে দুজনের ভেতর।' এ পরিবেশ অন্তত 'ডিজায়ার আন্ডার দ্য এলমস্' থেকে বহুদূরবর্তী।

॥ ৬ ॥

এক আলোচনায় ইলিয়াস একবার জানিয়েছেন 'খোয়াবনামা'-য় যে কবিতা বা গানগুলো রয়েছে তার প্রকৃতি দুধরণের। চেরাগ আলির পুঁথি থেকে পাওয়া প্রাচীন গান যা গলায় তুলে নিয়েছিল বৈকুণ্ঠ অথবা তার সহমর্মীর দল। তার সঙ্গে কেরামত আলির নির্মিত গান প্রচুর পার্থক্য রেখে উপন্যাসে এসেছে। এ পার্থক্য শুধু সময় ও পরিবেশের নয়, দু'টো আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনচর্চারও বটে। চেরাগ আলির গান আদতে চেরাগ আলিরই লেখা কিনা, নাকি কোনও নামহীন কবির কলম থেকে ছড়িয়ে গেছে লোকশরীরের গভীরে—এমন সংশয় অযৌক্তিক নয়। চেরাগ আলির গানের মধ্যে ওই প্রতিফলিত হয়েছে কিসসা বা পাঁচালীর মেজাজ—"চান্দ-কোলে জাগে গগন পাশে বিবি নিন্দে মগন/খোয়াবে কান্দিল বৌ না রাখ হদিস।/(ফকির) না রাখ হদিস॥/(হায়রে) সিথানে পড়িয়া থাকে কার্পাসের বালিস।/দুয়ারে দাঁড়য়ে ঘোড়া করিলো কুর্নিশ।/(ফকির) ঘোড়ায় চড়ি বাহিরিল নাহি উদ্দিশ॥" পঙক্তির পুনরাবৃত্তি এখানে যে শুধু মন্ত্রধর্মিন তৈরি করেছে তা নয়, ইতিহাস মন্থন করে এক স্বপ্নময় জগতকেও যেন তুলে এনেছে। এ ধ্বনী তাই হয়ে উঠেছে একটি জাতির গরিষ্ঠ অংশের জীবনচর্চার গান। তার কোনও নির্দিষ্ট রচয়িতা যেন নেই। কেরামতের গান সেই তুলনায় সমকালের শরীরে প্রোথিত—"চিন্তযুগের দৃষ্টি মোরা হিন্দু মোসলমান।/স্বাধীন পাবো আশা করি হতেছি বিরান॥/এই দেশ আমার এই দেশ তোমার গণ্ডগোল আর কইর‍্যা না।/লীগ কংগ্রেসের হিংসা কেন গেলো না॥/কেরামত আলিতে বলে জ্ঞাতিরি কাছে।/ভালো মন বোঝো ভাগ্যে কিবা তোমার আছে॥/দুধ বেচিয়া তামুক কিনি শরীলকৈলা ক্ষয়।/বুঝিয়া দেখহ মানুষ কেরামত কী কয়॥/স্বাধীন পাবো আশা করি সকল জাতে দেওয়ানা।/লীগ কংগ্রেসের হিংসা কেন গেলো না॥

কেরামতের গানের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে গণসংগীতের আদল। প্রসঙ্গত মনে করা যেতে পারে, কেরামত যখন রচনা করছে এসব গান তখন অবিভক্ত বাংলায় গণসংগীতের একটি নতুন জোয়ার এসেছিল। কেরামতের গান অবশ্য শিক্ষিত শহুরে গণসংগীত নয়। গ্রাম্য কবির সরল বিশ্বাসে গড়ে তোলা ছন্দোস্পন্দ। অবশ্য চেরাগ আলি ও কেরামত আলির নামাঙ্কিত গানগুলো স্বয়ং উপন্যাসকারেরই রচনা। ইলায়াসের কৃতিত্ব এখানেই যে তিনি দু'টো পৃথক সময় ও মেজাজের বৈশিষ্ট্য নির্ভুল প্রকাশ করতে পেরেছেন। তাদের স্বকীয়তাসহ।

এখানে সম্ভবত উল্লেখ করা যায় আরেকটি কথাও। 'খোয়াবনামা'-য় লক্ষ্য করা যায় একেকটি বাক্য, কখনও সরলভাবে, কখনওবা বাক্‌প্রতিমার মধ্য দিয়ে উপন্যাসটির শরীরের নানা স্থানে নিবেশিত হয়েছে, অনেকটা যেন ফ্লায়র মন্ত্রে। রুনার এ কৌশলটির মধ্য দিয়ে ইলিয়াস প্রকাশ করেছেন পাঁচালীর প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব যা আসলে প্রবহমান বাঙালি জীবনেরই প্রতিফলন।

খোয়াবনামা ঃ অন্য একটি পাঠ

কিন্নর রায়

কলকাতায় আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সঙ্গে দেখা করি ১৯৯৬ সালের ১৭ এপ্রিল। তখন ওঁর একটি পা কাটানো হয়ে গেছে। একটা গোটা বিকেল আর সন্ধের অনেকখানি তাঁর সঙ্গে কেটেছিল। সে সব তো এখন স্মৃতির বিষয়। একটি পা ইনডিয়ায় রেখে যাচ্ছি—এমনটি বলে হা হা করে হেসে উঠতে পেরেছিলেন আখতারুজ্জামান। তাঁর হাসি আমাদের শিরদাঁড়ায় বরফের ছুরি চেপে ধরছিল।

অনেক আগেই পড়া ছিল তাঁর বেশ কয়েকটি গল্প আর 'চিলেকোঠার সেপাই'। চিলেকোঠার সেপাইয়ের ঢাকা, হাডিড খিচিরা, ঢাকাই পিচিরা, আইয়ুব খান-বিরোধী মিছিল হয়ত গণ-অভ্যুত্থানও—সব মিলিয়ে একটা অন্যরকম ব্যাপার ছিল। ছিল যমুনা নদীর গভীর থেকে উঠে আসা ঘোড়ার ডাক। নদীতে বান এলে নাকি যমুনা নদীর গভীর থেকে সমবেত হেষারবে ঘোড়ারা জানান দেয়।

'চিলেকোঠার সেপাই'-য়ে পাঙাশ মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাওয়ার বিবরণ আছে। আছে পদ্মা আর ধলেশ্বরীর ইলিশের তফাত। আছে কিংস্টর্ক সিগারেট, পায়ার সুরুয়ার কথা। তার সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠা বাঙালি জাতীয়তাবাদের ছবি। 'চিলেকোঠার সেপাই' পড়তে পড়তে কাহিনীর ধরতাই আর তারপর তার পরম্পরা মেলাতে মেলাতে আবিষ্কার করে ফেলি অন্য এক ভূখণ্ডকে। সীমানার ওপারে আর এক রাষ্ট্রকে। যার মুখ ও বুকের ভাষা বাংলা। এই আবিষ্কার তেমন কষ্টকর ব্যাপার হয় না। কিন্তু 'খোয়াবনামা' একবার নয়, বার বার পড়েও তাকে প্রায় চর্বাপদের কোনও কবিতার মতোই গূঢ় রহস্যময় সংকেত অথবা লিপিতে লেখা প্রাচীন পুথি মনে হয়।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে পার্কসার্কাস ট্রাম ডিপোর পেছনে কংগ্রেস এগজিবিশন রোডের বাড়ির একতলায় ১৭ই এপ্রিল বিকেলে অনেক কথার ফাঁকে জিগ্যেস করেছিলাম, 'খোয়াবনামা' মানে কি?

উনি একটু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, স্বপ্নপুরাণ।

আমি অবাক হয়েছিলাম। কিন্তু 'খোয়াবনামা'-র পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বারে বারে পড়ে আবার ফিরে পড়ে তার নতুন নতুন অর্থ আবিষ্কার করতে করতে বিস্মিত হয়েছি শুধু। শুধুই বিস্মিত। এ উপন্যাস কি বাঙালি জাতীয়তার পূর্বাঙ্গরূপের কাহিনী? অথবা তার অকাল-মৃত্যুর বিবরণ? সংশয় থেকে গেছে। কিংবা এ হল আসলে খণ্ডিত বাঙালি জাতির স্বপ্নপুরাণ? ভেবে ভেবে বের করতে পারিনি। অনেক কিতুর সঙ্গে কত রকম খাদ্যের কথা পাই উপন্যাসে—১। ময়দার খোরমা, ২। চালগুড়ের পাতলা শিরনি, ৩। দই, গুড়, ৪। বোয়াল মাছের সালুন, ৫। গোরুর গোশত্, ৬। বোয়াল মাছের ঘাঁটি সালুন, ৭। হাতিবান্ধার গোপাল ঘোষের দই, ৮। মাছ-বেগুনের চচ্চড়ি, ৯। পায়েস, ১০। লিপটনের চা, ১১। জিলিপি, ঘিয়ে ভাজা জিলিপি, ১২। মিষ্টি আলু পোড়া, আলু পোড়া, ১৩। চালের আটার রুটি, ১৪। ভাপা পিঠা, ১৫। ঘুলানা ধানের চাউল, ১৬। দুধ পিঠা, ১৭। মুড়ি, ১৮। নকুলদানা, ১৯। চিতই পিঠা, ২০। বুটের ডাল, ২১। এলোকেশী বেগুন, ২২। তেল পিঠা, ২৩। বাতাসা, ২৪। লাউ দিয়ে রাঁধা শলুক দেওয়া শোল মাছ, ২৫। রসগোল্লা দিয়ে চিঁড়ে খাওয়া, ২৬। খেসারির ডাল, ২৭। খলসে মাছ আর বেশি মরিচ দিয়ে রাঁধা বেগুন চচ্চড়ি। ২৮। চিরল চিরল করে কাটা এলোকেশী বেগুনের সঙ্গে খুব ঝাল দিয়ে রাঁধা চচ্চড়ি, মাসকলাইয়ের ডাল আর নতুন আলুর ভর্তা।——এই সব খাদ্যের বর্ণনা এসেছে নানা সময়ে, বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে—হয়ত বা সেই ঘটনা বা মানুষটাকে জীবন্ত করার জন্যেই। কিন্তি টুপি, জিরাটুপি (কিন্তি টুপির কথা 'চিলেকোঠার সেপাই'-তেও পাই), রফাদানি, হানাফি মোহাম্মদি জামাতের কথা। ইসলাম ধর্মের ঘনিষ্ঠ নানা বিবরণ, কিন্তু কোথাও তথ্য ভারাক্রান্ত মনে হয় না।

কত সহজ করে সামাজিক ও ধর্মীয় বিন্যাসের বর্ণনা। যা পড়তে পড়তে সামনে একটা পরিষ্কার ছবি আসে বিভক্ত পূর্ব বাংলার।

এই স্বপ্নপুরাণ কি তমিজের? নাকি হুরমত্তুল্লা, অথবা তমিজের বাপের? নাকি এই খোয়াবনামা আসলে মজনুশাহ-ভবানী পাঠকের, অথবা চেরাগ আলির কিংবা কেরামত অথবা কুলসুমের? আব্বা কাহিনী একটা আছে। কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট বয়নে বা পরিণতির দিকে সে কাহিনী কখনই এগোয়নি। হয়ত বা এগোতে দিতে চাননিন লেখক। বারে বারে লোককথা ফিরে আসে।

'এসব সেই কোন কালের কথা, কত কছর আগে, সে হিসাব করা তমিজের সাধ্যের বাইরে। আর দেখো, আজকাল মুনসিকে একটু দেখার লালচে সেই তমিজের বাপ রাতবিরেতে ঘুমের মধ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিলের ধারে এসে হাজির হয় একই রাস্তা ধরে। তা মুনসির কোনো আলামত দেখতে হলে রাত্রিবেলাই হলো ঠিক সময়।তমিজের বাপের হাতের ঢেউয়ে ঢেউয়ে মেঘের গাঢ় ছাই রঙ হালকা ছাই হয়ে আসছে। এইবার বিলের পানিতে ভেড়ার পাল হাবুডুবু খেতে খেতে সাঁতার কাটবে। ছাইরঙ ঝেড়ে ফেলে মেঘ সম্পূর্ণ হাওয়া হয়ে যাবে।____

'তা সে কি আজকের কথা? সেই কোন আমলে এক বিকালবেলা বেলা ডোবার আগে আগে মজনু শাহের হাজার হাজার বেগুমার ফকিরদের সঙ্গে করতোয়ার দিকে ছোটার সময় গোরাদের সর্দার টেলরের বন্দুকের গুলিতে মরে সে পড়ে গিয়েছিলো সাদা ঘোড়া থেকে। সারা অঙ্গে তীর বেঁধা সেই ঘোড়া উড়ে গেল কোথায় কে জানে, আর এখানে এই কাদায় পড়ে থাকতে থাকতে মুনসির লাশ জ্বলে উঠলো লাল আগুন, নীল আগুন, ঝলো আগুনের শিখায়। তিন দিন তর জুলন্ত শরীর প্রেঁয়ার সাহস কারো হলো না, কাফন দাফন সবই বাকি রইলো দেখে মুনসি কী আর করে, গুলিতে ফাঁক-করা-গলা গিয়ে সোজা চড়ে বসলো পাকুড়গাছের মাথায়। সেই থেকে মুনসি গিয়ে আগুনের জীব।-——'কিন্তু সব সময় কি এমন হয়? না কোনো কোনো দিন টানা কোনো আওয়াজে তমিজের বাপের ঘুম একদম ভেঙে গিয়েছে। অনেক দূর থেকে, পাকুড়গাছে ছাড়া আর কোথাকে হবে ভাঙা ভাঙা গলায় টেন টেন কে যেন কয় :—"সিগাঁয়ে পাকুড়গাছ মুনসির বসতি।/তলায় গজার মাছ অতি হিংস্র মতি॥/গভীর নিশিতকালে মুনসির আদেশে।/বিলের গজার মাছ রূপ লয় মেষে॥"

'এর পরেও অনেক কথা শোনা যায়, কিন্তু তমিজের বাপ দারুণভাবে চমকে ওঠায় সেগুলো চলে যায় তার কানের এখতিয়ারের বাইরে, ফলে মাথার চুলকানি তুলেই সে সব হারিয়ে যায়।____' মিথ তো এটুকুই। কিংবা শুধু এটুকুই নয় আসলে। বারে বারে যা উঠে আসে, ফিরে ফিরে এসে যায়—যেমনটি কাৎলাহার বিলের সেই প্রাচীন গজার অথবা বাঘাড় মাছটি। আর পাঠকের মাথার ঘিলুতে একবার টুসকি মেরে সব কিছু নাড়িয়ে চাড়িয়ে আবার ডুব দেয় কোন অতলে।

'শাপলার ছেঁড়খোড় পাপড়ি দোমড়ানো টুকরো' কি আসলে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন? কিংবা এই আখ্যানের ২৫৭-৫৮ পাতায় যেখানে তমিজের বাপের মৃত্যু হয় চোরাবালির ফাঁদে। সেই মৃত্যু কি আসলে বাঙালি জাতির অস্তিত্ববোধের চোরাবালিতে আটকে পড়া? যে তমিজের বাপ শুধুই মুনসির স্বপ্ন দেখে। তার স্বপ্নের ভেড়ারা কাৎলাহার বিলের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়—তার মৃত্যু চোরাবালির ফাঁদে। মনে রাখতে হবে বড় বাঘাড় মাছের বর্ণনা যেমন আছে 'খোয়াবনামা'-য়, তেমনই তমিজের বাপ আসলে বাঘাড় মাঝির নাতি, তার তো এটাই পরিচয়। এখানেও লেখক শিল্পের অন্য এক খেলা খেলেন।

উত্তর থেকে উড়ে আসা আগুন কি আসলে তে-ভাগার স্বপ্ন? 'লাঙল যার জমি তার'—এই স্লোগানের শেষ ছিটেফোঁটা? যে আগুন পুড়িয়ে দেয় সেই মহা-পাকুড় গাছ আর মুনসির আরস!

তমিজ তো তে-ভাগার ভেতর কেমন করে যেন ডুবেই যায়।

মহা সময়ের চোরা স্রোত তাকে টেনে নিল কি? তার ফুলজান, কুলসুম কোথায় কোন দূরে পড়ে থাকে।

এই আখ্যানে সেই সময়কার ভারত ভাগ হব হব সময়ের জিনিসপত্রের দামও বেশ সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। যা যে কোনও বড় মাপের লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

১। রেল স্টেশনের কাছে পুরো তিন আনা পয়সা খরচ করে ভাত আর গোরুর গোশত খেয়ে স্টেশনের পাকা মেঝেতে শুয়েই তমিজের চোখ জড়িয়ে আসে।

২। যুদ্ধের জন্যে সব জিনিসের দাম বাড়ছে। টাউনে তমিজ নিজে দেখে এসেছে গরুর গোশতের সের উঠেছে চার আনায়। দর না উঠলে সের খানেক গোশত সে নিয়ে আসতো। এই যে বাজারে সাদা কেরোসিন পাওয়া যাচ্ছে না, মণ্ডলরা হ্যারিকেন জ্বালাতে টাউন থেকে চড়া দামে সাদা কেরোসিন আনে—এ সবই যুদ্ধের জন্যে।

৩। যুদ্ধের জন্যে নাকি সাদা চিনিও পাওয়া যায় না, তরা লাল চিনির চা খায়, একেক খোরা দুই পয়সা।

মুসলিম লিগ বিষয়ে এই আখ্যানে রয়েছে অনেক লাইন। তারমধ্যে কয়েকটি—১। 'তমিজের দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি খানিকটা এসে বর্তায় কাদেরের ঠোঁটে, সেই তেজে তার জিভ বলকায়ঃ' হিন্দু জমিদার আর হিন্দু মহাজনের হাত থেকে বাঁচার জন্যেই তো লীগের পাকিস্তানের লড়াই। হিন্দু মহাজন মুসলমান চাষার রক্ত চুষে শেষ করে ফেললো। আর আপনি এখন এই ফ্রেঞ্চটাকে পাঠাকেন সেই মহাজনের বাড়ি? নাঃ, ওকে জমি বর্গা দিয়ে কাজ নাই।'(পৃঃ-৪৬) ২। 'মুসলমানদের বর্তমান হাল ব্যাখ্যা করার ভার তার হাত থেকে স্বেচ্ছায় তুলে নেয় টাউনের মাঝবয়েসি নেতা ডাক্তার আমিরুদ্দিন আখন্দ। 'দেখেন না, শিক্ষা-দীক্ষা, স্কুল-কলেজ, কোর্ট-কাচারি, অফিস-আদালত, বিজনেস সব হিন্দুদের হাতে। আর জমিদার তো নাইনটি পার্সেন্ট হিন্দু। লোকটা মনে হয় আজ সকালেই হিরার্সেল দিয়ে এসেছে, কিংবা নিচের চেয়ারে বসে রোজ বলতে বলতে তার মুখস্থ, 'মোসলমান হলো হিন্দু জমিদারের প্রজা, হিন্দু উকিলের মক্কেল, হিন্দু মহাজনের খাতক, হিন্দু মাস্টারের স্টুডেন্ট, হিন্দু ডাক্তারের পেশেন্ট।'(পৃঃ-৯৮) ৩। 'কিন্তু ডাক্তারের এই কথায় কাদেরের সায় নেই, সে বরং প্রতিবাদ করে, 'পাকিস্তানে জমিদারি সিস্টেম উচ্ছেদ করা হবে। বিনা খেসারতে জমিদারি উচ্ছেদ করা হবে। পাকিস্তানে নিয়ম হবে জমি তার লাঙল যার। পাকিস্তানের আমিরে গরিবে ফারাক থাকবে না।'(পৃঃ-৯৯) ৪। 'ছোটো মিয়াকে জুতমতো ধরা গেছে এমন ভাব করে ডাক্তার, ফেমিনের সময় বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট চাল চাইলো বিহার গভর্ণমেন্টের কাছে, হিন্দু ডমিনেটেড কংগ্রেস গভর্ণমেন্ট না করে দিলো। এখানকার হিন্দু লিডাররা পুরো সায় দেলো বিহারকে। ওয়ারের নাম করে বৃটিশ চাল গায়েব করে দিলো। বদনাম হলো মুসলিম লীগের।'(পৃঃ-৯৯)

আবার মুসলিম লিগের এক ধরণের নেতৃত্বের ছবিও আঁকা হয়, খুব সুন্দরভাবে—'এবার হাজেরানে মজলিশের সামনে দাঁড়ায় খান বাহাদুর সৈয়দ আহমদ আলি। কয়েক পুরুষের জমিদারি, পিতামহের মন্ত্রিত্ব ও এক পুরুষ গ্যাপ দিয়া নিজের উপমন্ত্রিত্ব এবং তিন পুরুষ ধরে বিয়ে-করা ও না-করা ইংরেজ ও আংলো ইনডিয়ান মেমসাহাবদের সঙ্গে প্রেম ও যৌবন সঙ্গম প্রভৃতির কারণে খাঁটি সায়েবদের সাহচর্যের ফলে খান বাহাদুরের গলার ভেতর থেকে বেরুতে বেরুতে বাঙলা ভাষা অনেকটাই দুমড়ে যায়। বাঁকা বাঙলা, ভাঙা উর্দু ও সায়েবদের চেয়েও সায়েবি ইংরেজির মিশেলে মুসলমান কৃষকের ওপর হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের জুলুমের কথা বলতে বলতে তার গলা ভারাক্রান্ত হয়, আট মিনিটের বেশি বলা তার পক্ষে আর সম্ভব হয় না। এছাড়াও দলের একটি কাজে তাকে এক্ষুনি টাউনে যেতে হবে। সুতরাং দুঃখিত হয়ে খান বাহাদুর সভাঙ্গন ত্যাগ করার এজাজত চায় দুই হাত জোড় করে। হ্যাজাকের আলোয় ধবধবে ফর্সা হাতজোড়া তার লালচে দেখায় এবং হাতের রঙ ও বিনয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধতা চলে যায় চরম পর্যায়ে। করজোড়ে তার মাফ চাওয়ায় অভিভূত কোনও কোনও বুড়া শ্রোতা বুকে ঠাণ্ডা লাগানোর ঝুঁকি নিয়েও গায়ের কাঁথা টেনে নিজেদের ছানি-পড়বো-পড়বো-চোখের কোণ মোছে।' (পৃঃ-১৬০)

তবু কাঁচাপাকা দাড়িঅলা, ধপধপে সাদা কাপড়পরা মানুষটি বার বার আসে আমাদের সামনে। তার গলায় ঝোলানো লোহার শেকল। বাতাসে লোবানের গন্ধ ভাসে। ঘ্রাণ তীব্রতর হয়। আমাদের মতো পাঠকের পড়ার ভেতর দিয়ে স্বপ্নে যেমন, অসুস্থ ছেলের মাথায় জল ন্যাকড়া দেয়া হামিদার স্বপ্নে, হয়ত বা জাগরণেও সে আসে। তেমনই সাদা তব্বন,কাঁচাপাকা নুরানি দাড়ি লোবানের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। ধান, মাটি, মাছ, জল, নদী, বিল, শোলক, পুরাণ, লোককথা, স্বপ্ন, মৃত্যু, জীবন, যৌনতা, ধর্ম, রাজনীতি, বেঁচে থাকা—সব মিলিয়ে খোয়াবনামা হয়ে ওঠে বাঙালির স্বপ্ন-জাগরণের স্বপ্ন-নামা। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ১৯৯৬-এর ১৭ এপ্রিল বারে বারে বলেছিলেন, তাঁর করতোয়া নদীতে স্নানের কথা, মহাস্নানগড় অভিযানের কথা, ভবানী পাঠক, মজনু শাহ ফকির, বাঙালির বিদ্রোহ, বাঙালি জাতীয়তা, সবই তাঁর কথায় নানাভাবে উঠে আসছিল। 'খোয়াবনামা' বেশ কয়েকবার আগাপাশতলা পড়ে, উল্টেপাল্টে,এটুকুই মনে হয়েছে এ লেখার সমালোচনা বড় কঠিন কার্য। সেই কঠিন টুকু করতে কম হ্যাপা পোয়াতে হয় নি। তবু বাঙালির স্বপ্ন-জাগরণ অথবা স্বপ্ন দর্শনের এই উপাখ্যান তো আমাদের অন্যভুবনে নিয়ে যায়ই। যেখানে কাহিনী অথবা স্লোগান সর্বস্ব বাংলা উপন্যাস নেই। আমরা তো সেই নেই-ভুবনকেই দেখি, বারে বারে। যতবার পারি। যে-ভাবে পারি।

❑ 'খোয়াবনামা'/আখতারুজ্জামান ইলিয়াস/নয়া উদ্যোগ। কলকাতা।/১৫০০০।

সফলতার শেষ কথা

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

আমি মনে করি, সব মানুষই একশো বছর আয়ু নিয়ে জন্মায়। তারপর জীবনের রণক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে যে যেমন পারে, যে যেমন চায়, নিজের আয়ু ক্ষয় করে নিতে পারে। নেয়। তাই আমরা মানুষকে নানা বয়সে মৃত্যুবরণ করতে দেখি। লেখক সাংবাদিক সন্তোষকুমার ঘোষ ১৯২০ সালে জন্মগ্রহণ করে এবং ১৯৮৫ সালে মৃত্যুবরণ করে প্রায় পঁয়ষট্টি বছরের আয়ু পেয়েছিলেন।

১৯৮৪ সালের পুজোর ছুটিতে তিনি সপরিবার উত্তরভারতে বেড়াতে যান। বেড়াবার আনন্দ বারবারই ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল গলার মধ্যে একটা খচখচ অস্বস্তিতে। মনে হচ্ছিল, মাছের কাঁটা ফুটে আছে বাড়ি ফিরে এসে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে গিয়ে ধরা পড়ে তাঁর ক্যানসার হয়েছে।

তখন তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার যুক্ত সম্পাদক। বস্তুত দৈনিক পত্রিকাটির সম্পাদকই। মালিকানায় অংশ নেই, বেতনভোগী, কিন্তু ক্ষমতায় ও দায়িত্বে যাকে বলে সর্বেসর্বা। ইতিমধ্যে তিনি পত্রিকাটির প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন, পাশাপাশি ভোল ফিরিয়ে দিয়েছেন বাংলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও।

এমন একজন প্রতিভাবান উচ্চপদস্থ কর্মীর অসুস্থতায় উপযুক্ত চিকিৎসার সবরকম ব্যবস্থা যে হয়েছিল, প্রতিষ্ঠানই করেছিল উদারভাবে, তাতে আমরা অবাক হইনি। কোনও ত্রুটিই তাঁরা ঘটতে দেননি। রাজরোগের রাজকীয় চিকিৎসায় প্রভূত অর্থব্যয় হয়েছে। কিন্তু চারমাসের বেশি বাঁচানো যায়নি রুগিকে। মাঝে মাঝে ভাল হয়ে ওঠার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল, তখন রুগির মনে হচ্ছিল কণ্ঠস্বর-বঞ্চিত জীবন অভিপ্রেত কিনা। কিন্তু সে ছিল কর্কট কৃচ্ছ্রীর লুকোচুরি খেলা। দ্বিগুণ পরাক্রমে জেগে ওঠার আগে কিছুকাল ঘুমিয়ে থাকা। মনে আশা জাগানো। অবশেষে অপরাজেয় এই মানুষটি রোগের কাছে পরাস্ত হলেন। ১৯৮৫ সালের ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি।

আমার ডাক্তার বন্ধু শান্তনুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কেন এমন হয়? কেন ঠিক সময়ে ক্যানসার রোগ ধরা পড়ে না? রুগি আপনার সামনে বসে সরলমনে ধ্রু কর্ব আলজিভ দেখানোর সময় ঠেঁ ফেলে আপনি কী বর্ব বোঝেন। এ ফ্যাজেন্সইটিস নয়, টনসিলাইটিস নয়, আক্কেল দাঁত ওঠার ব্যথা নয়, এ হল ক্যানসার?

শান্তনু বলে, গ্রোথ। দেখতে পাই, জায়গাটায় কোষ গজিয়ে উঠেছে। প্রথম দিকে পেইনলেস থাকে। যখন পেইন হতে শুরু করে, তখন সে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। তাই সারানো হয়ে যায় দুঃসাধ্য। বায়াপসি করাতে হয়। সে কতখানি ছড়িয়েছে জানার জন্যে। আক্রান্ত জায়গাটা কেটে ফেলে দিয়ে, তারপর নানা প্রক্রিয়ায় পুড়িয়ে আমরা ক্যানসারকে নিরস্ত করার চেষ্টা করি। আমরা যাকে সাধারণ ভাষায় অসুখ বলি, এ তা নয়, এ হল শরীরযন্ত্রের সঙ্গতি বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্র।

আর সব সক্রিয় প্রতিষ্ঠানের মতো শরীরেরও নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থা তাকে সতত সঞ্চরমান আততায়ীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। বয়স বাড়লে তা দুর্বল হয়। তখন শরীরের ধারককে অনিয়মিত ও পীড়াদায়ক জীবযাপন থেকে সরে আসতে হয়—একথা সবাই জানে। ক্যানসার কেন হয়। এর উত্তরে অন্টারিও, কানাডার বিশেষজ্ঞ বাঙালি গবেষক ডাক্তার পীযূষ লালা বলেছেন, বংশগতি, ধূমপান, পরিবেশ দূষণ, এসব তো আছেই, আর একটি বড় কারণ হল সূক্ষ্ম মানসিক পীড়ন বা স্ট্রেস। এ থেকে বাঁচতে মনকে শান্ত রাখতে হয়, ছোটখাটো নিত্য উৎপাত অগ্রাহ্য করতে শিখতে হয় আর এমন কাজে লিপ্ত থাকতে নেই যার মধ্যে অযথা উত্তেজনা আর হিংস্রতা আছে। যাতে বিশ্রামের সময়ও মনকে আলগা রাখা যায় না, ঘুম গভীর হয় না। যার মধ্যে কোনও মুক্ত আনন্দ নেই। তাঁর সাম্প্রতিক গবেষণাপত্রে ডাক্তার লালা জানাচ্ছেন যে, আমাদের মস্তিষ্কের ভেতরে একটি অতিক্ষুদ্র গ্রন্থি আছে। তা থেকে 'মেলাটোনিন' নামের হরমোন নিঃসৃত হয়। মানুষ যখন শান্ত বা প্রসন্ন বা ঘুমন্ত থাকে তখন। এর নিঃসরণ বিঘ্নিত বা বন্ধ হলে ক্যানসার হওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে পারে। বিশৃংখল পরিবারে চোর ঢোকার মতো।

সন্তোষকুমার ঘোষের ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করার আগে এই খবরগুলি দরকার। কার্যকারণ ব্যতীত পৃথিবীতে কিছুই ঘটে না।

তিনি যত বড় সাংবাদিকই হোন, আমরা যারা সেই ১৯৬০-৭০ সালে যুবক ছিলাম তরা তাঁকে একজন দুর্ধর্ষ গল্পকার হিসাবে সম্মান করেছি। সর্বসাকুল্যে হয়ত দেড়শোটি গল্প লিখেছেন। আর তিরিশ বছর বয়সে 'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসটি—এই দিয়েই তাঁকে আমরা চিনি। ওই তাঁর মৃত্যুর পর যখন দাবি করা হচ্ছিল, একজন দিকপাল সাংবাদিক হিসাবে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন, তখন আমিই প্রতিবাদ করেছিলাম। বলেছিলাম, সাংবাদিকতা একটা বৃত্তি। অর্থের বিনিময়ে লোকে আর সব বৃত্তির মতো, ডাক্তারি বা ব্যারিস্টারি মতো, এই কাজে নিয়োজিত হয়। গণমাধ্যমের সেবা করে। যেমন যেমন দক্ষতা, সাফল্য দেখায়, তেমন সুনাম ও অর্থ উপার্জন করে। জীবিতকালে তুখোড় সাংবাদিকের যে-আভা আমরা দেখি, তা ক্ষণস্থায়ী। চিরস্মরণীয় হলে সন্তোষকুমার তাঁর সাহিত্য রচনার জন্য হবেন। সাংবাদিকতার জন্য নয়। পরে দেখলাম, প্রেমেন্দ্র মিত্রও এই কথাই বলেছেন।

শিল্প সাহিত্যের স্তিমিত জনপ্রিয়তা থেকে ক্রমে পূর্ণকালীন

সাংবাদিকতা ও দৈনিক পত্রিকা সম্পাদনার উত্তেজক কাজে সরে এসেছিলেন সন্তোষকুমার ঘোষ। তখন তাঁর দাপট আমরা দেখেছি। মানুষের স্বভাব, ক্ষমতা হাতে পেলে সে তার অপব্যবহার করবেই। তিনিও করেছেন। সুযোগ পেলেই সাহিত্যিক সহকর্মীদের হেনস্থা করেছেন। শুনতে পাই, তাঁর অনুমোদন না থাকায় মুখচোরা মানুষ নরেন্দ্রনাথ মিত্র কর্মক্ষেত্রে প্রমোশন থেকে বঞ্চিত হয়েছেন; প্রভূত খ্যাতি-প্রতিপত্তি পাওয়া সত্ত্বেও সমরেশ বসুর বিদেশ যাওয়া হয়নি তাঁর প্রতিকূলতায়। এক সময় সুনীল (গঙ্গোপাধ্যায়) তাঁর লৌহ আলিঙ্গন থেকে পালিয়ে বেঁচেছে। তাঁর অকথ্য গালিগালাজ অন্য চাটুকারদের মতো সহ্য করতে না পারার ফলে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের চাকরি যায়। তাঁর সমর্থন ছাড়া কোনও রবীন্দ্র-সংগীত গায়ক/গায়িকা প্রতিষ্ঠা পেতেন না। দেবব্রত বিশ্বাসকেও তাঁর উষ্মা সহ্য করতে হয়েছে। শেষমেশ রবীন্দ্রবিশারদ হয়ে নানা সভায় বক্তৃতা দিতে পেরে, তাঁর অহংকৃত মনে কিছু তৃপ্তি এসে থাকবে। তা ছাড়া উচ্চপদের বেতন তো ছিলই। আমি স্বকর্ণে শুনেছি, তিনি আর একজনকে বলছেন, 'আমি রাষ্ট্রপতির চেয়ে বেশি মাইনে পাই।'

মৃত্যুর কাছাকাছি সময়ে এসে তাঁর স্বেচ্ছাচারী স্বভাবের কিছু পরিবর্তন হয়েছিল, আমরা লক্ষ্য করি। ১৯৮৩ সালে দেখি তিনি অকপটে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের (তখন প্রয়াত) গল্প বলার জাদুশক্তি বিষয়ে প্রশংসা করছেন। বলছেন, তিনি মঁপাসাঁ, ও-হেনরি, শেখভ কি রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ আসনে। আমাদের কারুর একটা ভাল কবিতা প্রকাশিত হলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছ থেকে টেলিফোন সংবর্ধনা পাওয়া যেত। শীর্ষে দীর্ঘকাল অবস্থান করার ফলে তাঁর মনে কিঞ্চিৎ করুণার ভাব এসেছিল।

বারো বছর পার হয়ে গেল সন্তোষকুমার ঘোষের মৃত্যু হয়েছে। এখনও প্রেসক্লাবে তাঁর আবক্ষ মর্মরমূর্তি তো স্থাপিত হয়নি। কিন্তু তাঁর গল্পগুলির নতুন সংস্করণ বেরিয়েছে—তিন খণ্ডে। বর্তমান প্রজন্ম তাঁর রচনায় ভাবাবেগবর্জিত পর্যবেক্ষণ ও শৈলির মৌলিকতা উপভোগ করে। বাংলা সাহিত্যে যা বিরল।

'চলার পথে' কিন্তু অন্য ধরনের বই।

বইটা খুলে প্রথমেই মনে হয়—এ যেন একটা ঢ্রউশ 'সহজ পাঠ'। বড় বড় দানায় ছাপা, ফাঁক-ফাঁক লাইন। দশ দশটা পাতভরা ছবি। খানিকটা ডায়েরি। একগুচ্ছ চিঠি, আত্মীয়-বন্ধুদের উদ্বিগ্ন চিঠির উত্তরে লেখা। আর, একটা গল্প। সেই 'যাত্রাভঙ্গ' গল্পটা। রোগশয্যায় বসে একটু একটু করে বুনেছিলেন। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়ানো একজন বয়স্ক মানুষের প্রেম ও বিষাদ নিয়ে লেখা। মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই দেশ পত্রিকায় বেরিয়েছিল। তখন পড়ে আমরা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছি। লক্ষ্য করছি সব লেখার রচনাকালই তাঁর জীবনের শেষ চার মাসের। ডায়েরিটাও আগে পড়েছি। বারো বছরের দূরত্ব থেকে আবার পড়লাম। ১১১ পৃষ্ঠায় পরিব্যাপ্ত এই রচনা ৫০ পৃষ্ঠায় আঁটানো যেত কিন্তু তা হলে বিকাশ ভট্টাচার্যের ছবিগুলির মূল্য কমে যেত অবশ্যই।

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অনেক মানুষ, বেশির ভাগ মানুষই, থতমত খেয়ে যায়। যারা বিশেষ সময় পায় না ভাবনা চিন্তা করার, তাদের কথা আলাদা। এক্ষেত্রে লেখক চার মাস সময় পেয়েছিলেন তাঁর জীবনদর্শনকে ঝালিয়ে পুনর্বিন্যস্ত করতে। তাঁর সাহিত্য রচনার প্রধান গুণ ছিল নিরাবেগ ও প্রখর নৈর্ব্যক্তিকতা, দৃশ্যের অন্তর্গত রূঢ় সত্যের দিকে যাবার নিষ্ঠা। সমস্ত প্রতিবন্ধ কাটিয়ে, মোহ ছিঁড়ে, মানুষের বেঁচে থাকার ইচ্ছার প্রতি জোর। আর মিতকথন। কাটা-কাটা বাক্য আর সংলাপ। অভূতপূর্ব উপমার আকস্মিকতা। বাসের মুহূর্তাসও আছে অনেক লেখায়। যে হাসির বক্রতা তাঁর মুখেও ছিল। সাংবাদিকের সফলতা তাঁর তৎপরতায়, তাঁর বাক্চাতুর্যে। জনপ্রিয়তায় জয়লাভ করা তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। কোনও শাশ্বত মূল্যবোধে তাঁর আস্থা নেই।

ছোটখাটো মানুষ ছিলেন সন্তোষকুমার ঘোষ। গদি আর মোটা হাতলে মোড়া তাঁর সম্পাদকীয় আসনের এক কোণ ঘেঁষে বসতেন। তাতে চেয়ারটা একদিকে, ডানদিকে, হেলে থাকত। সামনে একটা বিশাল টেবিল। বাতানুকূল আপিসঘর। টেবিলের নিচে কলিং বেলের বোতাম। বাইরে সতত সন্ত্রস্ত প্রহরী। ডানদিকের ড্রয়ারে সস্তবত পানীয়ের সরঞ্জাম থাকত। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হাতে লিখতেন না সুবোধ ঘোষের মতো। ডিকটেশন দিতেন। বেল দিয়ে কোনও অধস্তন সহকর্মীকে ডেকে পাঠালে সে ঘরে প্রবেশ করে দাঁড়িয়ে থাকত। বসতে না বললে বসত না। ঢ্যাঙা মানুষকে অপদস্থ করে আনন্দ পেতেন।

এই ডায়েরির পাতায় পাতায় দেখছি তাঁর আহত অভিমান খুব স্পষ্ট। আর আসন্ন মৃত্যুতে তিনি বিচলিত নন। কেবল, বড় বেশি দেরি হচ্ছে বলে বেদনাবোধ। প্রশ্ন করছেন, এত যন্ত্রণা কেন? অতীত জীবনে স্বেচ্ছাচার সম্পর্কে অনুশোচনাও আছে। ৩০।১০।৮৪ তারিখে প্রথম অংশে লিখছেন, "সবাইকে ক্ষমা করে যাচ্ছি। বিনিময়ে সবার ক্ষমা যেন পাই। আমার জীবনভর এরই বড় অভাব ছিল।" তখন তিনি যশলোক হাসপাতালে। ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ৯।১১।৮৪ তারিখের নোটেও সেই ক্ষমা পাওয়া, ক্ষমা চাওয়ার কথা। প্রথম দিকে তাঁকে রে দেওয়া হয়েছিল। নিজের বিছানায় ফিরে এসে লিখছেন, "সুনীল আয়ুর অংশ দিয়ে দিয়েছে, লিখেছে। তা কি দেওয়া যায়! দিলেও আমার নিতে বয়ে গেছে।" এই অংশটি পড়ে আমার হাসি পেল। সত্যি, সুনীল (গঙ্গোপাধ্যায়) ভারি রোম্যান্টিক। তবে আয়ুর অংশ না দিয়ে যদি রয়্যালটির অংশ তাঁকে দিতে চাইত তা হলে বেশি উপকার হত অসুস্থ মানুষটার। কিন্তু তা-ও সন্তোষকুমার প্রত্যাখ্যান করতেন। অমন উদার মনিব থাকতে আর কারুর কাছে হাত পাতবেন কেন?

আয়ু ও সফলতা বিষয়ে আর এক লিখন : ৩১।১০।৮৪ সকাল ৭-৪৫। ক্রি ক্যাণ্ডি হাসপাতাল : রবীন্দ্রনাথ ষ্টেষট্টি থেকে আশি, এই বয়েস অবধি অপেক্ষা করেছেন। তবে তাঁর চূড়ান্ত প্রাপ্তি দেখে গেছেন। "আমি অত সময় পাব না। পেতে চাইও না। এত দিন এত লিখেও যদি কিছু না হয়ে থাকে। আর গুচ্ছের লিখলেই বা কী হবে?"

"পাব না"—এই কথায় হতশ্বা বোঝায়। কিন্তু পরেই যখন বলেন "চাইও না।" তখন মনে হয়, আসলে চাই। বাসনা আছে। সম্ভাবনা নেই বলে তা ত্যাগ করছেন। এরকম মেয়েলি উক্তির আরও দৃষ্টান্ত আছে।

৭।২।৮৫ তারিখে লেখা একটি চিঠি শুরু হচ্ছে এইভাবেঃ "কত মেজাজ দেখিয়েছি। গালমন্দ করেছি__" এই লিখিত স্বীকৃতি আমার আগের অনুভাবনার সমর্থক। তাঁর এই স্বভাব পেশাদার ম্যানেজার সুলভ ছিল না। ফিউডাল। তাই ক্রোধ সংবরণ করতে না পারার ফলে মানসিক চাপ নিশ্চয় বেড়ে থাকত। তারপর, দিনে আশি-নব্বুইটা সিগারেট খেতেন—পরে আবার জর্দা-পান, নিতি দুটো টিনটে করে বক্তৃতা। এই মানুষের ক্যানসার হবে না তো কার হবে? আমার এক-এক সময় মনে হয়। তাঁর জীবিকাসত্ত্ব অস্থিরতা এই রোগের আসল কারণ। নইলে আপনারা আর একজনকে পাশাপাশি মিলিয়ে দেখুন। এম জে আকবর। ওই একই প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি সাংবাদিকতার ভেল ফিরিয়ে দেননি? প্রথমে একটি সাপ্তাহিক, পরে একেবারে নতুন মেজাজের একটি দৈনিককে কোথায় তুলে দিয়ে গেছেন। তারপর প্রতিষ্ঠান ছেড়ে দিয়ে রাজনীতি করেছেন। সেখানে হাত পুড়িয়ে এসে আবার একটা নতুন দৈনিক পত্রিকা নিয়ে লেগে আছেন। কই, তাঁর তো ক্যানসার হয়নি। কারণ তিনি পেশাদার ম্যানেজার। পেশাদার ম্যানেজার হল সেই ব্যক্তি, সৈন্যাধ্যক্ষর মতো যে সন্ধেবেলা হুকুম দিয়ে যায়। রাত্রে ব্রিজ বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে হবে তাতে নিজেদের সৈন্য কিছু মরে মরুক, শত্রুপক্ষ এগোতে পারবে না; তারপর শিবিরে ফিরে গিয়ে ডিনার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে নিশ্চিন্তে। নিশ্চিন্ত কেন, না সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরপর যা ঘটবে দেখে আবার পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে। তার মনে দ্বিধা নেই, তার মাথা ঠাণ্ডা, তার মনে অনুশোচনার দংশনও নেই।

সন্তোষকুমার ঘোষের চরিত্রে পেশাদারি গুণ ছিল না। কাজ নিয়ে তাঁর গর্ববোধ ছিল। বিরাট কিছু করছেন এই ভাবনা থেকে আত্মতুষ্টি পেয়েছেন। মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন। পরে নিশ্চয় ভেবেছেন—"এখানে, এই স্টেশনে আমার তো আসার কথা ছিল না"। এসে কি ভুল করেছি?

তাঁর ডায়েরি আর চিঠিপত্রে কর্তৃপক্ষের অকৃপণ সহায়তা পাওয়ায় কৃতজ্ঞতার ছড়াছড়ি। কেন? তিনি কি এই দাক্ষিণ্যের যোগ্য পাত্র ছিলেন না? না কি, জানতেন এই লেখাগুলি একদিন ছাপা হবে। কর্তৃপক্ষকে খুশি করবে? এ-ও পেশাদারি মনোভাব নয়।

আমার এ-ও মনে হয়, পশ্চিমি আধুনিকতায় দীক্ষিত এই মানুষটির নিঃসঙ্গতা, নিস্পৃহতা, নিরাসক্তি, তিক্ততা—এই সব বোধ, যা তাঁর জীবনযাপনে ও সাহিত্যকাজে প্রতিফলিত হয়েছে, শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রদর্শনে মিশতে গিয়ে শিকড়ে আর উপযুক্ত মাটি পায়নি। তাই সার্ত্র বা কাফকার সঙ্গে তাঁর তুলনা করতে পারি না। মৃত্যুকে উপলক্ষ করে এত পরস্পরবিরোধী কথা বলছেন। কিন্তু অস্তিত্বের বোঝা বহন থেকে মৃত্যু তাঁকে মুক্তি দিচ্ছে, এমন কথা তার মনে আসছে না। হাহুতাশ করছেন মাঝে মাঝে। আবার আশা করছেন, কোনওখানে স্নেহ-প্রেমে শ্রদ্ধায় একটি 'সংরক্ষিত' আসন তাঁর জন্য থাকবে।

এক জায়গায় বলতে দেখি—"মানুষ মাত্রেই মরণশীল। কিছু কিছু মানুষ তত্ত্বও অমর। আমিও কি না একদিন ওই অমরত্বেরই উমেদার ছিলাম। হায়-রে!" এই খেদোক্তি সবচেয়ে বেশি মর্মান্তিক। যেন সন্তোষকুমার ঘোষের মুখে মানায় না।

একবার আগে পড়েছি। বারো বছর পরে আবার পড়লাম। আপাত কাঠিন্যের আড়ালে সমুদ্রতীরে শয্যাশায়ী একজন স্পর্শকাতর মানুষকে আবিষ্কার করে বেশ হচ্ছে। ভালবাসার জোরে ল্যাণ্ডাল পয়েন্ট পার হবার সাহস তো তিনি দেখিয়েছিলেন।

❒ চলার পথে—*সন্তোষ কুমার ঘোষ* / বিকাশ ভট্টাচার্য চিত্রিত / আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা-৯/২৫০.০০।

বাঙালি মনীষার নবতিপর প্রতিনিধি

পুলকনারায়ণ ধর

বিশ শতকীর সুসংস্কৃত ও উন্নত মননের বাঙালি মনীষা আমাদের পৌঁছে দিয়েছে চিন্তাজগতের সমুন্নত শিখরে। অন্নদাশঙ্কর রায় তারই অন্যতম প্রতিনিধি। কবি ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ও প্রশাসক এই সত্তার সমন্বয়ে গঠিত তাঁর বিপুল প্রসারিত জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সুন্দর উপলব্ধি ধরা পড়েছে সারা জীবন ধরে বিভিন্ন ছোট বড় প্রবন্ধ ও কথায়। তারই কিছু কিছু নমুনা সংগ্রহ করা কিঞ্চিৎ সম্পাদক সুকৃতিজ দাশগুপ্ত আমাদের হাতে পৌঁছে দিয়েছেন 'নব্বই পেরিয়ে' গ্রন্থের আকারে।

অন্নদাশঙ্করের প্রায় সমবয়সী আর যে-দু'একজন দোর্দণ্ড প্রতাপ বাঙালি মনীষী বর্তমান তাঁদের মধ্যে হীরেন মুখোপাধ্যায় ও সদ্যশতবর্ষে পদার্পণ ঘটেছে যাঁর সেই নীরদচন্দ্র চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু অন্নদাশঙ্করের মেজাজ ও চিন্তা এঁদের থেকে

অনেক স্বতন্ত্র। অন্নদাশঙ্কর যেন বাঙালির হৃদয়ের খুব কাছের মানুষ। অনেক ঘরোয়া। বিদ্যাবুদ্ধি ও মনীষার প্রাখর্য তাঁকে অগ্রিসম করে তোলেনি। তাঁর কাছে যাওয়া যায়, তর্ক করা যায়। ভালবাসা যায়। সনাতনী ভাবধারা ও আধুনিক মননশীলতার দুর্লভ সমন্বয়ে গঠিত তাঁর মনের তন্ত্রী। সংকলিত রচনাগুলিতেই তাঁর পরিচয় বিধৃত আছে। এই রচনাগুলির একটি অংশ তাঁর আত্মজৈবনিক টুকরো টুকরো কথার মালায় গাঁথা। আর একটি অংশ সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে বিশ্লেষণ বা অভিমত।

অন্নদাশঙ্করের জীবনে প্রেমই হচ্ছে প্রেরণার প্রদীপ্ত আবেগ। সে প্রেম জাতীয় জীবনে যেমন তেমনই ব্যক্তিজীবনেও প্রধানশক্তি। নারীর প্রেমে পড়েছেন বলেই হয়ত তিনি প্রেমের মাহাত্ম্য বুঝতে পেরেছেন আরও গভীরভাবে। তাই নব্বুই পেরিয়েও নারী সম্বন্ধে তাঁর ধারণা "নারীর মধ্যে এমন কিছু আছে যা রূপের উপরে বা গুণের উপরেও নির্ভর নয়। সেটা নারীর মোহিনীশক্তি বা Charm. নরনারীর সম্পর্কের মূলতত্ত্বই হল প্রেম" (পৃঃ ১০)।

তাঁর জীবনসঙ্গিনী বিদেশিনী স্ত্রী (ভার্জিনিয়া) লীলা রায় সম্পর্কে অন্নদাশঙ্করের মূল্যায়ণ এই বক্তব্যেরই প্রতিফলন : "তিনি নিজে এত দূর থেকে এসে আমাকে স্নেহছায় বরণ করেছেন, আমার পাঁচটি সন্তানের জননী হয়েছেন____আমার সঙ্গে ছায়ার মত গ্রামে গ্রামে তাঁবুতে তাঁবুতে ঘুরেছেন। আমার অস্বচ্ছলতায় নিজেই রাঁধুনির কাজ করেছেন, বাসন মেজেছেন ঘর ঝাঁট দিয়েছেন, কয়লার বস্তা সাইকেলের পেছনে বয়ে এনেছেন, ছেলে মেয়েদের জন্য দারুণ কষ্ট স্বীকার করেছেন।___লীলা আমাকে সুখী করার জন্য সারাজীবন দুঃখ পেয়ে গেল। ___তাঁর কাছে আমি ঋণী রয়ে গেলাম—প্রেমের ঋণে ঋণী"।

আধুনিক নারীবাদী আন্দোলনের পুরোধারা এ সম্বন্ধে কি ভাববেন নিশ্চিত করে বলা না গেলেও অন্নদাশঙ্কর কিন্তু তাদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল। "নারীরা তো এখন সব জায়গায় সর্দারি করছে। ভীষণ ভাল লাগছে" এই ভাললাগা থেকেই উত্তরপ্রদেশের দলিত মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ। মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলেই তারা শালোয়ার কামিজ পরবে না শাড়ি পরবে সে সম্বন্ধে শালীনতা শিক্ষা দেবার আগে কলেজের প্রিন্সিপালদের ঐতিহ্যের প্রতি শালীনতা পালন করতে বলেন। এই স্পর্ধার বিরুদ্ধেই তিনি বলেন : "তসলিমা নাসরিন যা লিখেছে সত্য লিখেছে; আমি সব সময়ই সত্যের পক্ষে" (পৃঃ ৭২)।

ব্যক্তিগত একটি অভিমানের কথাও তাঁর লেখায় জানাচ্ছেন। আমেরিকা ভ্রমণ-ইচ্ছা ছিল তাঁর বাল্যকালের স্বপ্ন যা চরিতার্থ হয়নি। সাহিতিক হিসাবে ডক পাননি বলে তিনি সে দেশে যাবার জন্য কোনও সুযোগই নিতে আগ্রহী নন। "আমার মত কত লেখককে ভারত সরকার আমেরিকায় পাঠিছেন, __কিন্তু এটা একটা আশ্চর্যের ব্যাপার আমার কথা করও মনে পড়ে না" (পৃঃ ১৯)। সান্ত্বনা এই যে জীবনসঙ্গিনী লীলা রায়ই তাঁর কাছে "আমেরিকার প্রতিমূর্ত্তি"। আত্মমর্যাদাবোধের অভিমান থেকে যেমন আমেরিকা যাননি ঠিক তেমনই আদর্শবোধের জন্য প্রেসিডেন্ট এরশাদের বাংলাদেশ ভ্রমণের আমন্ত্রণও রক্ষা করেননি। কারণ "গণতন্ত্র হত্যাকারীর আমন্ত্রণ রক্ষা করা" তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

রাজনৈতিক বিষয়ের ক্ষেত্রেও সতেজ মন্তব্যে আমাদের চকিত করেন বলবৃদ্ধ এই স্থিতধী চিন্তক। উদাহরণঃ "তিব্বত একদিন স্বাধীন হবেই। চিনের সঙ্গে এই মৈত্রী যেন তিব্বতের স্বাধীনতার অন্তরায় না হয়।" ___দলাই লামার দীর্ঘ জীবন কামনা করেও বলেন "দেশের দিক থেকে তিব্বত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যুগের দিক থেকে লাভবান হয়েছে।" (পৃঃ ৪৮) বিনীত প্রশ্ন এই তাহলে তিব্বতীরা কী চাইবে?

কাশ্মীর প্রসঙ্গে বলেন : "জম্মু ও লাডাখকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলতে আমার দ্বিধা নেই, কিন্তু কাশ্মীরকে বলতে দ্বিধা আছে"। কাশ্মীরের মায়া কাটাতেও তাঁর বাধা নেই। তবে বলকানীকরণের অশান্তি না থাকলে "স্বাধীন কাশ্মীরের" তিনি একজন অকুণ্ঠ সমর্থক হতে পারেন। (পৃঃ ১৪২)।

তাঁর ধারণা "কাশ্মীর যদি নিজের চেষ্টায় স্বাধীন হয় তো খণ্ডিত আকারে স্বাধীন হবে, তার অপরিহার্য শর্ত জম্মু ও লাডখ থেকে বিযুক্তি"। এখানেও তিনি আমাদের একটি চিন্তায় ফেলেছেন। এই পরিস্থিতিতে কী চাইতে পারি?

বর্তমান ভারতে 'মৌলবাদ'-এর উচ্ছ্বাসে তাঁর মনে পড়ে দেশ-বিভাগের পূর্বেকার রাজনৈতিক অবস্থার কথা। হিন্দুরের 'মৌলবাদ' দেশকে খণ্ডবিখণ্ড করে দেবে যদিও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যেকার 'মৌলবাদ'ও দেশে অনেক ক্ষতি সাধন করে (পৃঃ ১২৯)।

ভারতের বর্তমান সংকটে দরকার 'স্টেটস্ম্যানশিপ'। এই প্রাচীন ও মহান দেশে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন প্রজ্ঞাবান স্টেটস্ম্যানের আবির্ভাব ঘটবে এই তাঁর বিশ্বাস। "এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন। আসিবে সে দিন আসিবে"।

বলিষ্ঠ এই আশাবাদের মধ্যেও কি কোনও নিরাশার কবন্ধ উঁকি মারে? তাই কি বিশ শতকীর শেষলগ্নে বাঙালি-'ওরাকেল' (ORACLE) অন্নদাশঙ্কর প্রশ্ন করেন "কিন্তু কবে?"

❒ নব্বই পেরিয়ে—*অন্নদাশঙ্কর রায়* / দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ / ৫০.০০।

কবিতার অজানা আকাশ

অসীম রেজ

বেশ কয়েকটি কবিতা সংকলন বার হওয়ার পর একটি নতুন কবিতা সংকলন হাতে এলে অতিরিক্ত কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা স্বাভাবিক। অন্তত এমন সংকলনে নতুন কিছুর ইংগিত আছে শেষ পর্যন্ত এমন আশা থেকেই যায়। শুধুমাত্র বেশ কিছু কবিতা সম্পাদকের ইচ্ছামতো বাছাই করে সাজিয়ে দিলেই সংকলনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না। বিশেষ করে সেটি যখন দুই বঙ্গের ভূচিত্রকে একসঙ্গে গ্রথিত করে। 'দুই বাংলার আধুনিক কবিতা' বইটি হাতে পেয়ে বহু আশা নিয়ে বইটি পড়তে শুরু করি। নিছক কবিতা পাঠের জন্যে নয়। যখন এর আগে আরও কয়েকটি দুই বাংলার কবিতা সংকলন বেরিয়েছে তখন আর একটি নতুন সংকলন প্রকাশ করার উদ্দেশ্য কী, জানার ইচ্ছা হয়। ভূমিকাটিতে যা লেখা আছে তার মূলকথা হল—অনেক কবির অনেকগুলি কবিতার একত্রিত একটি পাঠই এই সংকলনের অনুপ্রেরণা। ভাল কবিতার এটি আর একটি সংকলন। এমন কথার মধ্যে নতুনত্ব খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বিশেষত যখন প্রায় প্রত্যেকটি সংকলনে প্রত্যেক সম্পাদকই তাঁর কবিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে 'ভাল কবিতা' শব্দটির মোক্ষম ব্যবহার করেন। এমন বিশেষণটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অভিরুচির উপর নির্ভরশীল। বরং 'আধুনিক' শব্দটির সংযোজন থেকে আমরা এই গ্রন্থের কবিতাগুলিতে আধুনিকতার কিছু বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ চিহ্নিত করতে পারি, যাকে ভাল বা মন্দ বলে পাঠক স্বেচ্ছায় টিক চিহ্ন দিতে পারে। 'আধুনিকতা' কী বা কেন, কবিতার ক্ষেত্রে গড়নের কৌশল না বিষয়বস্তু, কবিতা কোনও 'Process' না 'End product', 'What it is' না 'How it is'—এমন বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে আমরা বরং একটি দেশের ভৌগোলিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ভিতর কবির আধুনিক মননটি খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করব। জীবনের আধুনিকতাকে খুঁজে পাওয়া এবং সেই জীবনের সঙ্গে কবির যোগসূত্রতাকে চিহ্নিত করাই বোধহয় কবিতার প্রধান লক্ষ্য। ভাল কবিতায় শুধু কবিকেই নয়, সঙ্গে তাঁর দেশকাল ও চারপাশের পরিবেশকে চিহ্নিত করা যায়। কোন সময়ে, কোন অভিজ্ঞতায় কবি আন্দোলিত হন, কোন অন্তর্দ্বন্দ্বে, ঘাত প্রতিঘাতে তিনি হন চিন্তা বিচ্ছিন্ন, রক্তাক্ত, একাকী ও নিঃসঙ্গ—একমাত্র তাঁর কবিতাটিই এর উত্তর দিতে পারে। বিশেষত যখন উত্তর ঔপনিবেশিক তৃতীয় বিশ্বের মানুষেরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপে গৃহ ও সম্পদহারা, সামাজিক অবস্থানের কেন্দ্রবিন্দু থেকে ক্ষিপ্ত ও সাংস্কৃতিক মান নির্ণয়ের দণ্ডটিও তাঁর হাতের নাগালের বাইরে চলে যায়। একদিকে সময়ের ব্যবধানে দেশীয় সনাতন আদর্শটিকে আঁকড়ে পড়ে থাকা যেমন তাঁর কাছে অর্থহীন ঠেকে, তেমন অন্যদিকে প্রবল ঝড়ের গতিতে বাইরে থেকে আসা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধটি তাঁর কাছে সম্পূর্ণ নতুন ও অত্যন্ত লোভনীয় বোধহয়, অথচ সর্বদা অপরিচিত ঠেকে। আর এই দুই টানা পোড়েনের চাপে পড়ে কবি তাঁর পথের ঠিকানাটি খুঁজে হয়রান হন। কখনওবা স্বদেশে থেকেও শিকড়হীন প্রবাসীর মতো দিনযাপন করেন। কবিতায় যদি কেবল সেই দুঃখ ও হতাশা মাথাচাড়া দেয় এবং এমন বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসার পথ কবির অজানা থাকে, তাহলে সে কবিতাকে শুধুই 'ব্যক্তিগত কবিতা' বলে খুব সহজেই আমরা দূরে সরিয়ে রাখতে পারি। কবিতা যদি কোনও নতুন পথের দিশা না দেয়, তাহলে পাঠকও তাঁরই বৃত্তের চারপাশে ঘুরে হয়রান হন, ক্রমশ কবিতার প্রতি তাঁর বিরাগ জন্মায়।

সংকলনটি পড়তে পড়তে এমন সব কথাই প্রথমে মনে পড়ে। আলোচ্য সংকলনটির কবিগুলিকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে- বাংলাদেশের ও পশ্চিমবাংলার কবিতা। বিষয় বা কালানুক্রমিক-ভাবে কবিতাগুলিকে সাজানো হয়নি। কবির নামের প্রথম অক্ষরটি দিয়ে সূচীপত্রটি তৈরি করা হয়েছে। সংকলনের দীর্ঘ তালিকায় স্থান পেয়েছে বাংলাদেশের ১৪২জন কবি ও পশ্চিমবাংলার ৯১ জন কবির কবিতা। প্রতিনিধি স্থানীয় কবিরা যেমন রয়েছেন তেমন রয়েছেন তরুণ কবিরা। একেবারে হাল আমলের কিছু নবীন কবিরা বাদ পড়েছেন। একটি কালসীমা টেনে দিলে বোধহয় ভাল হত। কবিতা বাছাই সম্পাদকের ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিলে আর কোনও বিতর্কের অবকাশ থাকে না।

প্রথমভাগে বিভিন্ন সময়সীমার মধ্যে লেখা বাংলাদেশের কবিতাগুলিতে কয়েকটি বিষয় বারবার ঘুরে ফিরে আসে—স্বদেশ ও ভাষার প্রতি তীব্র ভালবাসা, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা, স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশের হতাশাব্যঞ্জক সামাজিক অবস্থা, স্বপ্নভঙ্গ ও বিশ্বাসহীনতা, ক্রোধ ও দুঃখের অভিব্যক্তি। আর শেষপর্যন্ত স্মৃতি থেকে কেউই মুক্তিযুদ্ধের চিত্রকে মুছতে পারেননি। যেমন,"কবরের করোটির দিকে মন্যুমেন্ট। স্মৃতিস্তম্ভের দিকে তাকাতে / বলেছিলাম তোমাদের, / যখন একটি কাঁচের ঘরে প্রবেশ করল বুলোয়াড় / সোনালি আকাশ আর মেঘের ছায়ার নীচে / উদ্যানের সবুজ স্ক্রোয়ারে পড়ে আছি গোলাপের স্তবকপুঞ্জে" (আল মুজাহিদী); 'এ-কোন মৃত্যু? কেউ কি দেখেছ মৃত্যু এমন / শিয়রে যাহার ওঠেনা কান্না, ঝরেনা, অশ্রু? / হিমালয় থেকে সাগর অবধি সহসা বরং / সকল বেদনা হয়ে উঠে একে পতাকার রং?' (আলাউদ্দিন-আল-আজাদ); 'লক্ষ মানুষ হারিয়ে আমি তোমাকে পেলুম তোমায় পেলুম / তোমার বুকে মাথা রেখে ঘুমাই আমি পরম সুখে / তুমি এলে রূপপায়ে, দীপ্ত চোখে: স্বাধীনতা' (দাউদ

হায়দার);

কিন্তু ক্রমশই মোহভঙ্গ হতে থাকে। রক্তে অর্জিত এ স্বাধীনতার অর্থ ক্রমশ ফিকে হয়ে পড়ে কবি যখন দেখেন সর্বগ্রাসী এক ভয়ানক স্ববিরতা, রাজনৈতিক মিথ্যাচার, অনাগ্রসরতা, অপরিবর্তনীয় সামাজিক চিত্রকে গ্রাস করে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত— 'তোমাকে ভাবতে গেলেই স্বাধীনতা হয়ে যাও / অন্ধকার, ঘুটঘুটে আঁধার এসে ঘোলা করে দ্যায় চোখ দুটি, কণ্ঠনালী টিপে ধরে / তোমাকে ভাবতে গেলেই' (দিল আফরোজ আতিক); 'স্বাধীনতার অন্তদ্র প্রহরীরা অস্ত্রহীন / রাজাকার আলবদরের রাজত্ব অবধি; / রক্তে কেনা স্বাধীনতা বড়ই অলক্ষী তুই' (ফজল এ খোদা); 'এ-যেন নষ্ট জন্মের লজ্জায় আড়ষ্ট কুমারী জননী, / স্বাধীনতা- এ কি তবে নষ্ট জন্ম? / এ-কি তবে পিতাহীন জননীর লজ্জার ফসল? / জাতির পতাকা আজ খামচে ধরেছে সেই পুরোন শকুন' (রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ);

পট পরিবর্তন হয় না। নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। সর্বত্র এক অভাব, অনটন, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ দুঃস্বপ্নের মতো ঘিরে ধরে। কবি দেখেন—'নদীর প্লাবনে কিংবা দিগন্তে / শিশিরে পাখীরা / ঘরে ফেরার আগে / আমার জীবনের অনেক / সময়, প্রথিত অনাবৃষ্টি / আর দুর্ভিক্ষের নোনাজলে' (আবুজাফর আব্দুল্লাহ); 'রমণী এখন নদীরা গুকিয়ে গেছে / ক্ষতবিক্ষত ধূধূ রৌদ্রের চরে / হিজল গাছের আত্মার লাশ ঝুলছে / ভাগাড়ের গাড়ী ভরে এসে নিয়ে যাবে' (আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ); 'এবং ইদানীং / ক্ষুধার পতাকা এক উড়ছে শুধুই / বিশাল আকাশ জুড়ে আন্বিনের সুনীল ললাটে' (ফজল শাহাবুদ্দিন);

তবু শেষপর্যন্ত নিরাশার এই চক্রব্যূহ থেকে বার হতে চান কবিরা। নতুন আশায়, ভালবাসায় বাঁচতে চান পুনর্বার। যেমন, 'আমার প্রেমের মধ্যদিনে তোমার চোখের জল/নিবিড় আষাঢ় আনে সত্তার খরায় অবিরল/হাওয়া বয় হৃদয়ের ঝোপেঝাড়ে, থামে সবকথা,/তোমার অধর আমাকেই ছোঁয় অমরতা' (শামসুর রাহমান); 'যদি ভালোবাসা পাই, আবার গুধরে নেবো/জীবনের ভুলগুলি;/যদি ভালোবাসা পাই শিল্পদীর্ঘ পথে/ব'য়ে যাবো কাঁথাগুলি' (রফিক আজাদ); 'ভালবাসা ছাড়া কবে ফুল ফুটেছে গাছে?/আমি ভালবাসিনি এমন নারী কোথায় আছে?' (নির্মলেন্দু গুণ) আবার বাঙলা ভাষার প্রতি গভীর ভালবাসা থেকে জন্ম নেয় এক নতুন আত্ম প্রত্যয়। 'এবং যখন শেকলের পর শেকল চুমার করে ঝনঝন করে বেজে উঠি/আমরা দু'জন, আমি প্রথম জন্মে গভীর ব্যাপক শিল্পসম্পত ঐকতান/আমাদের আদিম আর্তান বিশ শতকের দ্বিউীয়ার্ধের/একমাত্র গান।' (হুমায়ুন আজাদ)

রবীন্দ্রবিরোধিতা ও পশ্চিমি কবিতার (বিশেষত ইংরাজি ও ফরাসি কবিতা) অনুসরণে আধুনিক বাংলা কবিতার জন্ম। পরবর্তী সময় বামপন্থী মতাদর্শ পশ্চিমবাংলার কবিতার চেহারাকে অনেকটা পাল্টে দিয়েছে। আমাদের কবিতার ধারাবাহিকতা থেকে আমরা খুব কমই নিয়েছি; হয়তবা রবীন্দ্রনাথ প্রাচীরের মতো আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন বলে। রবীন্দ্রনাথকে আধুনিকতার উত্তরাধিকার বলে মেনে নিতেও আমরা অনেকেই পিছুপা হয়েছি। আমাদের স্বদেশের ধারণা খুব অস্পষ্ট, ভাষার প্রতি ভালবাসাও ক্ষীণ এবং স্মৃতিপট থেকে মুছে গেছে স্বাধীনতার স্বপ্ন। আমাদের সামনে এমন কোনও আদর্শ নেই যা আমাদের সঠিক ও নির্দিষ্ট পথে চালিত করে। তাই কবিতার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আত্মালাপেই আমরা সন্তুষ্ট থেকেছি। কবিতার ভাষা হয়েছে সাংকেতিক, Sign language-এর মতো যা কেবল সীমাবদ্ধ গুটি কয়েক পাঠকের মধ্যে। বিশাল পাঠক সমাজের সঙ্গে কবির যোগসূত্রতা গিয়েছে হারিয়ে; কবিতার জনপ্রিয়তা অনেক কম উপন্যাস ও গল্পের থেকে। তাই এই মুহূর্তে পশ্চিমবাংলার কবিতার একটি সুনির্দিষ্ট চেহারা আমরা খুঁজে পাইনা সংকলনের প্রায় একশ কবিতার মধ্যে। এক একজন কবি, দাঁড়িয়ে থাকেন এক একটি দ্বীপের মতো। পাঠকের ব্যক্তিগত ভাললাগা মন্দলাগার উপর নির্ভর করে এর ভবিষ্যৎ।

সংকলনের বহু কবিই আমাদের সুপরিচিত। এর ভিতর প্রথিতযশা কয়েকজন কবি আছেন যাঁরা এক এক সময়ে আধুনিক বাংলা কবিতায় এক একটা ঝাঁক তৈরি করেছেন। এঁদের অনেকেই অনুসরণ করেছেন। যেমন বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন ও অন্যান্য কবিরা। এই সংকলনে আশ্চর্যজনকভাবে অনুপস্থিত রয়েছেন জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্ত্তী ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। এঁরা কেন বাদ গেলেন বোঝা গেল না। বহু পরিচিত ও পঠিত কবিদের যে কবিতাগুলি এখানে স্থান পেয়েছে তাকে প্রতিনিধিত্বমূলক বলা হয় না। বরং অনেকক্ষেত্রে কবির নিজস্ব ভাষাটি খুঁজে না পাওয়ায় এঁদের স্বতন্ত্র বলে চিহ্নিত করতে অসুবিধা হয়। অজস্র কবির ভিড়ে কয়েকজনকে কেবল আমরা নিশ্চিতভাবে খুঁজে পাই। যেমন—'অতি মৃদু শিহরণ, যেন স্বপ্নে এখনো আবৃত। / তারপর জেগে ওঠে দৃষ্টি, শ্রুতি, কিছু ক্ষীণ তরুণ জড়্যায় / শুধু মাঝে-মাঝে নামে সক্ষমতা—অন্য কারো নূপুরে ঝংকৃত; / আবার কখনো চলা মগ্ন হয় মধুর তন্দ্রায়' (বুদ্ধদেব বসু); 'তোমাকে পাই না দিশাহারা কোলাহলে / তাই পেতে চাই নিভৃত বনস্থলে' (বিষ্ণু দে); 'নিরালা কাল আপন মনে / পুরানো বিষন্নতা হাওয়ায় বোনে' (সমর সেন); 'হাওয়ার ঠাণ্ডা আঙ্গুল গিয়ে স্পর্শ করে / ঠিক যেখানে বুকের মধ্যে নদী, নদীর বুকের মধ্যে / চোরাবালি (নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী); 'এখন যে দিকে ইচ্ছে যাওয়া যেতে পারে / প্রকৃত শহর নয়, বাড়িগুলি শাল ও সেগুন, / কিছু মেহগিনি আছে, সুঁড়িপথে ভেসে চলে জল' (শক্তি চট্টোপাধ্যায়); 'শেষ কবে তোমার চোখের জল উপহার দিয়েছিলে / কাকে? / বলো, বলো, একবার বুকখালি

করে বলো, / চুপ করে থেকোনা' (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়); 'কাঁচের আড়াল আছে। দেখা যায়, ছোঁয়া যায় না কিছু। / কতই সহজে এই একলা প্রহরে কাঁচা ঘরে / কাঁচের মসৃণ দেহ পেয়ে যায় শরীরের হাড়' (শঙ্খ ঘোষ)। এছাড়া রয়েছেন নিজস্ব ভঙ্গি নিয়ে বিনয় মজুমদার, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অমিতাভ দাশগুপ্ত, তুষার রায়, আনন্দ বাগচী, তরাপদ রায়, জগন্নাথ চক্রবর্তী, উৎপলকুমার বসু, কেতকী কুশারী ডাইসন ও কয়েকজন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দিনেশ দাশ, অরুণ মিত্র ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—এঁদের কবিতায় জীবনবোধের এক নতুন মাত্রা খুঁজে পাওয়া যায়। জীবনের খুব কাছাকাছি মনে হয়। এগুলি আমাদের এক আত্মবীক্ষণের মুখোমুখি দাঁড় করায়। যেমন–'টুকরো টুকরো হল এখন খোঁজো / কোথায় ভাঙা রাস্তির জোড়া লাগবে / সামনে আবার কোন সবুজ নিশানা / কোথা ঘুমের খর রোদে জাগবে' (অরুণ মিত্র); 'আমি বা আমার ভূতটি নিয়েছে ঘুমের শপথ / হয়তো পায় নি আর কোন পথঃ / কখনো কি আর অশথের ডালে / পাখনা নাড়ব পশ্চিম থেকে সুদূর পূর্বে / যূথবদ্ধ মিহিরমালের মত হৃদয় উড়বে?' (দিনেশ দাশ); 'এখন আমি অকাই না 'ডাইনে' / চাই না 'বামে' / দেখি না সামনের পথও 'মাঝখানে' / চাপে চ্যাপ্টা হয়ে মাটির দিকে চেয়ে হাঁটি (গোলাম কুদ্দুস); 'রক্তে ডোবা অন্ধকার সূর্য / অন্ধকার ভোর / গলিত নখর-দন্ত সিংহের কেশর—/ বয়সিনী পৃথিবীর বেঁচে থাকার সাধ এখনো গেল না।' (বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়); 'বাইরে জন্ম, ঘরে মৃত্যু ও জ্বরা / পথ ভুল ক'রে / মুখোমুখী দুই অন্ধ দুদিকে / ডোমকানা দুই মূর্খ' (সুভাষ মুখোপাধ্যায়)।

এই সংকলনে স্থান পায়নি আরও কয়েকজন –মনীন্দ্র গুপ্ত, বৃদ্ধদেব দাশগুপ্ত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ভাস্কর চক্রবর্তী, তসলিমা নাসরিন, এমন অনেকে। বহু কবির কবিতা পড়ে মনে হয় কবিতায় কবির কোনও দায় না থাকায় কবিরা স্বচ্ছন্দে যত্রতত্র উড়েছেন। লাগামহীন কল্পনা আকাশ ছুঁয়েছে। আর শুধু ওই ওড়ার ভিতরই কবির আনন্দ। জীবন থেকে অনেক দূরে, এই সব কবিদের মাটিতে আনার দায় যেন কারও নেই।

বাংলাদেশের রংপুর থেকে প্রকাশিত সুমুদ্রিত এমন একটি গ্রন্থ সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। আকর্ষণীয় প্রচ্ছদটি করেছেন শিল্পী সৈয়দ ইকবাল। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে।

❑ **দুইবাংলার আধুনিক কবিতা**—*মহাদিল হক ও পবিত্র মুখোপাধ্যায়* সম্পাদিত / ঈক্ষণ, মুলাটোল, রংপুর / ১২০.০০।

"কবিতার দায় ঃ কবিতার বিষয়"

দেবী রায়

ষাট দশকের উল্লেখযোগ্য কবি আনন্দ ঘোষ হাজরার দ্বিতীয় প্রবন্ধগ্রন্থ 'কবির দায় ঃ কবিতার বিষয়'। প্রথম প্রবন্ধের নাম "আফ্রিকার মৌখিক সাহিত্য ও তার ঐতিহ্য।" তিনি দেখিয়েছেন বাংলা ভাষায় মৌখিক ও লোক সাহিত্যের সঙ্গে আফ্রিকার মৌখিক ও লোক সাহিত্যের সাদৃশ্য রয়েছে। মন্যুষ্যপ্রতিম পূর্বপুরুষদের আদি জন্মস্থান তথা বাসভূমি সম্ভবত আফ্রিকা, যাঁরা প্রথম আগুনের ব্যবহার জেনেছিলেন। যাঁদের কাছে তথাকথিত সভ্য মানুষেরা শেখা নেন। আফ্রিকাকে একদা, সাদা মানুষদের বোঝা বলে মনে করা হত এখন তাঁরা-ই আবার প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন যে, আফ্রিকাই আদি সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান।

এটা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই, আফ্রিকার সাহিত্যও আন্তর্জাতিক সাহিত্য, তা সে ইংরেজি ভাষাতেই লেখা হক আর পর্তুগীজ ভাষাতেই লেখা হক। আনন্দবাবুর বক্তব্য, এঁদের সাহিত্য বিচার করার সময় বিচার করতে হবে আফ্রিকার সাহিত্যের মৌলভঙ্গি ও বোধ তথা সহমর্মিতাকে মাথায় রেখে। তিনি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন আফ্রিকার মৌল জীবনযাত্রায় গদ্যের চেয়ে পদ্যের ভূমিকা বেশি। দেখিয়েছেন, এই ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহমান ইওরুবা সাহিত্য তথা কবিতায়। কবিতাকে উহ্য রেখে ইওরুবাদের জীবনযাপন নৈব নৈব চ। শুধুমাত্র, উৎসব অনুষ্ঠানেই নয়—ইওরুবাদের সব কিছুই যেন কবিতা; লক্ষণীয়, ইওরুবাদের মধ্যে মানুষের নামকরণের ক্ষেত্রেও কবিতার প্রবেশাধিকার ঘটে। আফ্রিকার মৌখিক কবিতা ও গান ভীষণ রকমের জীবনবাদী। তাঁদের অফুরন্ত জীবনী শক্তির প্রকাশ ঘটেছে জীবন ও কবিতায়। এ বইয়ে আনন্দবাবু, বাংলা ভাষায় তার কিছু কিছু নমুনা দিয়েছেন। তিনি স্বীকার করেছেন এগুলি ভাষান্তরের ভাষান্তর। 'কবির দায়—কবিতার বিষয়ে' যা বলতে চেয়েছেন তা হল বাংলা কবিতা সত্য সত্যই বিশ্ব সাহিত্যের নিরিখে গর্ব করার মতো জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে। লক্ষ করা যাচ্ছে ছন্দের নানান বৈচিত্র্যময় ব্যবহার যদিও তাঁর ধারণা—'কবিতা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মেধায় বা মননে আক্রান্ত হচ্ছে না।' অর্থাৎ কিনা, কবিতার বহিরঙ্গে দেখা যাচ্ছে বেশ দ্যুতিময়। 'ডাইয়োনেশিয়ান মেধার বিচ্ছুরণ কবিতার বোধ্যতাকে নষ্ট করে দিতে পারে।' সুতরাং, আমাদের অ্যাপোলোনিয়ান কবিতা কাম্য। বলেছেন, সুরিয়ালিস্ট আন্দোলনের সমাধি ঘটেছে তার জন্মস্থানেই। ইংরাজি কবিতার ক্ষেত্রেও তক্রূপ। একটু খটকা কি রয়ে গেল

না? কোনও আন্দোলনের মৃত্যু, কালের নিয়মে ঘটলেও তা কি একেবারে শেষ হয়ে যায়? বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে একটু রূঢ়ভাবে হলেও স্বীকার করে নেওয়া শেয় যে 'জীবনানন্দীয় বিশ্ববোধ ও জীবনবীক্ষা' তাঁদের প্রেক্ষাপটে হয়ত বা কাজ করে যায়। কেউ কেউ অবশ্য সহজিয়া পথের পথিক, কেউবা সমাজ সচেতন বা মার্কসীয় চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। হতেই পারে। আমরাও বিশ্বাস করি, শ্লোগানের আধিক্য বা অহেতুক ঝোঁক কবিতার উড়ালে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। মার্কসীয় কবিদের দায়, শুদ্ধ কবিতাবাদীদের দায় থেকে তুল্য মূল্য হয়ত বা বেশি। বর্তমান প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন—'অভিজ্ঞতাকে উহ্য রেখে', ঘটনার সূচাক্ব ব্যাখ্যা না করে, কেবল তত্ত্ব ভেবে নিজেকে জাড়ো আচ্ছন্ন করে প্রকৃত কবিতা লেখা যায়না।

বাণিজ্যিক পত্রিকাগুলির ঝোঁক বা চোখ থাকে বাজারে যা বিকোবে তার দিকে। রুচির গঠন নয় তার গূঢ় উদ্দেশ্য অন্যত্র! সাহিত্য তথা কবিতা একটা খাঁচার ভিতর আটকে রাখা হয়। ফলে, কবিতার সৌন্দর্য নষ্ট হতে থাকে। তার স্বাভাবিক ফুটে ওঠা হয় না। লিটল ম্যাগাজিনের সদর্থক ভূমিকার কথা তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

সমগ্র জগৎ কীভাবে প্রসারিত হয়ে নিত্য নতুন চেহারায় সৃষ্ট হচ্ছে, কত সৌরজগৎ-এর মৃত্যু—এসব জেনেও শক্তির খেলায় নিজেদের নিয়োজিত করে মেতে উঠছে ধ্বংসের নিত্য নতুন খেলায়—বিশেষত ইউরোপীয় দেশগুলি। অথচ, আমরাও স্বপ্ন দেখতে থাকি একবিংশ শতাব্দীর।

'কবিতার অর্থ', অংশে তিনি উল্লেখ করেছেন—শুদ্ধ কবিতার চরমতম থিয়োরীগুলি শেষপর্যন্ত ধোপে টেঁকে না। কবিতার অর্থের পাশাপাশি যুক্তি ও পরম্পরা চাই। বলতে চেয়েছেন সেই সার কথা, কবিতা বেশি কথা না বলেও অনেক বেশি কথা বলায় সক্ষম। 'তপোভঙ্গ' প্রবন্ধে তাঁর সলজ্জ-স্বীকারোক্তি কি আমাদেরও নাড়া দিয়ে যায় না? 'বিজ্ঞান ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে বলতে চেয়েছেন যে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে বিজ্ঞান কবিতার বিরুদ্ধধর্মী, কিন্তু আমাদের ধ্যান ও ধারণা সঠিক নয়। তিনি বুঝিয়েছেন, কবির মন সংশ্লেষধর্মী আর বৈজ্ঞানিকের মানসিকতা, আমরা ধরে নিই যে, বিশ্লেষণধর্মী; কিন্তু বৈজ্ঞানিকের বিশ্লেষণধর্মীতা ধাপে ধাপে যেখানে শেষপর্যন্ত পৌঁছতে চায় তা হল সংশ্লেষে। উদাহরণ হিসাবে কবি মিরোশ্লাব হোলুবের প্রসঙ্গ এনেছেন। পাশাপাশি ঔপনিষদিক ঐতিহ্যে লালিত রবীন্দ্রনাথের বালাকাল কীভাবে বিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, তাও সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং তার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর নানান রচনায়।

'জীবনানন্দ' প্রবন্ধে এইসব বিষয়ের আরও ব্যাপ্তি ঘটেছে। কবিতা লেখা শুধুমাত্র মস্তিষ্ক নয়—বোধের কিংবা হৃদয়, মস্তিষ্ক ও বোধের সম্মিলিত রসায়ন। তিনি বলেছেন মস্তিষ্কব্যতীত কি তাবৎ বিশ্ব রহস্যের জটিলতা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হত? না, বোধ হয়। বুদ্ধি মারফৎ বিজ্ঞানের সহায়তায় আমাদের জানা মূর্ত হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির পাশাপাশি রহস্য ও বিস্ময়ের সন্ধান আরও কি বেশি বেশি পাচ্ছি না? জীবনানন্দ আমাদের বাঁচিয়ে রাখবেন।

মাত্র সাতানব্বই পৃষ্ঠার এ বইটি, আকারে ছোট, তুলনামূলক তথ্যের সূলুকসন্ধান কিছুমাত্র কম নেই। উৎসাহী পাঠক ও গবেষকদের সমাদর কাম্য। প্রুফের ব্যাপারে, প্রকাশকের আরও যত্নবান হওয়া উচিত ছিল। প্রচ্ছদ চারু খানের অল্প রেখার টানে গভীরতার সন্ধান দিতে পেরেছেন।

❑ **কবিতার দায়**—*আনন্দ ঘোষ হাজরা* / মহাদিগন্ত, বারুইপুর / ২৫.০০।

হাংরি এবং অন্যান্য

মেঘ মুখোপাধ্যায়

১৯৬১ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যে 'হাংরি জেনারেশন' নামে একটি আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। রবীন্দ্র পরবর্তীকালের ৩০, ৪০ এবং ৫০ দশকের নতুন ধারার কবিতা ও গল্প এবং নতুন কবি ও গল্পকারদের সমক্ষে যেমন বহু ও বিশদ লেখালেখি হয়েছে, হয়ে চলেছে—হাংরি আন্দোলনের কবিতা-গল্প এবং কবি-লেখকদের সম্বন্ধে তর কিছুমাত্র আলোচনা হয়নি—যদিও ষাট দশকে বাংলার সাহিত্য ও সমাজক্ষেত্রে হাংরিরা সত্যিই একটা আন্দোলন-আলোড়ন ঘটিয়েছিলেন। ১৯৬৪ এর শেষ দিক থেকে মূলত অশ্লীল রচনা প্রকাশের অভিযোগে হাংরি লেখকদের ওপর পুলিশি হামলা শুরু হয় এবং ৬৫তে আদালতে মামলা দায়ের করা হল। তারপর এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এক সময় স্তব্ধ হয়ে যায়।

হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের পরিকল্পনা করেছিলেন তৎকালে পাটনাপ্রবাসী তরুণ মলয় রায়চৌধুরী। তিনি তাঁর দাদা সমীর রায়চৌধুরীর (কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর বন্ধু) সহযোগিতায় এবং শ্লোয় শক্তি চট্টোপাধ্যায়, উৎপলকুমার বসু, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, দেবী রায়, শৈলেশ্বর ঘোষ, প্রদীপ চৌধুরী, সুভাষ ঘোষ, সুবিমল বসাক, দ্বিদিব মিত্র, সুবো আচার্য, বাসুদেব দাশগুপ্ত প্রমুখকে এই আন্দোলনের ছত্রছায়ায় কিছুকালের জন্য একত্রিত করেছিলেন।

হাংরি জেনারেশনের ইংরাজি বুলেটিনে ঘোষিত হল : ক্রিয়েটর মলয় রায়চৌধুরী, লীডার শক্তি চট্টোপাধ্যায় এডিটর দেবী রায়। পাটনায় বসে এবং মাঝেমধ্যে কলকাতায় হানা দিয়ে কয়েকদিন এখানেওখানে ঘাঁটি গেড়ে এক সদ্য এমএ পরীক্ষা দেওয়া তরুণ কীভাবে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে একটা নতুন ধারার জন্ম দিতে চেয়েছিলেন এবং তার পরিণতি কী ঘটেছিল—তিন দশক বাদে তার রোমাঞ্চকর তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস রচনা করে স্বয়ং মলয় রায়চৌধুরী লিখেছেন 'হাংরি কিংবদন্তী' (জুলাই ১৯৯৪)। প্রশ্ন জাগে হাংরিরা আসলে কী করতে চেয়েছিলেন? বাংলা কাব্যসাহিত্যে তাঁরা কোন্ অপূর্ব-অভাবিতপূর্ব মাত্রা যোগ করতে চেয়েছিলেন? কতদূর সফল হয়েছিলেন? কেন মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে এই উদ্যোগ স্তব্ধ হয়ে গেল?—প্রচলিত ধারার প্রাবল্য ও বিরুদ্ধতা এবং পুলিশি হামলাই কি এর কারণ? না কি এর দর্শন-জীবন ও সাহিত্যবোধের তত জোর ছিল না? পরবর্তী প্রজন্মের কবি-লেখকদের এবং সাহিত্যিক চিন্তাভেদনার ওপর এই আন্দোলনের কি কোনও স্থায়ী প্রভাব বর্তেছে? না কি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের বেগবান ধারায় এটা একটা ক্ষণপ্রভা বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র?

কতক প্রশ্নের উত্তর মেলে, কিছুর মেলে না। তাঁরা কবিতা এবং আন্দোলন শুরু করেছিলেন এই আবহাওয়ায়—'তখন চারিদিকে বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র এলিটিস্ট কবিতা নিয়ে হইহই। বামপন্থীদের কাগজগুলোয় সুভাষ মুখোপাধ্যায় দিনেশ দাস বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। লিটল ম্যাগাজিনে শঙ্খ ঘোষ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত আলোক সরকার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।...পাঠককে ভুলিয়ে রাখার জন্যে কবিতায় নানারকম কেত্তবী ছন্দ ব্যবহার। ছন্দের মাধ্যমে পাঠককে আক্রমণ করাটা ভাবাও চলে না, এমন পাতিবুর্জোয়া আবহাওয়া। কবিদের অনুবাদেও কবির নিজস্ব ভাষা, নিজস্ব বাংলা। এরকম ভেতো এবং জেনানা কবিদের ঢালাও কারবার। (পৃঃ ৪-৫)।

হাংরি কবিরা এই অবস্থার তীব্র ও হিংস্র প্রতিবাদ করতে কলম ধরেছিলেন এবং নানা বিচিত্র কর্মকাণ্ড বাধিয়েছিলেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন—'এ-আন্দোলনের মূলকথা সর্বগ্রাস।' কিন্তু তিন দশক পরে মনে হয় মলয় রায়চৌধুরী ব্যঙ্গাত্মকভাবে তখনকার কাব্যক্ষেত্রের প্রতিভূ যে কবিদের নাম করেছেন এবং যাঁদের কাব্যচর্চার বিরুদ্ধতায় আন্দোলন করে কবিতা লিখেছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই আজ বড় কবি হিসাবে পাঠক-সমালোচক দ্বারা আদৃত ও স্বীকৃত কিন্তু মলয় সহ হাংরি জেনারেশনের কোনও কবিই বড় কবি হিসাবে চিহ্নিত বা আদৃত হননি—একথা সত্যের খাতিরে বলতেই হল। শক্তি উৎপলকুমার কিছুকাল হাংরিদের সঙ্গে যুক্ত থেকে কিছু জোরালো কবিতা লিখেছিলেন সত্যি কিন্তু বড় কবি হিসাবে তাঁদের বিকাশে ও প্রতিষ্ঠায় এই আন্দোলনের ভূমিকাকে বড় করে দেখানো যাবে কি? হয়ত তাঁদের ক্ষেত্রে কৃত্তিবাস এবং সমকালীন অন্যান্য পত্রিকার অবদানই বেশি।

এ বইটির মুখ্য ও রোমাঞ্চকর দিক হল আদালতে সোপর্দ হবার পরের পর্যায়ের বিবরণ। কীভাবে দেশ-বিদেশে পক্ষে বিপক্ষে মতামতের ঢেউ উঠেছিল, হাংরিদের ঘরের লোকরাই দলত্যাগ করে রাজসাক্ষী বনে গিয়ে পুলিশ-প্রশাসন-আদালতকে সাহায্য করেছিল নথিপত্রসহযোগে মলয় তার পুঙ্খানুপুঙ্খ জানিয়েছেন। ভবিষ্যৎ কোনও আন্দোলনকারীদের সাহায্যে লাগবে! সুবিমল বসাক এবং সমীর রায়চৌধুরীর লেখার সংযোজন বইটির গুরুত্ব বাড়িয়েছে। বইয়ের সূচনায় (তিন পৃষ্ঠায়) হাংরিদের 'আবির্ভাব'-কে মহত্ত্ব দিতে গিয়ে তিনি অকাতরে তাঁর আগের যুগের কবি-সাহিত্যিকদের সকলকে এক আসনে বসিয়ে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করেছেন, খাটো করতে চেয়েছেন দেখে অবাক হলাম। তিনি কি জানেন না তাঁর সামান্য পূর্বযুগে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক দলছুট, বেয়াড়া, প্রতিষ্ঠানের চক্ষুশূল লেখক বাংলা-সাহিত্যের সেবা করতে গিয়ে অকালে প্রাণ দিয়ে গেছেন?

রবীন্দ্রকবিতা ও কথাসাহিত্যের বিরুদ্ধতা করে নতুন আদর্শে উদ্বুদ্ধ কবিতা-পত্রিকা-চতুরঙ্গ-পূর্বাশা গোষ্ঠীর কবি লেখদের উত্থান, তাঁদের পরে পূর্ববর্তীদের আদর্শের ও রচনারীতির প্রতিবাদে কৃত্তিবাস্-শতভিষা গোষ্ঠীর আবির্ভাব ও জমিদখল। আবার এঁদের উভয়কে অস্বীকার করে হাংরিরা নতুন ধারা বহাতে চেয়েছিলেন কিন্তু সামাজিকক্ষেত্রে আলোড়ন জাগানো ছাড়া সাহিত্যে তাঁদের কোনও স্থায়ী দাগ রইল কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। থাকলে কতটা? সেই তর্কে না গিয়েও নিঃসংশয়ে বলা যায়—সেদিনের কতিপয় দুঃসাহসী, দুর্বিনীত ও স্বপ্নঘোরে আচ্ছন্ন তরুণ যে এমন একটা আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন এবং কবিতা-পত্রিকায়-কৃত্তিবাসের প্রবল আবহাওয়ার মধ্যে একটা ঝাঁকুনি লাগিয়ে ছিলেন—এই উদ্দাম সাহস ও দুরন্তপনাকে সম্মান না জানিয়ে পারা যায় না। মলয় রায়চৌধুরী নিজে সেই আন্দোলনের উত্থান ও বিপর্যয়ের ইতিহাস রচনা করে দেখে আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়ে রইলেন।

কবি ও একটি বিখ্যাত লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক উত্তম দাশের 'ক্ষুধিত প্রজন্ম ও অন্যান্য প্রবন্ধ' বইটির অন্যতম প্রবন্ধটি হাংরি জেনারেশন আন্দোলন নিয়ে লেখা। আন্দোলনের উদ্ভব ও গতিপ্রকৃতির ইতিহাস তিনি সহানুভূতির সঙ্গে ধরে করেছেন। হাংরিদের লেখার 'শকিং' দিক বিষয়ে তিনি বলেছেন—'কিন্তু পাঠকের দিক থেকে বিপজ্জনক হলো তাকে এগুতে হবে অনেক আগাছা মাড়িয়ে, অনেক চটকদারী ভুল উপস্থাপনাকে সন্তর্পণে অতিক্রম করে। অর্থাৎ বলতে চাইছি হাংরি লেখদের মধ্যে অনেকের মধ্যেই ছিল না সেই জীবনজাত অভিজ্ঞতা যা তাঁদের এমন আভ্যন্তর রক্তক্ষরণকারী আন্দোলনে সামিল করতে পারে।' (পৃঃ ১৬০) বইটির মোট চোদ্দটি প্রবন্ধের মধ্যে উল্লিখিত প্রবন্ধটি

আর তিনটি প্রবন্ধ আমার অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে—সাহিত্যের বাজার, কবিতা ও ছড়ায় অন্নদাশঙ্কর এবং বাঙালি জীবনচর্যার রূপকার শরৎচন্দ্র। মুদ্রণশিল্পের বিকাশের ফলে লেখকের রচনা যখন বিক্রয়যোগ্য পণ্যে পরিণত হল তখন লেখাটিকে ঘিরে কীভাবে বাজার গড়ে উঠল, নতুন নতুন প্রকাশকদের আবির্ভাব ঘটল—বাংলাসাহিত্যের প্রেক্ষিতে লেখক তার অনুসন্ধান করেছেন। একটি অন্য ধরণের প্রবন্ধ। অন্নদাশঙ্করের ছড়ার উৎসমূল আবিষ্কারের এবং বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করার চেষ্টা 'কবিতা ও ছড়ায় অন্নদাশঙ্কর'-একটি উপভোগ্য লেখা। শরৎসাহিত্য নিয়ে লেখা হয়েছে প্রচুর-উত্তম দাশের প্রবন্ধটি পড়ে মনে হল তবুও নতুন চিন্তাভাবনার এবং আরও অনেক লেখার সুযোগ রয়েছে। বঙ্কিম ও রবীন্দ্র উপন্যাসের থেকে শরৎ উপন্যাসের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যটি তিনি আমাদের চিনিয়ে দিয়েছেন।

এছাড়াও বইটিতে সাম্প্রতিককালের কবিতা ও গল্পের ওপর রয়েছে কয়েকটি আলোচনা। সাম্প্রতিককালের কয়েকজন উজ্জ্বল কবি ও গল্পকারকে তিনি চিনিয়ে দিতে চেয়েছেন এবং মূল্যায়ণ করেছেন।

বইয়ের প্রথমে ঋত্বিক ঘটক, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এবং স্বপ্নময় চক্রবর্তীর গল্প নিয়ে তিনটি বিশ্লেষণী প্রবন্ধ থাকলেও অমিতেশ মাইতির 'রূপের আড়ালে'-কে কিন্তু প্রবন্ধগ্রন্থ বলা যায় না। উক্ত তিনটি প্রবন্ধ ছাড়া বাকি চোদ্দটি লেখা হল হালকা চালের ছোট ছোট ফিচার। এগুলির মধ্যে সোমনাথ হোরের চিত্রপ্রদর্শনী এবং এক সন্ধ্যায় অলোকরঞ্জনের কবিতাপাঠ-এর বিবরণ পড়তে ভাললাগে। একটি আত্মকলহের মহড়া নামে জীবনানন্দের কবিতার অনুভব-উপলব্ধি নিয়ে আড়াই পৃষ্ঠার একটি ফিচার লিখেছেন—অথচ একটি গভীরতাসঞ্চারী প্রবন্ধ লেখার সুযোগ ছিল। প্রবন্ধ লেখার ধৈর্য-কলাশৈলী আয়ত্ত করার চেষ্টা না করে এই তরুণ লেখক হালকা চালের কয়েক পৃষ্ঠার ফিচার লিখে নিজের লিখনিশক্তির অপচয় ঘটাচ্ছেন দেখে দুঃখ হয়- কেননা প্রবন্ধ লেখার যোগ্যতা যে তাঁর রয়েছে বইয়ের প্রথম তিনটি প্রবন্ধ পড়ে তার নমুনা পাওয়া গেল।

❑ **হাংরি কিংবদন্তী**—*মলয় রায়চৌধুরী* / দে বুক স্টোর, কলি-৭৩ / ২৪.০০।

❑ **ক্ষুধিত প্রজন্ম ও অন্যান্য প্রবন্ধ**—*উত্তম দাশ* / মহাদিগন্ত, বারুইপুর, দঃ ২৪ পরগণা / ৬০.০০।

❑ **রূপের আড়ালে**—*অমিতেশ মাইতি* /দীপ প্রকাশন, কলি-৭৩ / ২৫.০০।

নগরজীবনের হাল-হকিকৎ

বিজলি সরকার

কিন্নর রায়ের ছোটগল্পের পাঠক অনুভব করবেন, বর্তমান সময়ের নগরজীবনের অন্তঃসারশূন্যতা কত গভীরভাবে চারিয়ে গেছে সমাজের রন্ধ্রেন্ধ্রে। এখনকার নগরজীবন যেন মজে থাকতে চায় কেবল 'এনটারটেইনমেন্ট আওয়ার'-এর মধ্যে। প্রতিকারহীন বিধিলিপির মতো আজকের মানুষ ভুলেছে তার সামাজিকতা। তীব্র এক হতাশাবোধের সুর শোনা যাবে লেখকের 'এনটারটেইনমেন্ট আওয়ার', 'কুত্রোশাওয়া ভিজে যাচ্ছে', 'বালিঘড়ি', গল্প-উপন্যাস-গ্রন্থে। আগার পটভূমিতে ছোটদের জন্য লেখা 'তোতামিয়া' গল্পের কথাবস্তু অবশ্য স্বতন্ত্র।

১৯৯৬-এ প্রকাশিত দুটি ছোট গল্প সংকলন 'এনটারটেইনমেন্ট আওয়ার', আর 'কুত্রোশাওয়া ভিজে যাচ্ছে'। প্রথমটিতে এগারোটি এবং দ্বিতীয়টিতে ন'টি গল্প। এই বছরই প্রকাশিত উপন্যাস 'বালিঘড়ি' আর ছোটদের জন্য গল্পগ্রন্থ 'তোতামিয়া'। দারিদ্রের জন্য মনুষ্যত্ব অসহায়ভাবে বিকৃত হয়—এই বিষয়ভাবনা আমাদের গল্পে প্রচুরই আছে। কিন্তু উপস্থাপনার দক্ষতায় 'এনটারটেইনমেন্ট আওয়ার'-এর "চৌষট্টিকলা" গল্পটি বেশ অভিনব। বেদ্যবাটির কমলা চৌধুরীর বাড়ির দুশো টাকার ভাড়াটে বিধবা শান্তিলতা। একটাই ঘর শান্তিলতার। বেকার দুই ছেলে একজনের বাইশ, অন্যজনের চব্বিশ, বিবাহিতা চাকুরে মেয়ে নমিতা, ছোট্ট নাতনি আর জামাই অশোক—এক ঘরেই রাতে শোয়। খরচ সঙ্কুলান আর বেকার দুই ভাইকে নিয়ে অসহায় মায়ের কথা ভেবে নমিতাকে এই শেওড়াফুলির বাড়িতে একটি মাত্র ঘর ভাসাঠাসি করে থাকতে হচ্ছে। অবশ্য নমিতারা তাদের নতুন ফ্ল্যাটে উঠে যাবে শিগগির। অশোক শেওড়াফুলিতে এলে সহজে বেহালার ভাড়া বাড়িতে ফিরে যেতে চায় না। কিন্তু নমিতার বড় লজ্জা করে। এক ঘরে মা, বড় বড় দুভাই। "বিছানায় শোয়ার পর আর তর সয় না অশোকের।" শান্তিলতা অন্ধকার ঘরে মেঝেয় শুয়ে স্থির জেগে থাকে। দারিদ্রলাঞ্ছিত অসহায় শান্তিলতাকে যেদিন নমিতা একটি টিভি কিনে দেবে বলেছে—সেদিন আলগা ঘুমের ভিতর শান্তিলতার অতৃপ্ত বাসনা যেন টেলিভিশনরূপী দেবতাকে অস্ফুটে উচ্চারণ করে যেতে পারল "হে বাবা টিভি. তোমায় বলি.....নমিতাদের ফ্ল্যাটো তাড়াতাড়ি যেন না হয়। আমার দুটো বেকার ছেলে.....নমিতা যেন আমার এখানে অনেকদিন থাকে, অন্তত যদ্দিন না বাবুটা চাকরি পায়।....ও বাবা টিভি. এরপর খুকির একটি ছেলে—।"

প্রবল দারিদ্রের পাঁকে ডুবে যেতে হবে মেয়ে চলে গেলে,

অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে শান্তিলতা তাই একটিমাত্র ঘরে মেয়ে জামাই-এর দাম্পত্য জীবনে নিত্য নিজের প্রত্যক্ষ উপস্থিতিজনিত মর্মান্তিক গ্লানি ভোগ করে যেতেও প্রস্তুত। তার আকাঙ্ক্ষার প্রতিটি বাক্য ক্রূর বাস্তবের অমোঘ ভাষ্য দাঁড় করিয়ে দেয়।

নানা ধরণের বিষয় নিয়ে কিন্নর রায় লিখেছেন। দারিদ্রের কারণে গরিব মুসলমান শুকুর তার কাল দাঁত উঁচু তিনটি মেয়েকে যথাসর্বস্ব জমিটুকু বিক্রি করেও বিয়ে দিতে পারে না। কেননা পাত্রপক্ষ শুকুরের মেয়েকে দেখতে এসে খেয়েদেয়ে যাবার সময় মুখ দেখানি দিয়ে যায় দশ টাকা। যার অর্থ দাঁড়ায় অপছন্দ। অসহায় শুকুর বোবা যন্ত্রণায় ভিতরে ভিতরে জ্বলে ওঠে। তাই পাত্রপক্ষ চলে যাবার অনেকক্ষণ পরেও সরিয়ে না নেওয়া তাদের চেবানো হাড়, পানের পিক, কুল্লিভরা চিলমচিটি উল্টে দেয়। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে তার তিন অনূঢ়া কন্যার মাকে শুনিয়ে বলে "পায়ের কাছে কেন যে রাখে এসব! উল্টে গেল তো—" আসলে শেষ পর্যন্ত সব দারিদ্রক্লিষ্ট অসহায় মানুষেরা এভাবেই হয়ত ভ্রষ্ট সমাজের থাকগুলিকে উল্টে দিতে চায় মনে মনে, কিন্তু পারেনা—এভাবে পারাও যায় না। তাই সামলে নেয় শেষ অবধি। বাবরি মসজিদ ভাঙার পরিপ্রেক্ষিতে লেখা "বোকাবুড়ো' একটি উজ্জ্বল গল্প। লেখকের সামাজিক এবং নৈতিক দায়িত্বচেতনার নিদর্শন।

'কুরোশাওয়া ভিজে যাচ্ছে' গল্প সংকলনটিতে গল্প আছে নয়টি। প্রথম গল্প 'যক'-এ অবলুপ্তপ্রায় জমিদারবংশের শেষ অবতংস মহান্তিবাড়ির সগরপ্রসাদ কলকাতার পুরনোদিনের আসবাবপত্র কেনাবেচার ব্যাপারী চাঁদু নায়েককে তার বংশের কারুকার্যময় চন্দনকাষ্ঠের প্রাচীন সিন্দুকটি বিক্রি করে। চাঁদু নায়েককে এই সিন্দুকটির খবর এনে দিয়েছিল অসিত সার। সে নায়েককে মহান্তিবাড়ির এক কর্তার দেবী দর্শনের মিথ শোনায়। কীভাবে অষ্টমী পুজোর দিন বিশাল দিঘির লিটলে জলে শাঁখারি ও জমিদারকর্তা শাঁখাপরা হাতের ছোট্ট বালিকারূপী দেবীর দর্শন পেয়েছিল এবং তার পরিণতি দুজনেরই বংশ লোপ।

এই সংকলনের আর একটি উল্লেখযোগ্য গল্প হল 'বোধিসত্ত্ব'। ভন্তে আনন্দশ্রীর নৈতিক বিশ্ব গড়ে উঠেছে বুদ্ধদেবের জীবন ও বাণীর ভিতে। তাঁর 'জ্ঞানোদয় বিহার'-এ বুদ্ধমূর্তির জীবন্যাসের দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করবার জন্য তিরিশ পেরনো সৌম্যকান্তি ভন্তে আনন্দশ্রী "__বিজ্ঞাপন, দালাই লামার আশীর্বাণী, মহাথের, মহাথেরী, শ্রমণদের লেখা ছাপা স্মরনিকায় সিল্ক স্ক্রিনে ছাপা মলাটে বুদ্ধের ছবি, বুদ্ধাদের সংখ্যাতত্ত্ব"—ইত্যাদি কাজে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সমস্ত কাজের মধ্যেও তাঁর চেতনায় সর্বক্ষণ ফিরে ফিরে আসে বুদ্ধের অমৃতময় বাণী, জাতকের কাহিনী, বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান-পতনের ইতিবৃত্ত। জ্ঞানোদয় বিহারে ভন্তে আনন্দশ্রী আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রফেসার অমিতাভ সেন বক্তৃতা দেন। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ। অবশ্য এরই ভেতর আত্মপ্রচারের ব্যবস্থাপনায় ভিক্ষু আনন্দশ্রী যেন কোনও ত্রুটি না করেন সেদিকেও প্রফেসর সেনের সমান আগ্রহ বজায় থাকে। আনন্দশ্রীকে বক্তৃতার আগেও যেমন বলেছিলেন—"আমি বলব, ভালো করেই বলব-হ্যাঁ, টিভি, রেডিও, খবরের কাগজ-কার্ড সবাইকে দেবেন—মিডিয়া পাবলিসিটিটা দরকার—এখন তো মিডিয়ারই যুগ।" বক্তৃতার পরেরও একই সূত্রে বলেন "পাঠিয়ে দাও। সব কাগজে প্রেস রিলিজ পাঠিয়ে দাও। রেডিওতে টিভিতে—আমি ফোন করে দেব'খন।" এবং "ঐ একই সূত্রে—গাড়ি রেডি? আর দেরি করা যাবে না ভাই—" সব মিটে গেলে গভীর রাতে ভিক্ষু আনন্দশ্রী শয্যায় শুয়ে স্মৃতির কুয়াশায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। "তাঁর মনে হলো, আমিও যে আনন্দ। শাক্যমুনি কি আমার সঙ্গেই তাঁর নির্বান-পূর্ব জীবনের শেষ কথাগুলি বলছেন?" 'কর্মকার' চুন্দর দেওয়া বরাহমাংস খেয়ে কীভাবে তথাগতের প্রাণবায়ু নির্গত হল সেই বেদনাময় মুহূর্তের কথা স্মরণ করে ঘুমের মধ্যে ভন্তে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। ভিক্ষু আনন্দশ্রীর অতিমানস চেতনায় প্রোথিত বুদ্ধের প্রতি অনুরাগ আর তাঁর বাস্তববিশ্বের দ্বন্দ্বময় অবস্থানের যোগসূত্রটি কখনও সংগতিপূর্ণ হল না—হওয়ানো যায়ওনা বোধহয়—এই বোধের উদ্ভাসে গল্পটি উজ্জ্বল।

বহু প্রাচিনকাল থেকেই বাঙালির জীবনে কাশীর এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কাশীর বাঙালির জীবনযাপন সম্পর্কে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ব্যাপক। 'বালিঘড়ি' উপন্যাসের ভূমিকা অংশে তিনি সেকথা বলেছেন। প্রত্যক্ষ ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা সঞ্জাত রচনার স্বাদ নিশ্চয় ভিন্ন হবে। কাশীর অলি-গলি, তার পরিবেশ, মন্দির-গঙ্গা—সব কিছুর অনুপুঙ্খ বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে যেসব চরিত্র উঠে আসে তারাও জীবন্ত হয়ে ওঠে।

পণ্ডিত প্রসন্ন বিদ্যাভূষণ অ্যাংলো-বেঙ্গল স্কুল থেকে রিটায়ারমেন্টের পর সামান্য যা টাকা পেয়েছিলেন তাতে তাঁর দুই মেয়ে ও স্ত্রী নিয়ে চালানো মুশকিল। তাই প্রসন্ন বিদ্যাভূষণকে রোজ অসস্থি ঘাটের বড় হাবেলিটিতে আসতে হয় কেরাগ্রন্থ তৈরির কাজে প্রুফ দেখতে। সজ্জন মিশ্র, জর্মানির ফন গুটেন প্রসন্ন পণ্ডিতের কাছে কুলকুণ্ডলিনী, ষটচক্র বৌদ্ধতন্ত্র হিন্দুতন্ত্র সম্বন্ধে জানতে চায়। প্রসন্ন বিদ্যাভূষণ কেবল অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে থাকেন। তাঁর স্মৃতিতে বারবার জেগে ওঠে গোপীনাথ কবিরাজের কথা। কবিরাজ তখন সিগরাতে থাকেন। বিদ্যাভূষণ যেতেন নিয়মিত তাঁর কাছে। কত দেশ বিদেশের গুণীজন আসতেন। মনে পড়ে অনির্বাণজীর কথাও। অতীতের স্মৃতিচারণায় ক্রমে বুঁদ হয়ে যান পণ্ডিত।

বাঙালিটোলার কিউরিওশপের মালিক দিলীপ ভট্টাচার্যও

বৃহৎতন্ত্রসার গ্রন্থের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে তাঁর বাবার স্মৃতিতে ফিরে যায়। ভাবে এই বই তার বাবা ছেনিরাম, ছেনিরামের বাবা ছেদিরামের কাছ থেকে পাওয়া। ছেদিরাম পেয়েছিলেন কার কাছ থেকে? কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের এই বই-এর ছত্রে ছত্রে রহস্য! "ভাবতে ভাবতে বই বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল দিলীপ। __দরজা নড়ছে। খিল কাঁপছে। __পাল্লা ফাঁক হয়ে গেল দিলীপ দেখতে পেল তার দোকানের মেঝেয় পা মুড়ে বসে থাকা পেতলের নন্দীটি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। তার গরম নিঃশ্বাসে দিলীপের গায়ে ফোসকা ফেলে দিতে চাইছিল।" তারপর ঘরের ভিতর ঢুকে তেড়ে আসা পেতলের নন্দী মানুষের গলায় দিলীপের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া চিঠিটি চাইল—যা কাশীনরেশকে লেখা আওরঙ্গজেবের সময়কার কিছু মুঘল শুকুমতের রাজপুরুষের চিঠি। দিলীপকে বিস্মিত করে নন্দী বলে "ইতিহাস কো কুচল ডালো—ও মুসলমানী কা ইতিহাস"। ক্রমে প্রসন্ন বিদ্যাভূষণও লক্ষ করলেন জ্ঞানব্যাপী মসজিদের পাশে হাঁটুমুড়ে বসে থাকা পাথরের নন্দীটিও "মসজিদের সীমানা লক্ষ করে শিঙ নাড়ছে"। তারপর "গঙ্গার বুক থেকে ষাঁড়েরা দল বেঁধে উঠে আসছিল।" তাদের গায়ের রঙ লালচে-গেরুয়া, চোখ লাল। গলায় উচ্চারিত হচ্ছে—'জলাভিষেক। জলাভিষেক।" হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের সংকট জড়ুবাড়ের ক্রিয়ানীল ইমেজের মধ্যে দিয়ে এই ফ্যান্টাসিতে গভীর অর্থবহ হয়ে উঠেছে। সাম্প্রদায়িকতা যে গোপনে গোপনে কী ভয়াবহভাবে দেশের পরিবেশ বিষিয়ে দিয়েছে—কিন্নর রায়ের গল্প-উপন্যাসে এই ভাবনা ফিরে ফিরে আসে।

'তোতামিয়া' ছোটদের জন্য লেখা হলেও এর বিষয়বস্তু উপস্থাপনা এবং বিস্তার যেন বড়দের জন্যই। অত্যধিক কল-কারখানার জন্য পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, ধ্বংস হয়ে যেতে পারে পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য স্মৃতি-সৌধ তাজমহল। তাই পরিবেশ রক্ষাকারীর দল তাজমহলের পাশে বিষাক্ত ধোঁওয়া বেরনো কারখানাগুলি বন্ধ করে দেবার পক্ষে। কিশোর সাইফুর বাবা আগ্রার তাজমহলের পাশে এরকমই একটি কারখানায় কাজ করে। কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে গোটা পরিবারটি কতখানি সংকটে পড়বে সাইফুর বাবার এই দুশ্চিন্তার সঙ্গে কেরাগ্রন্থ তৈরির কাজে প্রুফ দেখতে। সজ্জন মিশ্র, জর্মানির ফন গুটেন প্রসন্ন পণ্ডিতের কাছে কুলকুণ্ডলিনী, ষটচক্র বৌদ্ধতন্ত্র হিন্দুতন্ত্র সম্বন্ধে জানতে চায়। প্রসন্ন বিদ্যাভূষণ কেবল অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে থাকেন। তাঁর স্মৃতিতে বারবার জেগে ওঠে গোপীনাথ কবিরাজের কথা। কবিরাজ তখন সিগরাতে থাকেন। বিদ্যাভূষণ যেতেন নিয়মিত তাঁর কাছে। কত দেশ বিদেশের গুণীজন আসতেন। মনে পড়ে অনির্বাণজীর কথাও। অতীতের স্মৃতিচারণায় ক্রমে বুঁদ হয়ে যান পণ্ডিত।

সাইফুর কল্পনায় তার শোনা ইতিহাসের কিসসা শরীরী অবয়বে ধরা দিয়ে অতীত আর বর্তমানের কালপ্রবাহকে তরঙ্গায়িত করে চলে অবিরত।

কিন্নর রায়ের গল্প-উপন্যাস সেই অর্থে ঘটনাপ্রধান নয়। আরম্ভ এবং সমাপনের মধ্যে ধারাবাহিক কোনও ইতিবৃত্ত থাকে না ঠিকই, কিন্তু ঘটনা এবং চরিত্রের বিস্তার ব্যাপক। ভাষা রুক্ষ। কিন্তু অনেক সময় নিজের আঙ্গিকে নিজেই যেন আবদ্ধ হয়ে পড়েন। এটা ভেঙে বেরিয়ে এলে তাঁর গল্প আরও অনেক বেশি আকর্ষণীয় এবং ক্ষিপ্র হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই।

❑ এনটারটেইনমেন্ট আওয়ার—প্রমা, কলকাতা-১৭ / ৪৫.০০।
❑ কুরোশাওয়া ভিজে যাচ্ছে—সিন্ডিকেট, কলকাতা-৭৩ /৪০.০০।
❑ বালিঘড়ি—দে'জ, কলকাতা-৭৩ / ৩৫.০০।
❑ তোতামিয়া—দে'জ, কলকাতা-৭৩ / ২০.০০।

হিন্দুধর্ম এবং ইসলাম

দেবদাস জোয়ারদার

রামমোহনই আমাদের দেশে প্রথম হিন্দু, ইসলাম এবং খ্রিস্টীয় ধর্মশাস্ত্র ও তার সঙ্গে সম্ভবত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের কিছু অংশের বিশ্লেষণ গভীরভাবে করেন। তিনিই ভারতে আজ পর্যন্ত বোধহয় একমাত্র মনীষী যিনি প্রতিটি প্রধান ধর্মের গ্রন্থ মূলভাষা শিখে পড়েছেন। তারপর তিনি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোচনা করেছেন। অথচ অভিমানের সঙ্গেই লিখছি, মহম্মদ আমীর হোসেন 'ধর্মে হিন্দু ও ইসলাম ও ধর্মাধর্ম' নামে ১৬৩ পৃষ্ঠার বইটিতে কোথাও রামমোহনের উল্লেখ করেননি, তাঁর রচনাটির সাহায্যও নেননি। কিন্তু যে-বিষয়ে তিনি লিখেছেন, তা এই অনন্য মনীষীরই বিচ্ছুত অধ্যয়ন ও গভীর উপলব্ধির বিষয়।

এই অভিমান জানানোর পর লেখকের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি যে শিখণ্ডী ধর্মকে দাঁড় করিয়ে আজকের রাজনীতির বিবাদের যুগে হিন্দু ও মুসলমানের পরস্পরকে জানার পথ তিনি প্রশস্ত করেছেন এমন প্রয়োজনীয় বিষয়ে লেখা বইটিতে। কিন্তু আবার একটি অভিযোগ। চোখে বালি পড়লে যেমন অস্বস্তি হয়, তার চেয়েও বেশি অস্বস্তি নিয়ে ভুল ছাপায়, ভুল বানানে, ভুল শব্দে ভরা বইটির প্রতিটি পৃষ্ঠা কখনও বা প্রতিটি ছত্র আমাদের পড়তে হয়েছে। এত ভুল যে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করলে তার ব্যাপকত্ব বোঝানো যাবে না। তাই সে-চেষ্টা না করে বইটির পরিচয়দানে চলে যাচ্ছি। একজন সাধারণ পাঠক হিসাবে এই পরিচয় দিচ্ছি।

কেননা ধর্ম ও দর্শন—কোনওটারই বিশেষজ্ঞ নই। একই সঙ্গে মহাত্মাগান্ধীর 'হিন্দুধর্ম কী' নামে একটি ছোট্ট রচনা সংকলনের পরিচয়ও দিতে হচ্ছে। এই বইটিতে 'হরিজন', 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় ও অন্যত্র নানাসময়ে গান্ধীজি হিন্দুধর্ম বিষয়ে যে-সব ধারণা ব্যক্ত করেছেন, সে-গুলিই বঙ্গানুবাদে সংকলিত হয়েছে। এখানেও বানান ভুল ও অন্যজাতীয় ভুল কিছু কিছু চোখে পড়েছে।

গান্ধীজির বইটির যোড়শ রচনায় বলেছেন, 'ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকটি মনে থাকলে হিন্দুধর্ম চিরজীবী হবে'। পরের রচনায়ও এই মন্ত্রের কথা আছে। মন্ত্রটি হচ্ছে :—

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্‌॥

গান্ধীজি তার অর্থ করেছেন, 'বিশ্বে আমরা যা কিছু দেখছি, সব কিছুতে ঈশ্বরের সত্তা ব্যাপ্ত।.....একে ত্যাগ করো আর একে ভোগ করো।.....কারো সম্পত্তি লুব্ধ চোখে দেখো না'। বলা বাহুল্য, এ আক্ষরিক অনুবাদ নয়। এ মন্ত্রের মূল কথা এই জগৎ সংসার পরম সত্তার দ্বারা ব্যাপ্ত। ত্যাগের দ্বারা ভোগের কথা এখানে বলা হয়েছে, ভোগ ও ত্যাগের সমন্বয় কাম্য; আর অপরের যা আছে, তার প্রতি লোভ না-করার উপদেশ এখানে উচ্চারিত হয়েছে। এই মন্ত্রের মর্ম ভাববাদী যে-কোনও মানুষেরই স্বীকার করায় আপত্তি বোধহয় উঠতে পারে না। এ যদি হিন্দুধর্মের মর্ম হয়, তাহলে তা মানতে রাজি আছি। কিন্তু মহম্মদ আমীর হোসেনকে গান্ধীজির মতো আত্মোপলব্ধ সত্য শোনালে চলে না। তাই ঐতিহাসিক আলোচনার মধ্য দিয়ে হিন্দুত্ব নির্ধারণের মানদণ্ড তাঁকে স্থির করতে হয়। আর এজন্যই বেদচতুষ্টয়ের প্রামাণিকতা তথা অপৌরুষেয়ত্বের বিশ্বাস, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব, পূজা-পার্বণাদিতে পৌরোহিত্য শুধু ব্রাহ্মণের অধিকার স্বীকৃতি, বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা অনুষ্ঠান, বিভিন্ন উপবাস, উপচার ও নিয়মাদি পালন, ধর্মসংস্থাপনের জন্য স্রষ্টার মানবদেহে অবতারবরূপে আবির্ভাবে ও কর্মফলানুযায়ী জন্মান্তরগ্রহণে বিশ্বাস দেহের অভ্যন্তর অধিকারী শাশ্বত আত্মার অধিষ্ঠান এবং প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত উপাধি, ইন্দ্রিয়ত্ব ও জগৎপ্রপঞ্চের প্রতি আসক্তির নিরসনে আত্মার মোক্ষ, পরমানন্দতত্ত্বে আত্ম ও সর্বশেষে মোক্ষার্থে বর্ণাশ্রম পদ্ধতির মধ্যে ধর্মপালনে নিষ্ঠা—এগুলিকে লেখকের বলতে হয় হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য। একই সঙ্গে তিনি বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন যে হিন্দুধর্ম অন্য ধর্মের প্রচলিত অর্থে যত না ধর্ম তার চেয়েও বেশি জীবনযাপনের একটি পদ্ধতি। হিন্দুধর্মের নানা বিশ্বাসের বৈপরীত্য এবং তার বিমিশ্র চরিত্র বিষয়ে লেখক সচেতন। কিন্তু এসব কথা বলার জন্য জওয়াহরলালের The Discovery of India থেকে ২২ পৃষ্ঠায় মূল ইংরেজিতে ও ৮৩ পৃষ্ঠায় বঙ্গানুবাদে একই উদ্ধৃতি দু'বার দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। বরং এ বিষয়ে রাধাকৃষ্ণনের The Hindu View of Life থেকে এ কথা যথার্থই স্মরণ করেছেন যে হিন্দুধর্ম a way of life উক্ত বইটির ৭৭ পৃষ্ঠায়। তারপরেও তিনি যে-সব বিশ্বাসকে হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য ব'লে নির্দেশ করেছেন তার অনেকগুলি আজকের অনেক সংস্কারমুক্ত হিন্দুর কাছে অগ্রাহ্য মনে হবে। কেননা এখানে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বে, বেদের তৎপৌরুষেয়তায়, কর্মফলানুযায়ী উচ্চ ও নিম্নবর্ণে জন্মলাভে ও বর্ণাশ্রমের মাহাত্ম্যে বিশ্বাসের কথাও বলা হয়েছে।

প্রত্যেক মানুষের রুচি, ঝোঁক, প্রবণতা এক নয়। এই বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে শ্রমবিভাজনের ভিত্তিতে নানা বৃত্তিনির্ভর বর্ণভেদ এক বিশেষ ঐতিহাসিক পরিবেশে ভারতবর্ষে সৃষ্টি হয়েছিল। তাতে জীবিকার জন্য অসম প্রতিযোগিতার অশান্তি থেকে এ-দেশ মুক্তি পেয়েছিল, আর্য ছাড়া অন্যদের মেরে কেটে শেষ করার প্রয়োজন হয়নি, হিন্দু সমাজেই তাদের স্থান হতে পেরেছিল। কিন্তু তার জন্য পূর্বজন্মের কর্মফলভোগের দার্শনিকতত্ত্ব দাঁড় করানোর প্রয়োজন ছিল না। এই প্রয়োজন দেখা দিল সেদিন, যেদিন শূদ্রদের পদবিলত করার জন্য ঘৃণার মনোভাব জেগেছে, যেদিন বর্ণ বৃত্তিভিত্তিক রইল না, হয়ে উঠল বংশানুক্রমিক ও জন্মগত। তখনই জন্মের পিছনে দর্শনের কারসাজি করতে হল। আমেরিকার শ্রোতাদের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ তাঁর Nationalism in India ভাষণে বলেছিলেন যে ভারতবর্ষ মানুষে মানুষে প্রকণ্ডয়, ক্ষমতয় পার্থক্য স্বীকার করেছে, কিন্তু জীবনের মূলনীতি পরিবর্তনশীলতা মেনে নেয়নি। কবির ভাবনার বিস্তর ঘটিয়ে বলতে পারি, ভারতবর্ষ ভুল গিয়েছিল যে গুণ, কর্ম, প্রকণ্ডয়, অন্তর্নিহিত ক্ষমতা—কোনওটাই অনড় ও অচল নয়, ব্রাহ্মণের ছেলে হলেই বিদ্যা নিশ্চিত হয় না, নিম্নবর্ণের ছেলেরও সংবিধান রচনার ক্ষমতা থাকতে পারে। রবীন্দ্রনাথ 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' নামক অসাধারণ মননে ও বিশ্লেষণে উজ্জ্বল প্রবন্ধটিতে লিখেছিলেন, 'বেদে অনার্যদের প্রতি যে বিদ্বষ মাছে তাহার মধ্যে পৌরুষ দেখিতে পাই, মনুসংহিতায় শূদ্রের প্রতি যে একান্ত অন্যায় ও নিষ্ঠুর অবজ্ঞা দেখা যায় তাহার মধ্যে কাপুরুষতারই লক্ষণ ফুটিয়াছে'। এই 'একাণ্ড অন্যায় ও নিষ্ঠুর অবজ্ঞা'র জন্য হিন্দু সমাজকে প্রথম মূল্যশোধ করতে হয়েছে এই অত্যাচারিত মানুষগুলির একটি বৃহদংশের ইসলাম ধর্মান্তর। সামামৈত্রীর বাণী বাহক ইসলাম উচ্চবর্ণের ঘৃণার পাত্র নিম্নবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধদের কাছে পরিত্রাতার বেশে এসেছিল। এ এক ঐতিহাসিক সত্য। বিবেকানন্দ পর্যন্ত এই সত্য স্বীকার করেছেন। বর্ণাশ্রমের নামে এই ঘৃণার জের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও চলছে। এই বর্ণাশ্রমের গোড় ধরে টান দিচ্ছেন গান্ধীজি, এমন রচনা 'হিন্দুধর্ম কী' বইটিতে চোখে পড়েনি। বরং উল্টোটাই চোখে পড়েছে। তিনি চতুর্থ রচনাটিতে বলছেন 'বর্ণাশ্রমধর্মে বৈদিক সংজ্ঞা অনুযায়ী বিশ্বাস করি, এখনকার প্রচলিত বর্ণর সংজ্ঞা অনুযায়ী নয়'। তৃতীয় রচনাটিতে লিখেছেন, 'ওই বিশ্বাসের প্রত্যক্ষ পরিণাম হল জন্মান্তরবাদের মহান্‌ বিশ্বাস। সবশেষে অক্লান্ত সত্যানুসন্ধানের মহান্‌ ফল হল বর্ণাশ্রমবিধির আবিষ্কার', যদিও শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'গান্ধী' বইটিতে পড়েছি যে শেষদিকে নাকি গান্ধীজির বর্ণাশ্রমে বিশ্বাস টলেছিল। বর্ণাশ্রমকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সৃষ্ট কর্মফলানুযায়ী জন্মান্তরের আজগুবি দর্শনের উপর আঘাত হেনেই একমাত্র অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ দূর করার মানসিকতা তৈরি করা যায়। মন্দিরের রুদ্ধদ্বার অস্পৃশ্যদের জন্য উন্মুক্ত করা যায়, অসবর্ণ ও অসবর্ণ বিবাহের মধ্য দিয়ে বদ্ধ রক্তে স্রোতের গতি আনা সম্ভব। শুধু আইন ক'রে আর মানবিকতার দোহাই দিয়ে কোনও কিছুই করা সম্ভব নয়। এ সব কথা একটু বিস্তৃত বলতে হল। কেননা আলোচ্য বইদুটিতেই অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ প্রসঙ্গের বিস্তর ঘটেছে। 'বেদশিক্ষার ঔদ্ধত্যের জন্য রামচন্দ্র এক শূদ্রকে শাস্তি দেন, এ কাহিনীকে আমি প্রক্ষিপ্ত বলে বর্জন করি'—গান্ধীজি এভাবে রামের শম্বুকহত্যার কাহিনীকে বর্জন করলেও বর্ণাশ্রমের ধ্বজাবাহীরা এককালে সমগ্র উত্তরকাণ্ড যেমন প্রক্ষিপ্ত করেছিল, তেমনই বর্তমানে ও ভবিষ্যতেও রামের নামে অনেক অপকর্মে মাতবে, যদি না বর্ণাশ্রমের দার্শনিক ভিত্তির উপর আমরা আঘাত হানি। তবে আমীর হোসেন তাঁর বইটির ৫৫ পৃষ্ঠায় যে বলেছেন হিন্দু সমাজে কোনও অব্রাহ্মণ ধর্মাদোলনে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারেন নি, এ-কথা ঠিক নয়। কেননা আমরা জানি রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ দু'জনের কেউই ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তাদের গাত্রবর্ণও গৌর ছিল না।

আমীর হোসেন হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের আলোচনায় স্বাভাবিক-ভাবেই ধর্ম দু'টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দর্শনের আলোচনাও করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি স্মরণ করেছেন, মধ্যপ্রাচ্যে উদ্ভূত সব ধর্মে Personal God-এর ধারণা স্থান পেয়েছে, বাংলা করেছেন 'ব্যক্তিয়' ঈশ্বর, কিন্তু 'ব্যক্তিয়' শব্দ যদি করতেই হয়, তার বানান হবে 'ব্যক্তীয়', যেমন 'জাতি' থেকে 'জাতীয়'। ইসলামের আল্লাহ সব কিছু সৃষ্টি করলেও তাঁর থেকে কোনও কিছু জাত নয়, তাঁর অংশবিশেষ নয়। একদিকে আল্লাহ, অন্যদিকে জড় ও জীব-উদ্ভিদ—এই ওর্ধে স্রষ্টা ও সৃষ্টি এক নন ব'লেই ইসলাম দ্বৈতবাদী। ইসলামের মতে জগৎ ঈশ্বরজাত বললে তা Blasphemy অর্থাৎ ঈশ্বরনিন্দার সমতুল্য। পক্ষান্তরে হিন্দুমতে ব্রহ্মের প্রক্ষেপই সৃষ্টি। সৃষ্টি আর ইংরেজি Creations এক নয়, বরং সৃষ্টি বলতে যা বোঝায়, তার ইংরেজি projection। হিন্দুমতে শূন্য থেকে জগৎ প্রণয় হয়নি। কিন্তু ইসলাম মতে আল্লাহ্‌ শূন্য থেকে হঠাৎই সৃষ্টির সূত্রপাত করেছেন। তাই ইসলামের বিশ্বাস আল্লাহ বিশ্বাতীত। কিন্তু উপনিষদের ব্রহ্ম একই সঙ্গে বিশ্বানুগ (immanent), আবার বিশ্বাতীত (transcendent)। এখানেই ব্রহ্ম ও আল্লাহ্‌র ধারণার পার্থক্য। আবার লেখক প্রচলিত ইসলামের সঙ্গে সুফীদের পার্থক্যও আলোচনা করেছেন। প্রিয়তম ঈশ্বরের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলাই প্রেমের চরম উৎকর্ষ। সুফীদের মতে এই অবস্থাই ঐশ্রেষ্ঠ বা অদ্বৈতানুভূতি। এ প্রেমের শেষ পরিণতি 'আ'নাল হক', আমিই সেই সত্যস্বরূপ এই উচ্চারণে। আ'নাল অব্দ-আমি তাঁর দাস-এ পরম উপলব্ধি নয়। সুফীবাদে অদ্বৈতবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ভক্তিবাদ বা প্রেমতত্ত্বের মিলন ঘটেছে। মনসুর হাল্লাজকে সুফীবাদ প্রচারের অপরাধে পায়ে দড়ি বেঁধে ডালে ঝুলিয়ে জীবন্ত অবস্থায় গায়ের চামড়া ছাড়ানো হয়। এমনই বর্বর নিষ্ঠুরতা! অথচ কোরানে প্রত্যেকের নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে, ১০৯নং সুরায় স্পষ্ট বলা হয়েছে—'তোমাদের ধর্ম তোমাদের, আমার ধর্ম আমার (কাছে)'। কিন্তু ইসলাম প্রচারের অত্যুৎসাহে এই সত্য অনেক মুসলমান বিস্মৃত হয়েছেন। হযরত মহম্মদ নিজেও বলেছিলেন, 'সাবধান! ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করো না। এই বাড়াবাড়ির জন্য অতীতে বহুজাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে'। হযরত ঈশ্বরের নির্বাচিত পুরুষ। এই অর্থে তিনি নবী। তিনি হিন্দুর অবতার নন। প্রচলিত ইসলাম-মতে তিনি শেষ নবী। ইসলামের দ্বৈতবাদী ধারণার সঙ্গে মেলে না—এমন কিছু আয়াত কোরানের মধ্যেই আছে। সেগুলিই সুফী-ধারণার উৎস। ইএসব আয়াতের অনুবাদ নাকি আমাদের দেশে অনেকে না-না করে দায়সারাভাবে করেছেন। তাঁদের সম্পর্কে লেখক বলেছেন, 'এ অনিচ্ছাকৃত ভুল, না, বুদ্ধির রাজ্যে কাকুপি, তা বলা মুশকিল'।

তিনি ইসলামে নারীর স্থান, বিবাহ, উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ইসলামের সাম্যের আদর্শের কথায় তিনি লিখেছেন, হযরতের সময় একই মসজিদে নারী ও পুরুষের একত্রে নামাজ পড়ার রীতি আছে, এখনও মক্কার কাবা শরীফে তা হয়। যদিও আমাদের দেশে কাশীরে হযরত বাল মসজিদে নারীদের নামাজ পড়ার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছাড়া অন্যত্র মসজিদে নারীর প্রবেশ নিষিদ্ধ। মহম্মদ এক কামী ক্রীতদাসকে পুত্রস্নেহে লালনপালন করেন। এক নিগ্রো ক্রীতদাসকে তাঁর মালিকের কছ থেকে অর্থমূল্যে ছাড়িয়ে এনে তিনি পৃথিবীর প্রথম মসজিদের আজান আহ্বানকারী মোয়াজ্জীন নিযুক্ত করেন। নিগ্রো ক্রীতদাস বেলালকে তিনি সেই পরম সম্মান দান করলেন। এই হচ্ছে ইসলামের উদারতার দুই আদি দৃষ্টান্ত। লেখক যেমন ইসলামের সাম্যের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তেমনই নির্মোহ মনে বৈষম্যের কথা বলতেও ছাড়েননি। ইসলামে বিবাহ চুক্তি-দুই নরনারীর চুক্তি। কিন্তু এই চুক্তি ভেঙে তালাক দেওয়ার অধিকার একমাত্র পুরুষকেই দেওয়া হয়েছে, নারী সেই অধিকার পায়নি। পিতা অথবা স্বামীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার দেওয়ায় নারীকে সেকালে নিশ্চয়ই এক দুর্লভ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানেও দেখি নারীর প্রতি বৈষম্য। ধরা যাক, একজন মুসলমান তাঁর এক

স্ত্রী, দুই পুত্র ও তিন কন্যা রেখে মারা গেলেন। তখন স্ত্রী ১/৮, দুই পুত্রের প্রত্যেকে ২/৮ এবং তিনকন্যার প্রত্যেকে ১/৮ অংশ সম্পত্তি পাবেন। প্রথমা স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে একসঙ্গে চারজন মহিলাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণের অধিকার ইসলামে স্বীকৃত হলেও বারবার সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে, একাধিক স্ত্রীর প্রতি সুবিচার বিষয়ে আশঙ্কা থাকলে কখনওই তা করা উচিত নয়। সেকালের আরবে যুদ্ধে অনেক পুরুষ নিহত হলে সমাজে পিতৃহীনা কন্যা ও বিধবার সংখ্যাধিক্য ঘটেছিল। তাই সেইযুগের প্রয়োজনে বহুবিবাহ স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু এই বহুবিবাহ ভিন্ন দেশেও কালে যেখানে নারী সংখ্যায় এত বেশি নয়, সেখানেও কেন স্বীকৃত হবে, তার বোধগম্য ব্যাখ্যা ইসলামে নেই ব'লে লেখক জানিয়েছেন। মুসলিম বহুবিবাহ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে করতে আজকের ভারতের একটি স্পর্শকাতর সমস্যায় এসে লেখক পৌঁছেছেন। তাঁর মতে অর্থনৈতিক পটভূমি ও মননশীলতার পরিবর্তন না করে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সমরূপ বিবাহ আইন প্রচলন করলে বিশৃঙ্খলা ও যন্ত্রণার কারণ হতে পারে। এখানে হিন্দুদের উত্তরাধিকারে ও আয়করু আইনের বৈষম্যের কথা বলেছেন। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সংখ্যালঘু মুসলিম সমাজ যদি ঘেটো সাইকোলজির গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে সম্পূর্ণ মিশে যায়, তাহলে মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের পথ সুগম হতে পারে ব'লে লেখক বিশ্বাস করেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, রাজনীতি ব্যবসায়ীরা কি তা হতে দেবে? সমরূপ বিবাহ আইন করলে রাতারাতি বহুবিবাহ বন্ধ হবে না, যেমন বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের ফলে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হলেও সমগ্র হিন্দুসমাজ বিধবা বিবাহ মেনে নেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের বিধবাবিবাহ আইনের বিরোধিতার কথা লেখক বলেছেন। যতদূর জানি, বঙ্কিম আইন ক'রে কিছু হবে না বলে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু আইন করে বিশ্বে অভূতপূর্ব কিছু না হলেও মননকে নতুন ভাবনায় জাগানো যায়। তাতেই বা কম লাভ কী। পুকুরপাড়ে বসে অন্যদের সাঁতার দেখে সাঁতার শেখা যায় না। জলে নেমেই সাঁতার শিখতে হয়। আইন করলে জলে নামার সুযোগ ঘটে।

লেখক মহম্মদ আমীর হোসেন নিষ্ঠা ভরে বইটি লিখেছেন, অনেক দার্শনিক প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। আমরা তাঁর আলোচনার অনেকটারই ধারণা দিতে পারিনি স্থানাভাবে, যদিও এরই মধ্যে বেশ কিছু জায়গা দখল করেছি। গান্ধীজির 'হিন্দুধর্ম কী' বইটির পরিচয় আরও কম দেওয়া হল। কিন্তু এক জায়গায় ছেদ টানতেই হয়।

❑ **ধর্মে হিন্দু ও ইসলাম ও ধর্মাধর্ম**—*মহম্মদ আমীর হোসেন* / শরৎ পাবলিশিং, কলকাতা-৯ / ৫০.০০।

❑ **হিন্দুধর্ম কী?**"—*মহাত্মা গান্ধী* / ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, দিল্লি /২৯.০০।

প্রসঙ্গ ঃ 'হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ভাল করার উপায়'

শৈলেন্দ্র নাথ ঘোষ

চতুরঙ্গের ভাদ্র সংখ্যায় আমার বিশেষ সমালোচনা-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এটি স্রেফ ড. নজরুল ইসলামের 'হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ভাল করার উপায়' পুস্তকের সমালোচনা ছিল না। সমালোচনা নিবন্ধ (Review Article) বলার অর্থই হচ্ছে পুস্তকের সমালোচনা এবং তদুপরি প্রসঙ্গসূত্রে সমালোচকের নিজস্ব নিবন্ধ।

ড. নজরুল ইসলাম যে কি পরিমাণে সমালোচনা-অসহিষ্ণু তার প্রমাণ পাওয়া গেল চতুরঙ্গের পৌষ ১৪০৩ সংখ্যায় তাঁর তথাকথিত জবাবের মধ্যে। তিনি সমালোচনাটি ভালভাবে পড়েও দেখেননি।

আমি লিখেছিলাম ঃ "স্বাধীনতার পূর্বযুগে *অবিভক্ত ভারতে অন্যান্য প্রদেশের* হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের উত্থাল-পাথাল, ঘাত-প্রতিঘাত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে অবিভক্ত বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের বিশ্লেষণ কি সম্ভব?" আমার বক্তব্য ছিল উত্তরপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বাদ দিয়ে বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক-বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। তিনি 'কি সমালোচনার কি জবাব' দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তাঁর পূর্ববর্তী গ্রন্থে তিনি *বাংলার* হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত *বাংলার* হিন্দু-মুসলমান সমস্যার পর্যায়গুলো বিশ্লেষণ করেছেন, *'পূর্ব পাকিস্তান'* অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ থেকে *বাংলাদেশ*, অধ্যায় সংযোজিত করেছেন, আবার দ্বিতীয় গ্রন্থের শুরুতে *বাংলায়* হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়েছেন ইত্যাদি। এসব অবান্তর বক্তৃতা। বঙ্গভাষীদের এলাকার বাহিরে যে তিনি একেবারেই যাননি, তা তাঁর নিজের বক্তৃতাতেই সুপ্রকাশ।

দ্বিতীয়ত আমার প্রশ্ন ছিল ঃ "হিন্দু উচ্চবর্ণের উন্নাসিকতা তো ছিল প্রধানত তথাকথিত শূদ্রবর্ণের বিরুদ্ধে, তাহলে শূদ্রবর্ণের মধ্যে *এ ধরণের বিচ্ছিন্নতাবাদ* এল না কেন?" এখানেও তিনি সমালোচকের প্রশ্নটি বুঝবার চেষ্টামাত্র করেননি। শূদ্রবর্ণের মধ্যে alienation ছিল কিন্তু separation ছিল না। শূদ্রবর্ণের মধ্যে কেউ বলেননি যে 'এ দেশে একসঙ্গে বসবাস করা অসম্ভব, শূদ্রবর্ণের জন্য পৃথক homeland চাই'। "*এ ধরণের* বিচ্ছিন্নতাবাদ" কথাটির অর্থ—যদি তিনি বুঝতে চাইতেন, তাহলে অর্থপৃষ্ঠাব্যাপী অপ্রাসঙ্গিক জবাবের কোনও প্রয়োজন হত না।

তৃতীয়ত, হজরত মহম্মদ সম্বন্ধে উক্তিটি বর্তমান সমালোচকের নিজস্ব মন্তব্য হিসাবে স্পষ্ট ছিল। সেখানে গ্রন্থকার অহেতুক বলতে গিয়েছেন, "আমি জোর দিয়ে বলছি, আমার গ্রন্থের কোথাও এটা মেনে নেওয়া হয়নি।" যেখানে হজরত মহম্মদের কথা লেখা হয়েছে, তার পূর্ববর্তী দুই পৃষ্ঠা এবং পরবর্তী দুই পৃষ্ঠার মধ্যে কোথাও তাঁর কোনও লেখার কোনওই উল্লেখ ছিল না। সমালোচক নিজস্ব বক্তব্য বলার আগেই বলে নিয়েছিল "মুসলমান বিচারধারায় যে সংস্কার একান্ত আবশ্যক.....সেই প্রসঙ্গগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এক্ষণে আলোচনা করার চেষ্টা করব। ড. নজরুল ইসলাম তাঁর পুস্তকে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি অন্তর্ভুক্ত না করার ফলেই বর্তমান প্রবন্ধকারকেই এই কর্তব্য সম্পাদন করতে হচ্ছে।" যে বক্তব্যের দায়িত্ব সমালোচক প্রথম থেকেই নিজের উপরে পুরোপুরিভাবে নিয়েছে, সেখানে 'এটা তার (অর্থাৎ সমালোচকের) স্বপ্নলব্ধ সত্য হতে পারে, (লেখকের) গ্রন্থবদ্ধ সত্য নয়", এ সব কথা বলে খামোখা ঝাল ঝাড়তে আসায় আবার বোঝা গেল, তিনি সমালোচনার ধারাটাই অনুসরণ করার কোনও চেষ্টাই করেননি। সমালোচনা পেলেই কি এত ক্ষিপ্ত হতে হয়? ড নজরুল ইসলাম আরও জেনে রাখুন, বর্তমান প্রবন্ধকার হজরত মহম্মদ সম্বন্ধে ইসলামী গোঁড়ামির ভাষ্যকেও যে নতুন যুক্তি দিয়ে মেনে নিতে প্রস্তুত, অ-মুসলমান সম্প্রদায়সমূহ যদি সেই যুক্তিকে গ্রহণ করেন, তবে তার মধ্যে আছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সম্ভাবনা। না, ড. ইসলাম, এটা স্বপ্নের ঘোরে পাওয়া সত্য নয়, জীবনের মহাপরীক্ষায় সাম্প্রদায়িক মিলনপ্রয়াসের বেদনামথিত চিন্তন-প্রসূত সত্য।

চতুর্থত, গ্রন্থকার বলতে চেয়েছেন, ওহাবী-ফরাজী আন্দোলন ছিল, ধর্ম-সংস্কারের আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক নয়। তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, 'বিশুদ্ধ ইসলামের' নামে ভারতে এই যে আন্দোলন, তার

সংজ্ঞাতেই কি বলা হয়নি যে মুসলমানদের হাতে রাষ্ট্রব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে না পারলে বিশুদ্ধ ইসলাম অসম্ভব? এই আন্দোলন ব্রিটিশকে তাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে কি অ-মুসলমান জনতাকেও শরিয়তী ব্যবস্থার আওতায় আনতে চায়নি? "দার-উল-হারব"-এর কি সংজ্ঞা তাঁরা দিয়েছিলেন? ড. ইসলাম 'ক্যালকাটা রিভিউ' থেকে এক উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে শিখরা তখন পাঞ্জাবের মুসলমানদের উপর উৎপীড়ন করত এবং স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মপালনে বাধা দিত। যেটা তিনি বলেননি, তা হচ্ছে ওহাবীদের 'দার-উল-হারব' সম্পর্কিত ধারণা। 'বিধর্মী শাসিত দেশ বিবেচনা করে শিখকে উৎখাত করে শরিয়তী ব্যবস্থা চালু করতে হবে, আর এই জেহাদ সফল না হলে কোনও মুসলিম-শাসিত দেশে স্বাধীনভাবে চলে যেতে হবে', এই যেখানে মূল কথা, সেখানে শিখরা বা অন্য অ-মুসলমান সম্প্রদায়গুলি আতঙ্কিত হবে না? কোরাণের মর্মবাণী "Oneness of all creation"। এই মর্মবাণী উপেক্ষা করে যারাই ধর্মসংস্কার করতে চেয়েছে, তারাই সাম্প্রদায়িক আগুন জ্বালিয়ে তুলেছে। তার ফলে নিজেদের উপরও উৎপীড়ন ডেকে এনেছে।

পঞ্চমত, বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' ও 'আনন্দমঠ' উপন্যাসদ্বয় থেকে dialogue উদ্ধৃত করে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন, বঙ্কিম ছিলেন কট্টর সাম্প্রদায়িক। উপন্যাসের dialogue সমকালীন সমাজের ধ্যানধারণার, পরস্পরের প্রতি মনোভাবের বাস্তব রূপায়ণ। তা ঔপন্যাসিকের নিজস্ব ধারণার প্রতিফলন নয়। কথোপকথনগুলি যদি ঔপন্যাসিকের নিজস্ব ধ্যানধারণা বলে মেনে নিতে শুরু করি, তাহলে উপন্যাসে অপ্রীতিকর-অথচ-বাস্তব কথোপকথন অর্থহীন হবে। সাহিত্যিক মীজানুর হোসেন এবং আরও অনেকে এই প্রকার dialogue-কে সাহিত্যিকের অভিমত বলে সিদ্ধান্ত করার বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেছেন। উদ্ধৃত অংশে মুসলিম বিরোধী যে সব ঝাঁঝালো বক্তব্য আছে, তার মধ্য দিয়ে লেখক হুঁমায়ুনীদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ রচনা করতে চেয়েছেন, এ ধারণা করাও অসমীচীন নয়। গ্রন্থকার ঘোষণা করেছেন "একমাত্র মুসলমান-বিদ্বেষী হিন্দু সাম্প্রদায়িক মনে (বঙ্কিমচন্দ্রের) লেখা পড়লে অসাম্প্রদায়িক মনে না হতে পারে। না হলে নয়।" লেখক তো ইতিপূর্বে বঙ্কিম-শরৎ-রবীন্দ্রনাথ-রজনীশীল-রামকৃষ্ণ পরমহংসকে সাম্প্রদায়িক বলে ঘোষণা করেছেন। সে তুলনায় বর্তমান সমালোচক তো চুনোপুঁটি। তবুও এইটুকু বলার স্পর্ধা রাখে যে বহু বিস্তৃত অঞ্চলে মুসলমান জনতার মধ্যে বর্তমান সমালোচকের যে ভাবমূর্তি আছে, তাতে গ্রন্থকারের দেওয়া bad certificate কিছুই দাগ কাটতে পারবে না। বোধ হয়, গ্রন্থকারের বিচারে স্বর্গত রেজাউল করিমও "মুসলমানবিদ্বেষী হিন্দু সাম্প্রদায়িকের" এজেন্ট ছিলেন কারণ তিনিও বঙ্কিমচন্দ্রকে সাম্প্রদায়িক বলে মানতে পারেননি।

সমালোচনা-নিবন্ধে আমি বলেছিলাম "বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা খোলা মনে পড়লে ড. ইসলাম যে অর্থ আরোপ করেছেন, তা করা যায় না। "বঙ্কিমচন্দ্র 'হিন্দুজাতি'র কথা লেখায় অনেক ভুলধারণার উৎপত্তি হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র যে অর্থে 'হিন্দুজাতি' শব্দ প্রয়োগ করেছিলেন, তা হচ্ছে হিন্দু সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় গঠিত nation. চিলোঢালাভাবে সেদিনের পরিভাষায় তাকে 'হিন্দুজাতি' বলাই স্বাভাবিক। এই "জাতি" আর "জাতপাতের জাত"—এই দুইয়ের মধ্যে দূস্তর ব্যবধান। "আত্মজাতির মঙ্গল সাধনে বিরত হইব না; পরজাতির অমঙ্গল সাধন করিয়া যদি আত্মমঙ্গল সাধন করতে হয়, তাহাও করিব। জাতিপ্রতিষ্ঠার এই দ্বিতীয় ভাগ" বঙ্কিমের এই উক্তি জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে জাতিগঠন সম্বন্ধে শিক্ষা। এই "পরজাতি" মুসলমান নয়—ব্রিটিশ, ফরাসি, রাশিয়ান ধরণের জাতিসমূহ। যেহেতু বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজ সরকারের অধীনে চাকুরি করতেন, সেহেতু লেখক ধরেই নিলেন, "ইংরাজ শাসনের অস্তিত্বের সঙ্গেই যাঁদের অস্তিত্ব আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা", তাঁরা নিশ্চয়ই ইংরাজকে এই পরজাতি ঘোষণা করার স্পর্ধা রাখবেন না, সুতরাং এই 'পরজাতি' নিশ্চয়ই মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি উল্লেখ"। এ সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। যে-বঙ্কিমচন্দ্রকে ইরাজদের বিরুদ্ধে মেরুদণ্ডহীন ভেবে লেখক এই সব কথা বলেছেন, সেই বঙ্কিমচন্দ্রই উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে—"আনন্দমঠ" রচনার-ও পূর্বে 'জাতিবৈর' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'যতদিন জাতিবৈর আছে, ততদিন প্রতিযোগিতা আছে। বৈরভাবের কারণেই আমরা ইংরেজদিগের কতক কতক সমতুল্য হইতে যত্ন করিতেছি।' এটি ইংরাজদিগের প্রতিও বৈরভাব পোষণের প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা।

বঙ্কিম জানতেন, ইতিহাস সর্পিল গতিতে চলে। তাই রাজা রামমোহন রায় যে-ভাবে মোগল শাসনের অবসানকে স্বাগত জানিয়ে ভারতে ইংরাজ রাজত্বের প্রগতিশীল ভূমিকা দেখেছিলেন, যেভাবে Karl Marx ইতিহাসের এক অধ্যায়ে ধনতন্ত্রবাদের প্রগতিশীল ভূমিকা দেখেছিলেন, অনুরূপভাবে বঙ্কিমচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজ শাসনের আপাতঃ স্থায়িত্ব প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তার মধ্যে আপেক্ষিক উন্নতির সম্ভাবনা দেখেছিলেন। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বশীভূত না হয়েও এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ সম্ভব। তদুপরি "মোগল শাসনে শুধু হিন্দু-মুসলমান সমন্বয় ঘটেই চলেছিল; হিন্দুদের উপর উৎপীড়ন ছিল না" এই ধরণের মেকি secularist stand ইতিহাসের সাক্ষ্যবিরুদ্ধ। বঙ্কিম-মানস বিচার হবে সামগ্রিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে।

আমাদের দেশে এক ধরণের মেকি প্রগতিবাদী আছেন, যাঁরা এই মনগড়া কল্পনায় দৃঢ় যে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদ হচ্ছে হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদের প্রতিক্রিয়া। আমার সমালোচনা নিবন্ধে আমি দেখিয়েছিলাম কীভাবে হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদের বহু পূর্বে ষোড়শ শতাব্দীতে মুজাদ্দিদী আন্দোলন ও ইসলামী পুররভ্যুত্থানবাদের ঢেউ

উত্তর ভারতে বিপুর লাভ করেছিল। সৈয়দ আব্বাস রিজভী প্রণীত "Muslim Revivalist Movements in Northern India in the Sixteenth and Seventeenth Centuries" পুস্তকের মুখবন্ধে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অধ্যাপক মহম্মদ হবিব লিখেছেন: শেখ আহমদ শিরহিন্দের পুনরভ্যুত্থানবাদী আন্দোলন ছিল সর্বাপেক্ষা স্পর্ধিত। "Saikh Ahmad wanted the worst possible treatment to be meted out to the Hindus, they were to be dismissed from all Government posts and insulted and injured on every possible occasion.....the Sirhindi Shaikh wanted (the Hindus') religious freedom to be suppressed...The Shaikh, being a fanatic Sirhi, wanted almost the same intolerant treatment for the Shias, whom he hated bitterly.....The Mujaddid condemned the decades of Akbar's reign". এই বিষময় আন্দোলনের কিছু প্রভাব আওরঙজেবের রাজত্বের শেষকাল পর্যন্ত ছিল।

বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের বদলে ভাসা-ভাসা সিদ্ধান্তের উপর দাঁড়িয়ে বহু শতাব্দীব্যাপী সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হয় না, এ কথা বৃদ্ধতে গ্রন্থকারকে অনুরোধ করি। তাঁর শুভবুদ্ধির তারিফ আমি ভাল সংখ্যাতেই করেছি। তাঁর অসহিষ্ণুতা এবং চটজলদি সিদ্ধান্তের প্রবণতা তাঁর এই ইতিবাচক দিকটি সম্বন্ধে আমাকে অনবহিত করে না।

এবার অন্য কথায় আসি। আমার প্রথম সমালোচনা নিবন্ধে হিন্দুত্বের ধ্বজাধারীদের আত্মবিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে আমি এক বক্তব্য রেখেছিলাম। প্রবন্ধটির কলেবর সংক্ষেপ করার প্রয়োজনে সম্পাদক মহাশয় সে অংশটি বাদ দিয়েছিলেন। আজ সে কথার উল্লেখ করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমি লিখেছিলাম ঃ—

"হিন্দু সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী বলে যাঁরা দাবি করেন, তাঁদের পক্ষে প্রয়োজন এই আত্মজিজ্ঞাসা ঃ এ কথা কি অস্বীকার করা যায় যে বিরাট শান্তশ্রীমণ্ডিত সত্ত্বেও বহু শতাব্দী ধরে ভারতীয় সমাজে বিপুল অসাম্য বিরাজ করছিল এবং পশ্চিম এশিয়া থেকে ছুটে আসা ইসলামী সংস্কৃতির প্রবল প্রভাবে ভারতে ভক্তিবাদী আন্দোলন জেগে উঠেছিল? আরও প্রশ্ন, যে-সংস্কৃতি শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব ধর্মের পৃথক সত্তা বজায় রেখেই সমন্বয় ঘটিয়েছিল, জৈন-বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা গ্রহণ করে বহুলাংশে ব্রাহ্মণ্যবাদের সংশোধন করতে সক্ষম হয়েছিল, বেদ-উপনিষদের প্রভাব-বহির্ভূত রামানুজ, নিম্বার্ক, মাধবাচার্য, বল্লভাচার্য, শ্রীচৈতন্য, শঙ্করদেবের শিক্ষাকে আত্মস্থ করে 'সর্বজীবে, সর্বস্তরে প্রেম' ও ভক্তির বন্যা বহিয়ে দিতে পেরেছিল, সে কি ইতিহাসের এক পর্যায়ে এসে আবার নিশ্চল হয়ে পশ্চাৎগতি নিয়েছিল? যে সংস্কৃতি উত্তর ভারতে লৌকিক স্তরে কবীর, রবীদাস, তুকারাম, নামদেব, নানক, দাদু, রজ্জব, সুন্দরদাস, লালেশ্বরী, নন্দশ্বরি (শেখ নুরুদ্দিন) এবং দক্ষিণ ভারতে বহু শতাব্দী ধরে নয়নমার ও আলোয়ার-দের জন্ম দিয়ে বিশ্বের বিস্ময় এক সমন্বয়ী সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল, সে কেন ওয়াহবী বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রতিরোধ করতে পারল না? কেন সে প্রেমের কন্যায় ভারত, আরব ও অন্যান্য দেশে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের পৃথক সত্তা বজায় রেখেই সমন্বয় ঘটাতে পারল না? কি দুর্বলতা ছিল তার আপনার মধ্যে?

হিন্দু-মুসলমান ঐক্য জাতীয় জীবনে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই ড. নজরুল ইসলামের আত্মশ্লাঘী বক্তব্যের উত্তরে সীমিত না থেকে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমস্ত বাংলাভাষী ও সমস্ত ভারতবাসীর সামনে এই আত্মজিজ্ঞাসার নিবেদন রাখলাম। সেই সঙ্গে ড. নজরুল ইসলামের কাছে এক বিশেষ নিবেদন রাখছি। তিনি তাঁর জবাবের সমাপ্তিবাক্যে বলেছেন ঃ 'দেশের লোকেদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদভাবকে হ্রাস করতে হলে প্রকৃত সেকুলার শাসন প্রবর্তন করতে হবে।' সেকুলার শাসন প্রবর্তন করতে হলে প্রচলিত কী কী ব্যবস্থা ও আচারব্যবহার বন্ধ করতে হবে এবং তৎপরিবর্তে কী কী ব্যবস্থা ও আচারব্যবহার চালু করতে হবে, সে সম্বন্ধে তাঁর নিজের ধ্যানধারণা যদি আরও স্পষ্ট করে ও বিশদভাবে বর্ণনা করেন তাহলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্পর্কে আলোচনা আরও একধাপ এগিয়ে যেতে পারে। অবরুদ্ধ আবেগের জট খোলাও অগ্রগতির এক অপরিহার্য ধাপ।

প্রসঙ্গ 'মৌলবাদ ঃ এক নতুন সংজ্ঞা'

চতুরঙ্গের পৌষ ১৪০৩ সংখ্যায় সমালোচিত আমার 'মৌলবাদ ঃ এক নতুন সংজ্ঞা' বইটির মূল প্রসঙ্গ হল ঃ কীভাবে ইউরোপে উদ্ভূত প্রটেষ্টীয় খ্রিস্টনীতি আমেরিকায় এসে মৌলবাদে পরিণত হয় ও পরে দেশে দেশে নানা রূপে মৌলবাদের তাৎপর্য প্রসারিত হয়। আমার ধারণা WASP তথা মার্কিন মৌলবাদের উপর আমার লেখাই বাংলায় প্রথম। এই সূত্রে পুলকনারায়ণ লিখেছেন, "মৌলবাদ" নতুন শব্দ। সুতরাং যে কোনও সংজ্ঞাই যে কেউ দিতে পারেন এবং তা নতুন বলে গৃহীতও হবে।' না, সম্পাদক মহাশয়, 'মৌলবাদ'-এর যে-কোনও সংজ্ঞা যে কেউ দিতে পারেন না, তবে অজ্ঞতাবশত যদি কেউ দেন তাহলে তা অগ্রাহ্য করা উচিত। এই সঙ্গে বলি যে আধুনিক বাংলায় 'সংজ্ঞা'র অর্থ 'চেতনা' বা Concept আর 'সংজ্ঞার্থ'র অর্থ 'পারিভাষিক অর্থ' বা definition.

অধ্যাপক ধর অন্যত্র লিখেছেন, 'আসলে "মৌলবাদ" শব্দটি ব্যবহার করবার দায়বদ্ধতা থেকেই কিন্তু এর ব্যাখ্যার জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। কোনও না কোনওভাবে কিন্তু মানুষ প্রাচীন কাল

থেকেই ধর্মের সংকীর্ণতা ইত্যাদি ঝোঁকের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছে। সক্রেটিস, কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, টমাস হবস—এঁদের কথা ভুলে গেলেও গান্ধীজি, মার্টিন লুথার এবং সাম্প্রতিক কালের নেলসন ম্যান্ডেলাকে ভুলে যাওয়ার সময় এখনও হয়নি। তাঁরা কিন্তু এই ধরণের "শব্দজব্দে"র ভুলভুলাইয়াতে ঘুরপাক খাননি। অথচ লড়াইটা ছিল আধুনিক "মৌলবাদ"র বিরুদ্ধেই।' না, সম্পাদক মহাশয় একেবারেই নয়। সত্রুটিসম অস্বচ্ছ চিন্তা ও বিদ্যার ভানের ফলে দায়বদ্ধহীন ভাবে শব্দের শিথিল প্রয়োগের বিরুদ্ধে লড়াই করে সরকারি পণ্ডিতদের শত্রুতে পরিণত করেছিলেন। আর মার্টিন লুথার? আমার গ্রন্থের ভূমিকার শুরুতেই অক্সফোর্ড ও ওয়েবস্টার অভিধান দুটির উল্লেখ করেছি। দুটি অভিধানেই fundamentalism-এর অর্থ দিয়েছে যে এটি প্রটেস্টান্ট খ্রিস্টনীতির আজ্ঞাবলি উৎসারিত একটি আন্দোলন; এই খ্রিস্টনীতির প্রথম প্রবক্তাই মার্টিন লুথার যিনি ১৫২৫ সালে কৃষকদের বিপক্ষে ও শাসকদের পক্ষে ধর্মকে ব্যবহার করেছিলেন। নেলসন ম্যান্ডেলা তাঁর racialism-এর বিরুদ্ধে আন্দোলনকে anti-apartheid বলে চিহ্নিত করেন। অধ্যাপক ধর পাঁচটি বাক্যে তিনটি 'কিন্তু' ব্যবহার করে যেমন কিঞ্চারবুদ্ধিহীন ভাবে সাত ব্যক্তির নাম এক সঙ্গে এক দলভুক্ত করেছেন এবং অভিধান ও গ্রন্থাগারের গ্রন্থাবলির মধ্যে সংজ্ঞার্থ ও সংজ্ঞা সন্ধানকে যেভাবে 'ভুলভুলাইয়াতে ঘুরপাক' খাওয়া বলে উপহাস করেছেন তার পশ্চাতে নিহিত মন, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রকাশ 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার পৃষ্ঠায় এই প্রথম দেখলাম।

সবশেষে সমালোচনাটির প্রথমাংশের একটি বাক্যে আসি : 'কে না জানে যে কোনও বিষয়ে বিতর্কের গন্ধ পেলে উন্নাসিক বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের আর পায় কে?' মনে করিয়ে দিই যে সক্রেটিস প্রশ্নোত্তরের বা বিতর্কের মাধ্যমেই সত্য সন্ধান করতেন। এবং তাঁর উঁচু নাক সম্বন্ধে কেউ মন্তব্য করলে তিনি বলতেন যে তাঁর নাক স্বর্গাভিমুখী। দুর্ভাগ্যবশত আমি নিম্নমুখী নাকওয়ালাদের সাহচর্য উপভোগে অক্ষম।

পাদটীকা : WASP : White Anto-Saxon Protestant/ Presbyterian এখানেও অভিধান দুটির উল্লেখমাত্র করলাম—এই চিঠির সঙ্গে পাঠাতে পারলাম না বলে দুঃখিত।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

'মৌলবাদ : এক নতুন সংজ্ঞা'----সমালোচকের উত্তর

'মৌলবাদ : এক নতুন সংজ্ঞা' বই-এর লেখক শ্রীসুরজিৎ দাশগুপ্ত মহাশয়ের চিঠি পড়ে মনে হল তিনি আমার ওপর যারপর নাই ক্ষেপেছেন।

গ্রন্থ সমালোচনার সূত্রে স্বয়ং গ্রন্থকারের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া বিশেষ দম্ভ বলেই মনে হয়। এই দম্ভ মাথা পেতে না নিয়ে উপায় নেই কারণ সুরজিৎ দাশগুপ্তর মতন বিবিক্ত ও বিবুধ ব্যক্তির চিঠি তো উপেক্ষণীয় নয়।

তাঁর গ্রন্থের সমালোচনায় আমি যা লিখেছিলাম সেই কথার পুনরাবৃত্তি করেই বলছি—

আমেরিকায় 'মৌলবাদ'-কে ভারতের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করতে গিয়ে তিনি যে-কোনও কারণেই হোক বিষয়টি জটিল ও অস্বচ্ছ করে ফেলেছেন। পাঠক হিসাবে এটাই আমার উপলব্ধি। হয়ত আমার উপলব্ধির প্রস্তুতি ততখানি নেই যা থাকলে সুরজিৎবাবুর বক্তব্যের প্রজ্ঞলতা ধরা পড়তে পারে। আমার অক্ষমতাকে ক্ষমাহীন মনে করার দীনতা সুরজিৎবাবুর নেই এ বিশ্বাস আমার আছে।

গ্রন্থকার 'মৌলবাদ' শব্দটির সমালোচনায় বেশি স্পর্শকাতর হয়ে পড়েছেন বলে মনে হয়। তিনি নানা অভিধান থেকে এর অর্থ বোঝাবার প্রয়াস করেছেন। এর কোনও প্রয়োজন ছিল না। তিনি যদি একটু সচেতন ভাবে লক্ষ্য করতেন তবে গ্রন্থ সমালোচনার চতুর্থ অনুচ্ছেদের বাক্যগুলি এড়িয়ে যেতেন না। আমি স্পষ্ট করেই সেখানে লিখেছি : "পাশ্চাত্যে, যেখানে 'fundamentalism' শব্দটির জন্ম সেখানে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান যখন বহু খ্রিস্টিয় ধারণা ও বিশ্বাসের জায়গায় আঘাত করল তখন তারই প্রতিক্রিয়ায় এই সকল ধারণা ও বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরার আন্দোলনকে বলা হয় fundamentalism. যেমন যিশুর জন্মকাহিনী, পুনরুদ্ধার (Resurrection) ইত্যাদি গল্পের প্রতি অবিচল আস্থাকে অটুট রাখার প্রয়াস শুরু হয়। বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রচলিত কিছু কিছু ধর্ম মিশ্রিত ধারণার সংঘাত থেকে জন্মায় fundamentalism এর আবহ।"

সুরজিৎ দাশগুপ্ত নিজেই তাঁর গ্রন্থের 'প্রস্তাবনায়' লিখছেন: "মৌলবাদ বলে কোনও শব্দের প্রয়োগ ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের আগে আমরা দিখিনি।" তিনি আরও জানাচ্ছেন "আধুনিকতার বিপরীত এই বিশেষ অর্থে fundamentalsim শব্দটির প্রয়োগ ইংরেজিতে খুব সম্ভব ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের আগে ছিল না। এক নতুন চেতনা উপস্থাপনের জন্যই এক নতুন শব্দের চয়ন।" 'ধর্মীয় মৌলবাদ' বলে যুগ্ম শব্দ দুটিকেও তিনি "নবাগত" বলেই বর্ণণ করেছেন। আমি তাঁকেই অনুসরণ করে শুধু পুনরুক্তি করেছি—"মৌলবাদ শব্দটি নতুন", আমি তো তাঁকে ডিঙিয়ে যাইনি। 'মৌলবাদ' শব্দটি ও তার আবহ নিয়ে সমালোচক কি ভাববেন তা বড় কথা নয়। এই শব্দটি বাংলায় ঢুকে পড়ায় তার সংজ্ঞা নিয়ে বুদ্ধিজীবীরাই যে বিপদে পড়েছেন আমি সেটাই উল্লেখ করেছি। এবং আমার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর প্রদত্ত সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা প্রদান করেছি পাঠকদের অনুধাবনের জন্য।

যে-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে 'fundamentalism' শব্দটি নতুন চিহ্ন ও আবহ সৃষ্টি করছে ভারতের বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে তার অনুবাদ 'মৌলবাদ' হয় কিনা সেটাই বড় প্রশ্ন। রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন আগেই সাবধান করে গেছিলেন : "ভাবের ভাষার অনুবাদ চলে না। ছাঁচে ঢালিয়া শুষ্কজ্ঞানের ভাষার প্রতিরূপ নির্মান করা যায়।...আমরা আজকাল ইংরেজির ভাবের ভাষাকে বাংলায় অনুবাদ করিতেছি...ইংরেজির সহিত মিলিতেছে মনে করিয়া ভালো লাগে।...অনুবাদ করিলেই যে ইংরেজি বাংলা হইয়া যাইবে, এমন কোন কথা নাই"।

(রবীন্দ্র-রচনাবলী—পঞ্চদশখণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৯৮ পৃঃ ১০৬)

'মৌলবাদ' শব্দটি কোনও বাংলা অভিধানে পাওয়া যাবে না। প্রামাণ্য সংস্কৃত অভিধান—M. Monier Williams এর 'A Sanskrit English Dictionary'-তেও এই শব্দটি জায়গা পায়নি। এই শব্দটিও সাংবাদিকসুলভ অনুবাদের দৌলতে আলগোছে বাংলায় ঢুকে পড়েছে, যেমন ঢুকে পড়েছে ভূমিপুত্র (Son of the Soil), উষ্ণ অভ্যর্থনা (Warm reception), সিংহভাগ (Lion's share), বক্তব্য রাখা ইত্যাদি ভ্রান্ত অনুবাদ।

আমি সুরজিৎবাবুর প্রদত্ত 'মৌলবাদ'-এর সংজ্ঞা নিয়ে প্রশ্ন তুলিনি। সুরজিৎবাবুর প্রদত্ত সংজ্ঞাকেই একমাত্র সংজ্ঞা বলে সকল বুদ্ধিজীবীরা মানবেন না একথাই বোঝাতে চেয়েছি। আর মানতে না পারলেই তাঁদের শিক্ষা ও মনন নিয়ে কটাক্ষ করা কোনও প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে শোভা পায় না।

'মৌলবাদ' শব্দটি ভারতের রাজনৈতিক পটভূমিতে যাঁরা ব্যবহার করছেন তাঁরা অনেকেই 'ধর্মীয় গোঁড়ামি' কিংবা 'সাম্প্রদায়িকতা' বোঝাতেই ব্যবহার করছেন। তাদের নিয়ে গোল নেই। গোল বাধে যখন সুরজিৎবাবু নতুন সংজ্ঞা নিরূপণে বলেন "ধর্মীয় গোঁড়ামি বা সাম্প্রদায়িকতা এবং মৌলবাদ এক জিনিস নয়।" এই সংজ্ঞার প্রতি 'দায়বদ্ধতা' থেকেই ভারতবর্ষের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 'সাম্প্রদায়িক' যে কোনও আন্দোলনের সমর্থনে সুরজিৎবাবুর সুচিন্তিত অভিমত :—

"...রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার ডাক দিয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা দখল করতে চায় তখন তা হিন্দু মৌলবাদী আন্দোলন। কিন্তু শাহবানুর মামলায় মুসলমান সম্প্রদায় যখন ইসলাম ধর্ম সম্মত সমাজের কাঠামোতে আঘাত লাগছে বলে আদালতের বিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তখন তা মুসলিম মৌলবাদের দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রাহ্য হতে পারে না, কারণ মুসলমান সম্প্রদায় ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় সম্প্রদায় নয়" (পৃঃ ৬)!

প্রশ্ন এই যে যাঁরা 'মৌলবাদ'-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন বা লিখছেন তাঁরা সকলেই কি এই ব্যখ্যার সঙ্গে একমত হবেন? সুরজিৎবাবুর বিচারবুদ্ধির তরঙ্গাভিঘাত থেকে বঞ্চিত এই অধম সমালোচক এই বিষয়টি 'চতুরঙ্গ'-এর পাঠকপাঠিকার বিচারের ওপরই ছেড়ে দিল।

সুরজিৎবাবু মার্টিন লুথারের প্রসঙ্গে আমাকে দুর্বার আঘাত হানবার চেষ্টা করেছেন। আমার জ্ঞান খুবই সীমিত। ওই দুর্বলের ভরসা হিসাবে আমি ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস নামক এক পণ্ডিতের স্মরণ নিচ্ছি। এঙ্গেলস্ তাঁর 'Peasant war in Germany' গ্রন্থে 'ক্যাথলিক' গোষ্ঠীকে বলছেন 'প্রতিক্রিয়াশীল' এবং 'প্রটেস্ট্যান্ট', লুথার পন্থীদের স্থান নির্ণয় করছেন 'বুর্জোয়া সংস্কারবাদী' হিসাবে। তাঁর ভাষায় "_____In 1517 Luther first opposed the dogmas and statutes of the Catholic Church.....Luther's lighting struck home. The entire German people was set in motion.....peasants and plebians saw the signal to revolt in his appeals against the clergy, and in his sermon of christian freedom"

(Foreign Language Pub. House. Moscow, 1956 P.63)

লুথারের বিবর্তন হয়েছিল পরে যখন বিপ্লব তাঁকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। সার্বিকভাবে লুথারকে সংকীর্ণ বলা, ইতিহাস মানবে কি?

ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে এঙ্গেলের কমিউনিস্ট পার্টি এক সময় দেশভাগের ভুল রাজনীতিকে সংখ্যালঘুদের 'আত্মনিয়ন্ত্রণের' পরিচয় দিয়েছিল, এবং মুসলিম লিগের ম্যানিফেস্টো রচনায় এক অকসফোর্ড ফেরত বাঙালি কমিউনিস্ট সাহায্য করে যেরকম ভুল করেছিলেন সুরজিৎবাবুর 'মৌলবাদ' ব্যাখ্যা আমাদের সেই ভ্রান্তিরই ইঙ্গিত দেয়।

পরিশেষে, সক্রেটিসের 'স্বর্গাভিমুখী নাক'-এর গৌরবে সুরজিৎবাবু 'নিম্নমুখী নাকওয়ালাদের সাহচর্য উপভোগে অক্ষম' বলে জানিয়েছেন। কাদের সাহচর্য তাঁর প্রীতি উৎপাদন করবে তা নির্ণয় করা তাঁর রুচি ও স্বার্থের ব্যাপার। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে, অতি সম্পত্তি দেশের কোনও একটি উচ্চ আদালতের প্রধান কিঞ্চারপতি তাঁর আইনসংক্রান্ত গ্রন্থে 'মৌলবাদ' ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে খোদ মৌলবাদীদের সাহচর্য ও অর্থানুকূল্য লাভ করে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন। এক্ষেত্রে ঘটনাটা যদি উল্টো হয়, অর্থাৎ মৌলবাদের অভিনব ব্যাখ্যায় লেখকের অজান্তেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মৌলবাদীরা উল্লসিত হয়ে উঠলেন, তাহলে সে ব্যাপারটাও খুব অভিপ্রেত হবে না। তাই বলি, সাধু সাবধান! উন্নতনাসা হলেও 'আরোলত্রবোলের' সীজনাথ বন্দ্যার মতন উর্ধ্বমুখে আকাশের গায়ে টকটক গন্ধ শুঁকে বেড়ানো কিন্তু সক্রেটিসের কাজ ছিল না।

সম্পাদক মহাশয়, আমার মনে ও লেখনীতে ভেদাভেদ নেই। তবু যদি অজ্ঞানতাবশত কোনও শব্দ বা কথা সুরজিৎবাবুকে কষ্ট দিয়ে থাকে তার জন্য দুঃখিত। আশা করি তিনি আমায় ভুল বুঝবেন না। 'একেবারেই প্রেমের যোগ্য নহে এমন জীব কোথায়!'

নমস্কারান্তে,

পুলক নারায়ণ ধর

(এই প্রসঙ্গে আর কোনও চিঠিপত্র ছাপা হবে না।)

শিক্ষাগুরু ভবতোষ দত্ত

দেবকুমার বসু

ভারতবর্ষে অর্থনীতি শাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং সমাজ ব্যবস্থায় তার প্রয়োগ বিষয়ে গবেষণার মধ্য দিয়ে যেসব মনীষী অর্থনীতি শাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করেছেন তার মধ্যে ভবতোষ দত্তর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। পরাধীন ভারতবর্ষে ইংল্যান্ডের অর্থনীতির ভাবধারায় পুষ্ট হয়েও ভারতীয় অর্থনীতিবিদরা প্রথম থেকেই স্বদেশের অর্থনীতিকে বিশ্লেষণ করেছিলেন নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। দাদাভাই নৌরজী এবং রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁদের রচনায় এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় রেখে গেছেন। ভবতোষ দত্ত ছিলেন সেই ঐতিহ্যের উত্তরসূরী। তাঁর কর্মজীবনে ১৯৩২ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত যে বিরাট পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আমাদের দেশ অগ্রসর হল তার সমকালীন অর্থনীতির বিশ্লেষণমূলক রচনাবলী অর্থনীতি শাস্ত্রে অমূল্য সংযোজন।

ভবতোষ দত্তের জন্ম ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯১১ সালে বিহারের পাটনা শহরে এক শিক্ষাব্রতী পরিবারে। পিতা হেমেন্দ্রকিশোর দত্ত অধ্যাপনা করতেন রসায়ন শাস্ত্রে। মাতা যোগমায়া দেবী গুপ্ত পরিবারের কন্যা। ৫৭ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হলে অনেক দুর্যোগের মধ্যে সংসারের হাল ধরেছিলেন দত্ত পরিবারের মা যোগমায়া দেবী। ভবতোষ দত্ত বাংলা ভাষায় রচনা কীভাবে শব্দমাধুর্যে সমৃদ্ধ হতে পারে তা হাতে কলমে শিখেছিলেন মার কাছে। সহধর্মিনী অমলা দেবী এসেছিলেন বসু পরিবার থেকে। স্বামীকে আজীবন সাহচর্য এবং প্রেরণা দিয়ে তিনি প্রয়াতা হন, ১৯৮৯ সালে জুলাই মাসে। ১১ই জানুয়ারী ১৯৯৭ অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত অমর্তলোকের পথে যাত্রা করেন।

ভবতোষ দত্তর অর্থনীতি চর্চার শুরু ৩০এর দশকে। এই সময়ে অর্থনীতিবিদরা প্রভাবিত হয়েছিলেন স্মিথ, রিকার্ডো এবং মিলের ধ্রুপদী অর্থনীতি আর অ্যাডাম সের উত্তরসূরী মার্শাল, জেভনস্ এবং ভালরা (Walrus) এঁদের চিন্তাধারায়। মার্কসের অর্থনীতি চিন্তা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল পরবর্তীকালে।

১৯৩০এ বিশ্বের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এক গভীর সংকটের সৃষ্টি হয়। ব্যবসায়ে মন্দা এতই তীব্র আকার ধারণ করে যে গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার মতন হয়। দুনিয়া জুড়ে কলকারখানা বন্ধ হতে থাকে। ব্যাপক বেকারি ভয়াবহ দারিদ্রের সৃষ্টি করে। অর্থনীতিশাস্ত্রের প্রচলিত নির্দেশ অনুযায়ী সরকারি ব্যয় সংকোচন, শ্রমিকের মজুরি কমিয়ে শিল্পপতিদের থকা বাঁচানো, এই সব প্রচেষ্টায় সমস্যার কোনও সমাধান তো হলই না, বরং সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করল। এই সময়ে প্রকাশ হয় কেইনসের যুগান্তকারী গ্রন্থ General Theory of Employment Interest and Money। সম্পূর্ণ ভিন্ন চিন্তা নিয়ে কেইনস্ দেখান যে ব্যবসায়ে অবনতির সময়ে পুঁজিপতিরা যখন নতুন বিনিয়োগ বন্ধ করেন তখন যে ব্যপক বেকারির সৃষ্টি হয় তার ফলেই কমে যায় বাজারে জিনিষপত্রের চাহিদা। নতুন বিনিয়োগে ব্যবসায়ীদের আর উৎসাহ থাকে না। এই অবস্থায় ব্যক্তি পুঁজির উপর নতুন উদ্যোগের জন্য আর নির্ভর করা যায় না। কেইন্স্ সুপারিশ করেন এক্ষেত্রে নতুন বিনিয়োগ উদ্যোগ নিতে পারে একমাত্র রাষ্ট্র। বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে হবে নতুন কর্মসংস্থান যা থেকে সৃষ্ট হবে বাজারে জিনিষপত্রের জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদা। রাষ্ট্র বাজারে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করবে তা স্বাধীন বাণিজ্যের সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার একেবারে পরিপন্থী। কেইনসের তত্ত্ব স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন অর্থনীতিবিদ এবং শিল্পপতিদের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। শেষপর্যন্ত কিন্তু কেইনসের নীতি গ্রহণ করেই ব্রিটেন, আমেরিকা এবং ইউরোপীয় দেশগুলি অর্থনীতির সংকট থেকে মুক্ত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ব্রিটেন শ্রমিকদল ক্ষমতায় এলে পুঁজি বিনিয়োগের বিষয়ে রাষ্ট্রের উদ্যোগ এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী বিনিয়োগের ব্যবস্থা রাষ্ট্রনীতির হিসাবে গৃহীত হয়। কেইনসের চিন্তাধারার ঢেউ ভারতবর্ষেও অর্থনীতিবিদদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। কিন্তু একটি উন্নত দেশের অর্থনীতির সঙ্গে ভারতের মতন পশ্চাৎপদ অর্থনীতির পক্ষে তার কি তাৎপর্য থাকতে পারে তা সকলের কাছে বোধগম্য ছিল না। অধ্যাপক দত্ত তাঁর বক্তৃতার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের কাছে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নতুন ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন। ব্রিটেনের মত শিল্পোন্নত দেশে কলকারখানা বন্ধ হওয়ার জন্য যে বেকার সমস্যা তা বিশ্লেষণ করে তিনি দেখান ভারতবর্ষে শিল্পে উন্নতি না হওয়ার ফলে যে কর্মহীনতার সমস্যা তা মূলত ভিন্ন ধরণের। কৃষিপ্রধান দেশে গ্রামাঞ্চলে কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের মতো সর্বক্ষণের কাজ থাকে না। চাষের উপর নির্ভরশীল কৃষক ও ক্ষেতমজুর এখানে বৎসরের অনেকটা সময় কর্মহীন অবস্থায় থাকে যাকে বলা যায় প্রচ্ছন্ন বেকারি (disguised unemployment)। এখানে কৃষি সমস্যার সমাধান

খুঁজতে হবে প্রকৃত ভূমিসংস্কারের মধ্যে যা পারে কৃষিতে উৎপাদন এবং কাজের সুযোগ বাড়িয়ে দিতে। এক্ষেত্রে কেইনসীয় নীতি প্রয়োগের সুযোগ নেই। কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে ভবতোষ দত্ত ভিন্ন ধাঁচে কেইনসের ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে ভারতবর্ষের শিল্পপতিরা নতুন শিল্পে বিনিয়োগ করতে ব্যর্থ হচ্ছেন এই জন্য নয় যে সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত আয় কমে যাবার ফলে বাজারে চাহিদা নেই। ভারতীয় শিল্পপতিদের যথেষ্ট পুঁজি সঞ্চিত না থাকা তার অন্যতম কারণ। যেখানে ব্যক্তিগত পুঁজি বিনিয়োগের অভাব সেখানে কেইন্সের প্রদর্শিত নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রকেই উদ্যোগ নিতে হবে সমাজে বিনিয়োগের জন্য। প্রচলিত অর্থনীতি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী শুধুমাত্র মুক্তবাজারে ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপর নির্ভর করলে ভারতবর্ষের মতন অনুন্নত দেশে শিল্পায়নের বিকাশ হবে সুদূরপরাহত। এইখানেই আমাদের দেশে কেইনসের তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা। এ বিষয়ে ভবতোষ দত্তর প্রথম রচনা The Economics of Industrialization প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালে। লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিকসে ডক্টরেট থিসিসের উপর ভিত্তি করে তাঁর এই রচনা। ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনায় সবসময়েই তিনি রাষ্ট্রকে বিনিয়োগের উদ্যোগ নেবার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণের পক্ষে যুক্তি উপস্থিত করেন। যেহেতু অনুন্নত দেশের বিনিয়োগসম্পদ সীমিত, সেহেতু তার বিনিয়োগের ক্ষেত্র সুচিন্তিতভাবে নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। তাই প্রয়োজন পরিকল্পনা অনুযায়ী জাতীয় উন্নয়নের ব্যবস্থা। ভবতোষ দত্ত এবং সমকালীন ভারতীয় অর্থনীতিবিদরা ৫০এর দশকে জাতীয় পরিকল্পনার পক্ষে আলোচনার যে বাত্যাবরণ সৃষ্টি করেছিলেন তার জন্যই সম্ভব হয়েছিল প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশের পরামর্শ অনুযায়ী ভারী শিল্পকে অগ্রাধিকার দিয়ে দেশে দ্বিতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা। এ বিষয়ে ভারতীয় অর্থনীতিবিদরা কেইনসীয় অর্থনীতির সীমানা ছাড়িয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। অধ্যাপক দত্ত রাষ্ট্রের উদ্যোগে শিল্পায়নকে গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির পরিকল্পনার ত্রুটিগুলি সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর উপর নির্ভর না করে পরিচালনায় পারদর্শী নেতৃত্বের প্রবর্তন করে এই ত্রুটি শোধরানো চেষ্টা করা উচিত বলে মনে করতেন। পঞ্চবার্ষিক যোজনার তিনি ছিলেন উৎসাহী সমর্থক। তা সত্ত্বেও বাস্তবক্ষেত্রে যোজনার কাজে বিচ্যুতিগুলিকে সমালোচনা করতে তিনি কুণ্ঠিত হননি। যোজনার প্রয়োগকালে সামাজিক স্বার্থে ঘোষিত, রাষ্ট্রীয় নীতি যখন লঙ্ঘিত হয় তখন তার প্রভাব অর্থনীতির পক্ষে বিরকম ক্ষতিকরক হতে পারে তা তিনি বিশ্লেষণ করেন শেষোক্ত গ্রন্থের প্রবন্ধ সংকলনের মধ্যে। এখানে তিনি দেখান পঞ্চবার্ষিকী যোজনার মধ্যেও রাষ্ট্রীয় নীতি লঙ্ঘন করে ভারতবর্ষে বৃহৎ পুঁজিপতিরা তাদের শক্তিবৃদ্ধি করল। ফলে দেশে ধনবৈষম্য এবং দারিদ্র্য সমানে বেড়ে চলল। Indian Planning at the Crossroads এর প্রবন্ধগুলি ভারতীয় অর্থনীতি সাহিত্যে এক অমূল্য সংযোজন। এই গ্রন্থের অনেক প্রবন্ধই লেখা হয়েছিল সংবাদপত্রের পাঠকদের জন্য। দুরূহ বিষয়কে প্রাঞ্জলভাষায় সহজবোধ্য করে প্রকাশ করার পক্ষে এই গ্রন্থ এক অপূর্ব নিদর্শন।

ভারতীয় ব্যাঙ্কিং এবং মুদ্রানীতি বিষয়ে আলোচনা অধ্যাপক দত্তর প্রবন্ধগুলির মধ্যে এক বিশেষ স্থান নিয়ে আছে। ইংরাজ আমলে প্রবর্তিত ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা এবং মুদ্রানীতিতে সময়োপযোগী পরিবর্তনের জন্য তাঁর পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের কাছে সমাদৃত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারে (IMF) তিনি দায়িত্বপূর্ণ কাজে ছিলেন ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত। আই-এম-এফের কর্মকৌশলের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল বলেই তিনি ১৯৮১ সালে ভারত সরকার যখন ৫৪০০ কোটি টাকার (৫৪০ কোটি এম-ডি-আর) ঋণের জন্য অর্থভাণ্ডার কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হন তখন ভবতোষ দত্ত তার কুফল সম্পর্কে তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে সচেতন করেন। জনমতের চাপে ১৯৮৩-৮৪ সালে এই ঋণের শেষ কিস্তি প্রায় ১২০০ কোটি টাকার ঋণ গ্রহণ করা থেকে সরকার বিরত হন।

প্রতি বৎসর কেন্দ্রীয় বাজেটের উপর তাঁর রচনা এবং প্রতিক্ষণ পত্রিকার উদ্যোগে বাৎসরিক বাজেটের বিশ্লেষণ কলকাতায় বহু প্রতীক্ষিত বিষয় হয়ে উঠেছিল। তাঁর আলোচনা সব সময়েই ছিল তথ্যসমৃদ্ধ। অর্থনীতির জটিল সংখ্যারাশিকে কীভাবে স্বচ্ছ হিসাবে প্রকাশ করা যায় তার যে-উদাহরণ তিনি রেখে গেছেন তা সকলের কাছে শিক্ষণীয় হয়ে রয়েছে।

শিক্ষকের জীবনে সব থেকে গর্বের বিষয় তাঁর ছাত্রদের সামাজিক স্বীকৃতি। এদিক থেকে অধ্যাপক দত্তর গর্বের কারণ তাঁর বহু ছাত্র আজ বিশ্বের দরবারে প্রথম সারির অর্থনীতিবিদ হিসাবে স্বীকৃত। ১৯৩২ সালে চট্টগ্রামের চ্যিনাগং গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে তাঁর অধ্যাপনা জীবন শুরু। এর পর যথাক্রমে বর্ধমান রাজ কলেজ, ইসলামিয়া কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার অধ্যায় শেষ হয় ১৯৬০ সালে। প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি এমেরিটাস অধ্যাপকের সম্মানে ভূষিত হন। বিশ্বভারতী তাঁকে দেশিকোত্তম নির্বাচিত করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি, লিট ডিগ্রী প্রদান করেন। বাংলাভাষায় অধ্যাপক দত্তের প্রবন্ধগুলি তাঁর বহুমুখী প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করছে। তাঁর শেষজীবনে আত্মজীবনীমূলক রচনা বাংলা সাহিত্যে বিশেষ অবদান হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। তাঁর লেখা আট দশক, সাত-সতেরো, এবং তামসী গ্রন্থে বাল্যকাল থেকে শেষের দিনগুলি পর্যন্ত তাঁর সমকালীন চলমান বাংলার, এপার এবং ওপার বাংলা, বিচিত্রগতির ছবি এঁকেছেন নিপুণ শিল্পীর দক্ষতায়। সাহিত্যে তাঁর সৃজনশীল প্রতিভার জন্য তিনি সম্মানিত হন রবীন্দ্র পুরস্কার এবং আনন্দ পুরস্কারে। বিস্ময়কর

মনোবলের পরিচয় পাওয়া যায় তামসী গ্রন্থে। সহধর্মিনী এবং নিকট আত্মীয়ের বিয়োগ যন্ত্রনা বহন করে অসুস্থ অবস্থায় ১৯৯৪ সালে তাঁর চক্ষু দৃষ্টিহীন হয়ে গেল। শুধুমাত্র কথা বলার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করলেন তামসীর। তিনি লিখলেন, "জন্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্ত চোখদুটি যখন সম্পূর্ণ অসহযোগ করে, তখন তৃতীয় নয়ন খুলে যায়। ...আমার তৃতীয় নয়নে কোনও বর্তমান নেই। কিন্তু দীর্ঘ অতীতকে দেখতে পাই, ভবিষ্যৎকেও কল্পনার চোখে দেখি।"

অধ্যাপক দত্তর সাহিত্যিক অবদান গুণীজনের কাছে উপযুক্ত চর্চার দাবি রাখে।

বাংলা ভাষায় অর্থনীতি চর্চায় তিনি আমাদের অনেকদূর এগিয়ে দিয়েছেন। অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর প্রথম বাংলা গ্রন্থ ধনবিজ্ঞান বিশ্বভারতী রচনাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালে। সেই ধারা অব্যাহত থাকে সারাজীবন। তাঁর সংবেদনশীল চোখে দৃষ্টিকোণ গ্রন্থে দেখা যায় একই শহরে পাঁচতারা হোটেল, আর তার কাছেই দরিদ্রতম বস্তি, নানারকমের নতুন যুগের বস্ত্র সম্ভারের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের একান্ত বস্ত্রাভাব, খাদ্যের অমার্জনীয় অপচয়ের পাশাপাশি হাজার হাজার মানুষের অনাহার। অদম্য প্রতিরোধী মনের ভাষায় তিনি লেখেন "এই অবস্থা আমরা প্রায় মেনে নিয়েছি। এই মেনে নেওয়াটাই ভবিষ্যতের পক্ষে আশঙ্কাজনক। কারণ, একবার যদি আত্মসন্তুষ্টির ভাব মনে দৃঢ়মূল হয়ে যায়, প্রয়োজনীয় দৃঢ়হস্ত কর্মসূচি নেবার আর কোনও আগ্রহ থাকে না"।

বাংলার মনীষীদের নিয়ে যে অমৃতের রাজত্ব সেখানে শিক্ষাগুরু ভবতোষ দত্ত উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতন চিরভাস্বমান হয়ে আছেন।

প্রসঙ্গত

চতুরঙ্গের চৈত্র ১৪০৩ সংখ্যা (৫৬ বর্ষ ৪ সংখ্যা) প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল গত বছর চৈত্রের শুরুতেই। কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে সেই সময় সেই সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এখন নববর্ষ। ১৪০৪-এর বৈশাখে পৌঁছে বিগত বছরের চৈত্র সংখ্যা প্রকাশ করা অর্থহীন। তাই ৫৬ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যাটি বাতিল হিসাবে গণ্য করা ছাড়া উপায় নেই। আপ্রাণ প্রয়াস সত্ত্বেও চতুরঙ্গ প্রকাশনায় সময়সূচি রক্ষা না করতে পারার কারণে পাঠকদের কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

পাঠকগণ নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, মাসিক চতুরঙ্গ প্রকাশনায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল বেশ কিছুকাল আগে থেকেই। তাই পুনরায় ত্রৈমাসিক হিসাবেই একটু বর্দ্ধিত কলেবরে পত্রিকাটি প্রকাশনার সিদ্ধান্ত হয় গত বছর। কিন্তু প্রকাশনার সময়সূচি ঠিক ঠিক মতো রক্ষা করা যাবে কিনা সে সম্পর্কে সংশয় থাকায় গ্রাহকদের অনুরোধ করা হয়েছিল সংখ্যা হিসাব করে গ্রাহক হতে। অর্থাৎ তাঁরা যতগুলি সংখ্যার জন্য গ্রাহক চাঁদা জমা দেবেন চতুরঙ্গ যেমন যেমন প্রকাশিত হবে, সময় যতই লাগুক, যতই বিলম্ব হোক, সেই সংখ্যাগুলি তাঁরা পাবেনই। গ্রাহকদের জন্য এ ধরণের একটা বন্দোবস্ত না করে আমাদের উপায় ছিল না। বর্তমান পরিস্থিতিতে চতুরঙ্গের মতো একটি অবাণিজ্যিক পত্রিকা প্রকাশনায় সময়সূচি রক্ষা করা যে কত কঠিন, সেকথা নিশ্চয়ই এই পত্রিকার পাঠকেরা বুঝবেন। **তাঁদের সহানুভূতি এবং** শুভেচ্ছাই আমাদের পাথেয়। ভবিষ্যতে **আমরা চেষ্টা করব যাতে** অন্তত ত্রৈমাসিক হিসাবে চতুরঙ্গ প্রকাশনার **সময়সূচি ঠিক ঠিক** মতো রক্ষা করা যায়।

বর্তমান পর্যায়ে গত বছর অর্থাৎ **১৪০৩ বঙ্গাব্দে যে তিনটি** সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে, গুণীজনদের মধ্যে সেগুলির সমাদর দেখে আমরা মুগ্ধ। এই সমাদরের ভাষা কোনও কোনও ক্ষেত্রে এতটাই গভীর স্নেহসিক্ত যে মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, সত্যিই আমরা এর যোগ্য কি না। এই স্নেহসিক্ত অভিনন্দন আমরা লাভ করেছি বাঙালি মনীষার বর্তমানে যাঁরা প্রতিভূ তাঁদের প্রায় প্রত্যেকের কাছেই। উদাহরণ হিসাবে যাঁদের নাম করা যায় তাঁরা হলেন, অন্নদাশঙ্কর রায়, শিবনারায়ণ রায়, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, আহমদ শরীফ, আনিসুজ্জামান প্রমুখ। উভয় বাংলা থেকে এই তালিকায় আরও বেশ কিছু নামেরই উল্লেখ করা যায়। যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মৌখিকভাবে, কেউ কেউ লিখিতভাবে ব্যক্ত করেছেন তাঁদের সপ্রশংস মনোভাব।

মাসিক চতুরঙ্গের এক সময়ের প্রধান সম্পাদক প্রবাদপ্রতিম প্রফেসর রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত নব পর্যায়ে ত্রৈমাসিক চতুরঙ্গের তিনটি সংখ্যা পড়ার পর এই অর্বাচীন সম্পাদককে সম্প্রতি জানিয়েছেন, বাংলাভাষায় প্রকাশিত এইটাই 'শ্রেষ্ঠ' পত্রিকা। সম্ভবত ছাত্রপ্রতিম সম্পাদকের প্রতি স্নেহাধিক্যের কারণেই এই 'শ্রেষ্ঠ' বিশেষণটি তিনি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তাঁর স্বভাবের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরাই জানেন, স্নেহ যতই থাকুক, এ ধরণের বিশেষণ যত্রতত্র তিনি প্রয়োগ করেন না।

এই প্রসঙ্গে আমাদের সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণার কারণ হয়েছে প্রফেসর হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি দীর্ঘ পত্র। তাঁর এই পত্র থেকে জানা যায়, চতুরঙ্গের প্রতিটি সংখ্যাই তিনি খুঁটিয়ে পড়েন। এই পত্রে বিভিন্ন লেখা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যগুলি নিঃসন্দেহে প্রজ্ঞাদীপ্ত মূল্যায়নের নিদর্শন। চতুরঙ্গের বৈশিল্প এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে এই পত্রিকার ভূমিকা সম্পর্কেও তিনি কিছু

মন্তব্য করেছেন। যে-মন্তব্যগুলি চতুরঙ্গ পাঠকদের গোচরে আনা জরুরি মনে হওয়ায় নিতান্ত ব্যক্তিগত পত্র হলেও এর কিছু অংশ, বিশেষ করে প্রথমাংশটি এখানে প্রকাশ করা হল।

সপ্তপর্ণী 16F
কলকাতা-১৯
১৭।১।৯৭

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় স্বল্প, তবুও এটা লিখছি। আমাকে চতুরঙ্গ পাঠিয়ে চলেছেন—এবং "wind and weather permitting" অর্থাৎ ডাকবিভাগ যদি সদয় থাকেন তো পেয়ে থাকি। এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। বহুপূর্বে হুমায়ুনের জীবনকালে Marx এর Capital থেকে একটি পরিচ্ছেদের দীর্ঘ অনুবাদ (আমার করা) ছাপা হয়েছিল। সম্প্রতি আপনার আমলেও একাধিকবার লিখেছি। অধিকাংশ অনুরূপ পত্রিকার তুলনায় "চতুরঙ্গ" আমাকে তৃপ্ত করে, যদিও রুচিৎ কদাচিৎ একটু তিক্ত স্বাদ থেকে যায়। পৌষ ১৪০৩ সংখ্যা পেয়েছি এবং প্রায় (পুরো নয়) আদ্যোপান্ত পড়েছি। আগেও কোথাও যেন একবার বলেছিলাম যে "চতুরঙ্গ" এমনই একটা গুণ রাখে যাতে আদ্যোপান্ত পড়ার ইচ্ছা পাঠকের মনে আসে। আমার কাছে খুবই দামী হল হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বঙ্গভাষাভাষী সবাইকে একত্র করার শুভ চেষ্টা প্রায় কোন পত্রিকা (বামপন্থী সমেত) করে না, যেটা চতুরঙ্গ করে। আমার প্রকাশ্য ও তীব্র অনুযোগ (বাংলা আকাদেমি সভায়) উপেক্ষিত হয়েছে। কারণ, দুর্ভাগ্যক্রমে আমার ধারণা (অপ্রকাশ্যে বলেছি ও লিখেছি, আর ভুল প্রমাণিত হলে সুখী হব) এই যে কার্যত 'হিন্দুত্ব'—রাষ্ট্রেই আমরা বাস করি, বামপন্থীশাসিত পশ্চিমবঙ্গেও।

বাংলা যে হিন্দু-মুসলমানের সমানভাবে স্বদেশ ও শিক্ষিত মানসিকতায় স্বীকৃতই নয় এই সচেতন(!) বামপন্থা-পরায়ণ পশ্চিমবঙ্গে। হয়ত অত্যুক্তি, কিন্তু না করে পারলাম না।

হঠাৎ খেয়ালবশে এই পত্রাঘাত। সংক্ষেপে বলি "ক্ষমস্ব"।

বিনীত
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এই পত্রে বামপন্থা-পরায়ণ পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হয়েছে, তার যথার্থতা নিয়ে চতুরঙ্গ পাঠকরা নিশ্চয়ই চিন্তাভাবনা করবেন। বস্তুত, পত্রাংশটি প্রকাশের উদ্দেশ্যও সেটাই। আর একটি উদ্দেশ্য হল, এই বর্ষীয়ান চিন্তাবিদ চতুরঙ্গের যে অনন্য বৈশিল্পটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, সেটার প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। সত্যি কথা বলতে কি, 'হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাইকে একত্র করার শুভচেষ্টা' বলে যে বৈশিল্পটির ইঙ্গিত তিনি করেছেন সেটি সম্পর্কে তেমন কোনও সচেতন প্রয়াস আমাদের ছিল না। আমরা শুধু চেয়েছি চতুরঙ্গের ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটি উন্নত মানের পত্রিকা প্রকাশের ধারা অব্যাহত রাখতে। উভয় বাংলার চিন্তাশীল পাঠকদের মানসিক তৃপ্তিসাধনই আমাদের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পূরণের প্রয়াসের ফলে উল্লিখিত বৈশিল্পটি অবয়ব পেয়েছে স্বাভাবিক নিয়মে। প্রফেসর হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই বৈশিল্পটি সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে তোলায় আমরা কৃতজ্ঞ।

আবদুর রউফ

চতুরঙ্গ পত্রিকার মালিকানা ও অন্যান্য বিবরণী

১। প্রকাশ-স্থান : ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩

২। প্রকাশের ব্যবধানকাল : ত্রৈমাসিক

৩। মুদ্রক : নীরা রহমান, জাতীয়তা : ভারতীয়
ঠিকানা : ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩

৪। প্রকাশক : নীরা রহমান, জাতীয়তা : ভারতীয়

৫। সম্পাদক : আবদুর রউফ, জাতীয়তা : ভারতীয়

৬। স্বত্বাধিকারীদের নাম-ঠিকানা : নীরা রহমান, ৩৪।১ বন্ডেল রোড, ফ্ল্যাট-১/সি, কলিকাতা-৭০০ ০১৯

আমি নীরা রহমান, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরিলিখিত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য।

নীরা রহমান